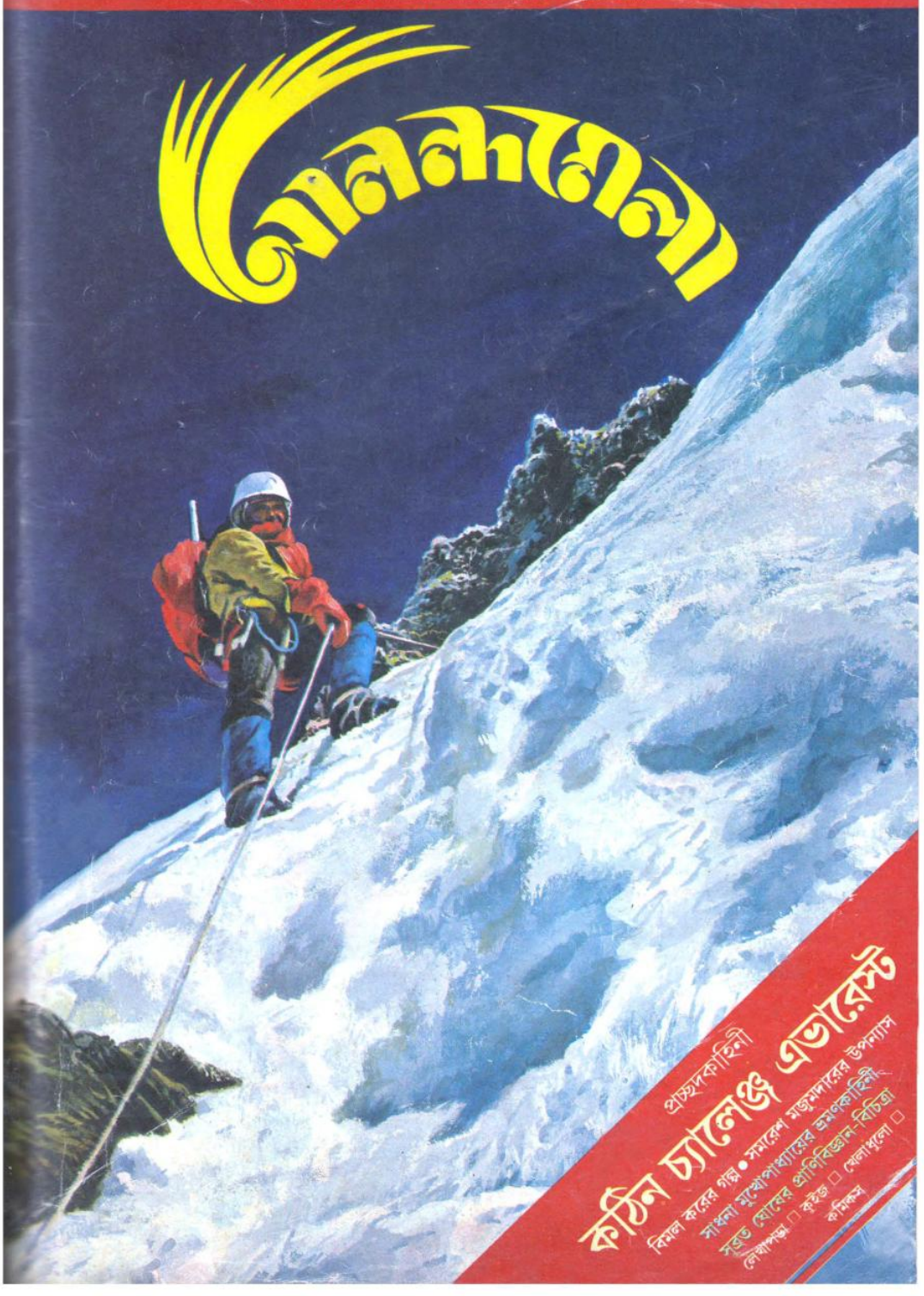

২০ অগস্ট ১৯৮৬ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ চার টাকা

আনন্দমেলা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নীলাচল দা

স্ক্যান করেছেন - নীলাচল দা

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!"

—ফেভি ফেয়ারী

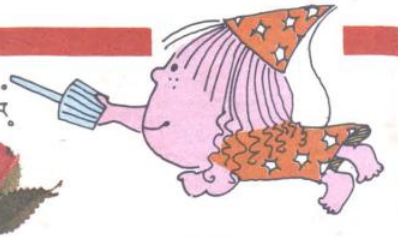

চটপট করতে
কোনোকিছু গড়তে
এটা-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা–হাতি–বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

বিনামূল্যে গোলাপ ফুলগুলো কিভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠাও অথবা এই ঠিকানায় লেখ: "ফেভি ফেয়ারী", পোস্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০।

বিনামূল্যে গোলাপ ফুলগুলো কিভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠাও: "ফেভি ফেয়ারী", পোস্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০।

নাম: ____________________

বয়স: ____________________

ঠিকানা: ____________________

____

সহর: ____________________

রাজ্য: __________ পিনকোড: __________

তুমি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফ্‌ট পত্রিকাটি পেয়েছ? হাঁ/না

ফেভিকল এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

Ⓡ এইটি আর **ফেভিকল** ব্র্যাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

OBM-7864 BN

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)
লাইটার । সমরেশ মজুমদার ৩০
ধারাবাহিক উপন্যাস
নীলমূর্তি রহস্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৪
ডোরাকাটা জামা
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১৭
ছড়া
বিশ্বকাপ । মৃণাল বসুচৌধুরী ১৩
চার্দাদা । প্রমোদ বসু ১৩
নদীর গল্প । শিবময় দাশগুপ্ত ১৩
ভ্রমণকাহিনী
টিউলিপের দেশে
সাধনা মুখোপাধ্যায় ৯০

প্রচ্ছদকাহিনী
কঠিন চ্যালেঞ্জ এভারেস্ট
শেফালি সিংহ ৪৭

তেনজিং,টাইগার অভ্ টাইগারস
...বিশ্বাস ৫৬

পাহাড় কী করে হল
দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮
বিজ্ঞানবিচিত্রা
এলাম আমি কোথা থেকে
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৬৩

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে
অনুসন্ধানী ৬৪

অস্ট্রেলিয়ার প্লাটিপাস
সুব্রত ঘোষ ৬৫
বিদ্যালয়-পরিচিতি
বহরমপুর মহারানি কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় । শ্যামলকান্তি দাশ ৭৮

গল্প
ভূমিকাকার চৌরশতম
বিমল কর ৮
ভূতের গল্প নয়
চৈতালি চট্টোপাধ্যায় ১৯
খেলাধুলো
ক্রিকেট শিখতে বোম্বাইয়ে কি যেতেই হবে । কৃশানু ভট্টাচার্য ৭০

এখানে সুযোগ সুবিধে কেমন
রাজু মুখোপাধ্যায় ৭২
টুকরো খবর
সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২
বড় ক্লাবের জার্সি । রত্না শূর ৭৪
কেমন ছেলে বেকার
সুভাষ সরকার ৭৫

শার্লক হোমসের গল্প
বড়লোকের কাণ্ড
সার আর্থার কোনান ডয়েল ২৪
যত্তসব
জোকার । তারাপদ রায় ৬১
ডাক্তারবাবু বলছেন
কী খাব, কী খাব না
(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ৬২
জানা-অজানা
তিরিশ হাজার রকমের মাকড়সা
সাধনা মুখোপাধ্যায় ৬১

কমিক্স
টারজান ৭, স্পাইডারম্যান ২৭,

টিনটিন ৬৮, রোভার্সের রয় ৭৬, স্টার ওঅরস ৮১, গাবলু ৮৭
অন্যান্য আকর্ষণ
চিঠিচাপাটি ৫, কুইজ ৬, ধাঁধা ২২, মজার খেলা ২২, হাসিখুশি ২২, শব্দসন্ধান ২৩, আঁকিবুকি ২৩, কিসের ফোটো ২৩, দূরদর্শনে ৮৩, যোগ-ব্যায়াম ৮৫, ম্যাজিক ৮৫, সহজে ইংরেজি ৮৬, অর্থ জানো ৮৬, বইয়ের খবর ৯৪
প্রচ্ছদ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আগামী সংখ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর গল্প 'গ্রামের নাম জাঁকপুর'
প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়া 'ছড়ায় ছড়ায়'
মুকুতা মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদকাহিনী 'যে জাহাজ আকাশে ওড়ে'
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ভ্রমণকাহিনী 'প্রকৃতির স্বপ্নরাজ্য গোমুখ'
সমরেশ মজুমদারের সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ) 'লাইটার'
লেখাপড়া ● কুইজ ● খেলাধুলো ● বিজ্ঞানবিচিত্রা ● কমিক্স

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম চার টাকা ।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ৩০ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা ।

গ্লুকন-ডি সুপারহিরো

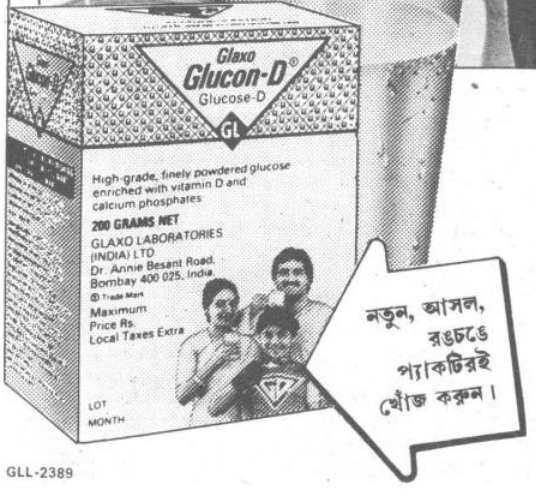

ক্লান্তিকর গরম হোক যতই নিদারুণ, গ্লুকন-ডি দিয়ে আপনার বাচ্চাকে প্রাণচঞ্চল রাখুন – এই নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয়তে থাকে গ্লুকোজ, ভিটামিন – ডি এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট।

গ্লুকন-ডি, জ্যুস, দুধ, চা, কফি বা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খান, আর, পরিবারের সবাই এক অপূর্ব সতেজ করা পানীয় পান। ১০০ গ্রা., ২০০ গ্রা. ও ৫০০ গ্রা. প্যাকে পাবেন। গ্ল্যাক্সো-র অবদান গ্লুকন-ডি

গ্লুকন-ডি ⓣ

শক্তি যোগানের পানীয়, সুপারহিরোর অতি প্রিয়

GLL-2389

সম্পাদকের চিঠি

এক চোখ ভাসে জলে,
এক চোখে হাসি,
বেজে ওঠে ধরাতলে
শরতের বাঁশি ।
চলে মেঘে-রোদ্দুরে
ছুটোছুটি-খেলা,
ভরে নিই তারই সুরে
আনন্দমেলা ।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি আর স্বাক্ষর

আমরা লেখকলেখিকা ও কবিদের গল্প, উপন্যাস ও ছড়া ছাপার অক্ষরেই পড়ি—তাঁদের ছবি, হাতের লেখা দেখতে পাই না । তাঁদের হাতের লেখা, অটোগ্রাফ ও ছবি আমরা আনন্দমেলার পাতায় দেখতে খুবই আগ্রহী ।
সুপর্ণা রায়, দুর্গাপুর ৫

আমরা আমাদের প্রিয় লেখকলেখিকাদের অটোগ্রাফ ও ছবি আনন্দমেলার পাতায় দেখতে চাই ।
স্বর্ণালি ও বর্ণালি মজুমদার
কলকাতা ২৯

সত্যজিৎ রায়ের ছবি ও অটোগ্রাফ আনন্দমেলার পাতায় দেখতে পেলে খুশি হব ।
তন্ময় দাশগুপ্ত
হলদিয়া টাউনশিপ
মেদিনীপুর

ফেলুদা, তোপসে, জটায়ু আর প্রোফেসর শঙ্কুর স্রষ্টার ছবি দেখতে চাই । তাঁর হাতের লেখাই বা কীরকম ?
জয়ন্তী দাশ
গুয়াহাটি ৩

তোমাদের কথামতো এই সংখ্যা আনন্দমেলায় সত্যজিৎ রায়ের ছবি ও অটোগ্রাফ দেওয়া হল ।

তারকা-যুদ্ধ

'তারকা-যুদ্ধের বিভীষিকা' (৯ জুলাই ১৯৮৬) রচনাটিতে লেখক লিখেছেন যে, আমেরিকা লেসার রশ্মি আয়নার উপর প্রতিফলিত

করে ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করবে । কিন্তু যে লেসার রশ্মি বড়-বড় রকেট, প্লেন প্রভৃতি নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলে, তা কী করে আয়নার উপর প্রতিফলিত হবে ? আয়না তো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার এই কিশোর মনের অনুসন্ধিৎসা দূর করতে পারলে বাধিত হব ।
দেবাশিস জানা,
ফুলিপুর রোড, চেতলা
কলকাতা ২৭

লেখকের উত্তর : বোধহয় খেয়াল করোনি একটা কথা । বলেছি তো লেসার রশ্মিকে ফেলা হবে আয়নায় । যখন তা পড়বে আয়নার ওপর, তখন সে-আলো থাকবে ছড়ানো । এই অবস্থায় আলোর তেজ ও ধার থাকবে না তেমন । এই ছড়ানো আলোকে কেন্দ্রীভূত করা জন্যই না আয়নার দরকার ! কেন্দ্রীভূত হয়ে একটা বিন্দুতে গিয়ে পড়লে, তবেই সে-আলোয় সব চুরমার হয়ে যাবে । আর যেহেতু পৃথিবী থেকে পাঠানোর পর আলো যাবে ছড়িয়ে এবং পরে তাকে করতে হবে মোচার মতো ছুঁচোলো, সেহেতু আয়নাটি হতে হবে পেল্লায় বড় । আর একটা কথা । এই আয়না কিন্তু মুখ-দেখা আয়নার মতো নয় । এটি ধাতব আয়না ।

বাঘের কি ঘ্রাণশক্তি আছে

৯ জুলাই তারিখের আনন্দমেলা পত্রিকায় জিম করবেটকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী ভাল লাগল । তবে চঞ্চল পালের লেখার একটি অংশ নিয়ে কিছুটা সংশয় আছে । তিনি লিখেছেন, বাঘ মানুষের গায়ের গন্ধ পায় । কথাটা কি ঠিক ? বাঘের কি ঘ্রাণশক্তি আছে ? ভারতের বিভিন্ন ব্যাঘ্র-প্রকল্পের প্রধান কৈলাশ সাংখালা তাঁর বিখ্যাত 'টাইগার' বইয়ে বলেছেন, বাঘের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বেশ ভাল । মাটি শুঁকে তারা অন্য বাঘ বা বাঘিনীর আসা-যাওয়ার খবর টের পায় । কিন্তু সত্যিই কি তারা মানুষের গন্ধ পায় ? তা হলে শিকারিরা বাঘ শিকারের সময় কেন বাতাসের

বিরুদ্ধে দাঁড়ান ? বাঘ যাতে গন্ধ না পায়, তার জন্যই তো শিকারিরা ওরকম জায়গা বেছে নেন !
অতীশ ঘোষ, বেলঘরিয়া, কলকাতা

লেখকের উত্তর : বিখ্যাত বাঘ-বিশেষজ্ঞ অর্জুন সিং বলেছেন, বাঘের ঘ্রাণশক্তি আছে কি না এই প্রশ্নে দু'ধরনের মত প্রচলিত । কোনও-কোনও বিশেষজ্ঞ বলেন, বাঘের ঘ্রাণশক্তি তীব্র । অন্যরা বলেন, ঘ্রাণশক্তি আছে, তবে কম । অর্জুন সিং নিজেও এই দ্বিতীয় মতে বিশ্বাসী । 'দি ওয়াইল্ড লাইফ অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ই· পি· গি-র মতো বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বাঘের ঘ্রাণশক্তি ভালই । তবে সব সময় এই ঘ্রাণশক্তি বাঘকে কাজে লাগাতে হয় না । সুতরাং বাঘের ঘ্রাণশক্তি নিয়ে কোনও সংশয় থাকার কথা নয় ।

গত সংখ্যার উত্তর

(১) একমাত্র মানুষই লজ্জা পায়।
(২) ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক র‍্যাডিয়েশান। চলতি কথায় লাইট।
(৩) জামাইকা।

(৪) আগ্রা দুর্গ।
(৫) বাঁশ।
(৬) উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা।
(৭) শের শাহ্।

(৮) সুনীল গাওস্কর।
(৯) মিশিগান হ্রদ। অন্য চারটির খানিকটা পড়ে কানাডার এলাকায়।
(১০) শান্তি বর্ষ।
(১১) ব্লু হাউস।
(১২) ডিমস্টার।
(১৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কুইজ

নিল ও'ব্রায়েন

সেদিন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বললুম, "এত কাহিল দেখাচ্ছে কেন?" উত্তরে হেসে বলল, "অসুখ করেছিল। ভাগ্যিস পেনিসিলিন ছিল, তাই চটপট সেরে উঠেছি।"

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ছিলেন রোগজীবাণুবিৎ। জীবাণুর আক্রমণে যে-সব রোগ হয়, তাই নিয়ে যখন তাঁর গবেষণা চলছে, তখন ১৯২২ সালে তাঁর একবার সর্দিজ্বর হয়েছিল। সেই সময়, একটা পাত্রে রাখা রোগজীবাণুর কালচারের উপরে তাঁর নাক থেকে এক ফোঁটা সর্দি গড়িয়ে পড়ে। ফ্লেমিং তাতে এই ভেবে খুব ভয় পেয়েছিলেন যে, রোগজীবাণুর ওই কালচার হয়তো এতে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, যত রোগজীবাণুর সঙ্গে তাঁর ওই সর্দির ফোঁটার সংস্পর্শ ঘটেছে, সব বিলকুল মারা পড়েছে। অতঃপর বিজ্ঞানীদের ভাষায় যাকে 'অ্যাকটিভ এজেন্ট' বলা হয়, সর্দির থেকে ফ্লেমিং সেটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। কিন্তু দেখা গেল যে, রোগের যারা প্রধান বাহক, সেই জীবাণুদের বিরুদ্ধে লড়বার মতো ক্ষমতা ওই অ্যাকটিভ এজেন্ট-এর নেই।

এর ছ'বছর বাদে অবশ্য ফ্লেমিংয়ের জীবনে আর-একটা দৈব সুযোগ এসে গেল। স্টাফাইলোকক্কাস জীবাণুর যে 'কলোনি' তিনি তাঁর গবেষণাগারে গড়ে তুলেছিলেন, দূষিত বাতাসের সংস্পর্শে এসে তা 'ধ্বংস' হয়ে যায়। ফ্লেমিং কিন্তু নজর করে দেখলেন যে, রোগজীবাণুর উপরে ছত্রাকের একটা আবরণ পড়েছে, এবং সেই যেখানে সেই ছত্রাক জন্মেছে, স্টাফাইলোকক্কাস জীবাণুর কোনও চিহ্নই সেখানে নেই। জন্ম নিল পেনিসিলিন, যা ধ্বংস করেছে সেই রোগজীবাণুকে। বলা বাহুল্য, রোগজীবাণুনাশক এই যে ওষুধ, এর আবিষ্কারে ভাগ্যের ভূমিকা নেহাত অল্প নয়। এর মধ্যে অনেকটাই আসলে দৈব যোগাযোগের ব্যাপার।

(৭) Agnes Glinxha Bejaxhiu যাঁর নাম, অধিকাংশ মানুষ তাঁকে কোন্ নামে চেনেন?

(৮) এ-বছরে 'ন্যাশনাল বাটা ম্যারাথন' প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা বিভাগে যাঁরা জয়ী হয়েছেন, তাঁদের নাম কী?

(৯) এ-বছরের 'দাদাসাহেব ফাল্‌কে' পুরস্কার কে পেয়েছেন?
(১০) সাম্প্রতিক এডিনবরা কমনওয়েলথ গেমস্-এ সর্বকালের কনিষ্ঠ পদক-বিজেতার নাম কী?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

প্রশ্ন

(১) গান্ধীজিকে 'মিকি মাউস' বলেছিলেন কে?

(২) 'দি রিপাবলিক' কার রচনা?
(৩) 'ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস'-এর চলতি নাম কী?

(৪) টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম রানটি কার?

(৫) প্রথম বারের ওলিম্পিক হকির ফাইনালে ভারতীয় দলের অধিনায়ক কে ছিলেন?

(৬) এই প্রতীকটি কোন্ শহরের?

Amela—2 (20.8.86)

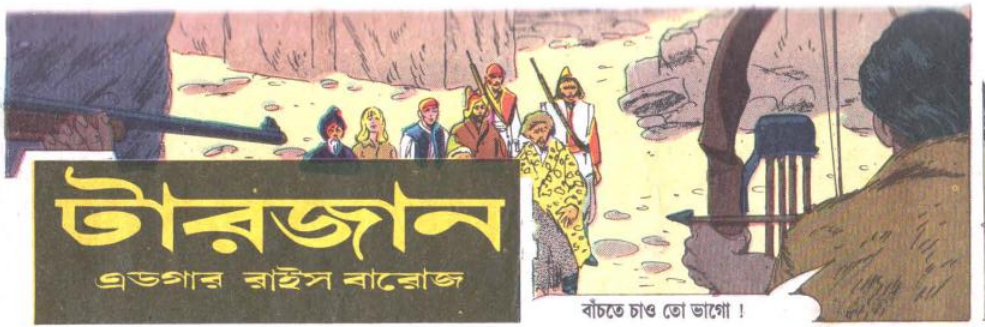

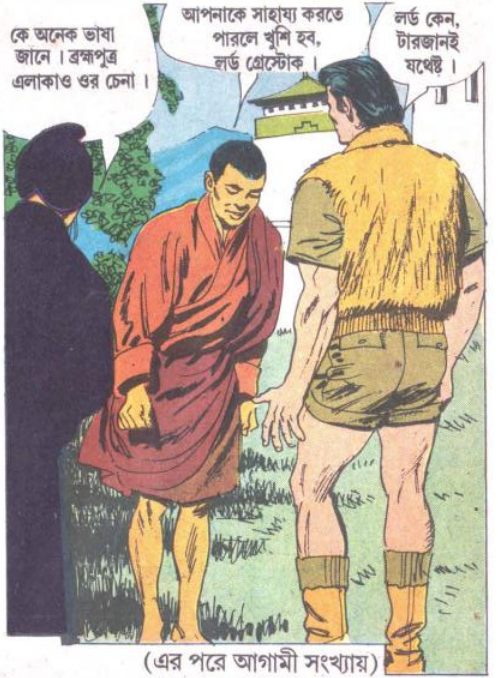

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ভুনিকাকার চৌরশতম

বিমল কর

আজকালকার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও ভীষণ চালাক-চতুর হয়ে উঠেছে। চট করে তাদের কিছু বিশ্বাস করানো যায় না।

আমি যখন বললুম, আমাদের লয়াবাদে ভুনিকাকার একটা চোর-ধরা খাতা ছিল, খাতার নাম ছিল 'চৌরশতম'—তখন আমার নাতনি বুলবুলি ধমক মেরে আমাকে থামিয়ে দিল। বলল, বাজে কথা বোলো না তো, চোর ধরার খাতা! তোমাদের লয়াবাদের গপ্প অনেক শুনেছি। ভুনিকাকা না আর কিছু! যত্ত সব বানিয়ে বানিয়ে গপ্প··· !

নাতনির ধমক খেয়ে আমি চুপ। কেমন করে তাকে বোঝাই, ভুনিকাকা আমার বানানো মানুষ নয়; ভগবান তাঁকে বানিয়েছিলেন। বানানোর পর ব্রহ্মা যখন তাঁকে মর্ত্যে পাঠান তখন বুঝতে পারেননি, ঠিকানা ভুল হয়ে গেছে। ধোপার বাড়িতে কাপড় কাচতে দিলে মাঝে-মাঝে অন্যের কাপড়-জামা যেমন এ-বাড়িতে চলে আসে, দাগ ভুল হয়ে; কিংবা নম্বর ভুল হয়ে লন্ড্রি থেকে যেমন অন্যের ধুতি-পাঞ্জাবি আমার কাছে চলে এসেছে কখনও-সখনও, এটাও সেই রকম ভুল। ভুনিকাকার যাবার কথা ছিল লণ্ডনে—ভুল করে লয়াবাদে এসে পড়েছেন। তাতে অবশ্য কাকার দুঃখ ছিল না। বলতেন, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি! লয়াবাদের লোকরা অবশ্য বলত, ঠিকানা ভুল নয়, ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট।

আমরা কি অত বুঝতাম তখন! বারো-তেরো বছরের ছেলেপুলে সব, ভুনিকাকা যা বলত তাই বিশ্বাস করতাম। খাতিরও করতাম সেই রকম। কেন করব না? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে ভুনিকাকার নামে চিঠি আসত। কোথায় বিলেত, আর কোথায় লয়াবাদ।

আমাকে চুপচাপ দেখে বুলবুলি বলল, "কৈদেই ফেললে যে! ঠিক আছে, তোমাদের লয়াবাদের ভুনিকাকার গপ্প বলো। এই কিন্তু লাস্ট। আর কোনওদিন বলবে না লয়াবাদের গপ্প। শুনে-শুনে কান পচে গেছে।" বলে নিতান্তই যেন আমাকে দয়া দেখাতে একটু গা ঘেঁষে বসল।

খানিকটা চুপ করে থেকে আমি বললাম, "তোরা যেসব লোকজন দেখিস, এরা লোকই নয়; লোক ছিল ভুনিকাকা।···গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, বুঝলি! কিং কং-এর প্রথম ডিজাইন যে ভুনিকাকার মাথায় এসেছিল এটা কেউ বিশ্বাস করবে! কপাল মন্দ না হলে কাকা তখনই ফেমাস হয়ে যেত।"

"বেশ তো বাবা, কিং কং হংকং—তোমাদের ভুনিকাকার মাথায় এসেছিল। এখন তার গপ্প বলো। তার ক'টা হাত ছিল, পা ছিল, নাক ছিল, বলে যাও···।"

"ইয়ার্কি মারিস না। ভুনিকাকার হাত-পা দুটো করেই ছিল। মাথাও ছিল একটা। কিন্তু সেই মাথার মধ্যে ছিল ক্যালকুলেটর। তখনকার দিনেই।"

"ব্যাটারি দেওয়া?" বুলবুলি ঠাট্টা করে বলল। ক্যালকুলেটর সে দেখেছে। জানে। কাজেই ঠাট্টা করল। আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল। এত পাকামি করে!

"এই, তুই গপ্প শুনবি তো চুপ করে বসে শোন, বকবক করবি না।"

"বলো না গপ্প! বলছ কোথায়?"

আমি বললাম, "শোন তা হলে। ভুনিকাকার আসল নাম ছিল ভানু মুখুজ্যে। ভানু থেকে ভুনি হয়েছিল। ভুনিকাকার চেহারা ছিল দেখার মতন। ইয়া লম্বা, অ্যায়সা চওড়া। মুখ ছিল গোল। মাথাখানা হাঁড়ির মতন। চোখ দুটো বড়-বড়। মোচ ছিল, মদ্দা মোচ। কাকা লয়াবাদে এসেছিল বাইশ-চব্বিশ বছর বয়েসে। চাকরি নিয়ে। এসেই একটা চোর ধরেছিল, পাকা চোর, সে নাকি এমন বড় দরের চোর ছিল যে, পুলিশ তাকে মেডেল দিয়েছিল।"

"চোরকে আবার কেউ মেডেল দেয় নাকি?" নাতনি আমাকে এক ধাক্কা মারল।

"দেয়। বড়-বড়দের দেয়। বড়দের সম্মানই আলাদা। কাগজে নাম ছাপে, ছবি ছাপে।··· তবে এ-মেডেল অন্যরকম। গলায় ঝুলিয়ে

ঘুরতে হত না। হাতে পরে থাকতে হত। তাবিজের মতন। না পরলেই কোতয়ালিতে ধরে নিয়ে যেত।"

"তোমাদের ভুনিকাকা কি পুলিশে চাকরি করত?"

"একেবারেই নয়। ভুনিকাকা ছিল রেলের গার্ডসাহেব। মালগাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াত।"

"ও! তারপর?"

গল্পটা বলতে বসে বারবার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল বলে এবার একটু রাগ করে বললুম, "নো টকিং। চুপ করে শোন। না হলে আমি উঠে যাব।"

হেসে হেসে নাতনি আমার গলা জড়িয়ে বলল, "বলো, বলো।"

গল্পটা আবার শুরু করলাম।

"ভুনিকাকা মানুষটা ছিল সব দিক দিয়ে দেখার মতন। চেহারার কথা তো আগেই বলেছি, বিশাল। দৈত্য যেন। খাওয়া-দাওয়াও ছিল সেই রকম। এক হাঁড়ি ভাত, দু'বাটি অড়হর ডাল, ঠিক পঁচিশখানা লাল গমের রুটি, আধ পো ভঁইসা ঘি, সের-দেড়েক মাংস, এক সের রাবড়ি—মানে খেতে ইচ্ছে করলে পালোয়ানের খাওয়া খেতে পারত কাকা। নেশার মধ্যে ছিল নস্যি, আর ছিপ বগলে করে মাছ ধরতে যাওয়া। অমন চেহারা, ওই খাওয়াদাওয়া হলে কী হবে, ভুনিকাকার মন ছিল নরম, একেবারে সরল। শিশুর মতন। ভুনিকাকা বিয়ে করেনি। বাড়িতে ছিল দিদি। আমরা বলতাম, লক্ষ্মীপিসি।

"ভুনিকাকা লয়াবাদে এসেই একটা পাকা চোর ধরেছিল, তখনকার দিনের সবচেয়ে বড় চোর। অবশ্য তখন আমরা জন্মাইনি। আমরা যখন কাঁথায় শুয়ে তখনই নাকি ভুনিকাকার পঞ্চাশটা চোর ধরা হয়ে গিয়েছিল। আসলে প্রথম চোরটা ধরার পর ভুনিকাকার দারুণ নাম হয়ে গিয়েছিল। সেই খ্যাতির চোটে চুরিচামারি হলেই লোকে এসে ভুনিকাকাকে ধরত। তা আমাদের যখন দশ-বারো বছর বয়েস, তখন কাকা আশি পেরিয়ে গেছে। আশি মানে বয়েসে আশি নয়, চোর ধরার ব্যাপারে আশি ক্রস করেছে।"

বুলবুলি তার চোখের গোল গোল চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, "বছরে ক'টা করে চোর ধরত তোমাদের ভুনিকাকা?"

এ একেবারে অঙ্কের ব্যাপার! অঙ্ক আমার মাথায় আসে না। আন্দাজে বললাম, "তা ধর, বছরে তিনটে-চারটে। কম করে দুটো।"

নাতনি মনে-মনে অঙ্ক কষতে লাগল।

আমি বললাম, "তোকে হিসেব করতে হবে না। আমি কি গুনে রেখেছি ক'টা করে চোর ধরত ভুনিকাকা! আশি পেরিয়ে গিয়েছিল এই মাত্র বলতে পারি।"

"তুমি একেবারেই ম্যাথ্ জানো না। বছরে দুটো করে চোর ধরলে আশিটা চোর ধরতে চল্লিশ বছর লেগে যাবে। চারটে করে ধরলে কুড়ি বছর। তোমাদের জন্মের আগেই পঞ্চাশটা চোর ধরা হয়ে গিয়েছিল বলছ। তা হলে পরের দশ-বারো বছরে আড়াই না তিন করে ধরেছে··· ?"

"প্লিজ! তুই বড় ফ্যাচাং করিস। আমি কি খাতা-কলম নিয়ে গল্প শোনাতে বসেছি। না ভাল লাগে উঠে যা···।"

বুলবুলি আমার ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি দিয়ে হেসে-হেসে বলল, "না না, বলো তুমি। ভুনিকাকার সেঞ্চুরি করতে আর ক'বছর লাগল গো দাদুমণি?"

কী পাকা মেয়ে! কেমন ঠোক্করটা মারল আমায়। বললাম, "এ কি তোদের গাভাসকর, ফটাফট সেঞ্চুরি করবে! চোর ধরা আর

আপনিও পড়ুননা, কিভাবে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী প্রকৃতির কোমলতা দিয়ে শীলার রঙ এমন ফর্সা করে তুলেছে যে সবাই ওর দিকে তাকিয়েই থাকছে।

একদিনের জন্য আপনাকে সাজতে হবে মনোরমা বিয়ের কনে, আর সারাজীবন হয়ে থাকতে হবে একজনের মনোরমা স্ত্রী। সেজন্যেই তো শীলা আজও ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী লাগায়, প্রতিটি দিন, সকালে সন্ধ্যায়, ঠিক বিয়ের আগেও ও যেমনটি করতো। শীলারই মত আপনার ফর্সা রঙরূপের স্বপ্নও সফল হতে পারে, এই ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী দিয়ে।

জরুরী এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীতে এমন এক অনন্য ফর্মুলা আছে, যা উল্লেখযোগ্য দু'রকম উপায়ে কাজ ক'রে আপনাকে স্বাভাবিকভাবেই করে তোলে আরো ফর্সা। প্রথমত : এটি ত্বকের ভেতর গভীরভাবে প্রবেশ ক'রে ত্বক ময়লা করার প্রক্রিয়াকে ভেতর থেকেই এমনভাবে রোধ করে যা অন্য কোন ক্রীমের সাধ্য নেই।

দ্বিতীয়তঃ এর দ্বিগুণ সানস্ক্রীন ক্রিয়া, রঙ ময়লা-করে-দেওয়া প্রখর রোদের হাত থেকে ত্বককে রাখে পুরোপুরি সুরক্ষিত। সেজন্যেই তো ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে যে নতুন ত্বকের পরত ফুটে বেরোয় তা হয় কত উজ্জ্বল, আর কত ফর্সা! প্রতিদিন, দিনে দুবার করে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী লাগান, আর ত্বকে পান, চিরকালের জন্যে স্বাভাবিক ফর্সা রঙ···কোমলতায় গড়া, সৌন্দর্য্যে ভরা।

ব্যবহারের নিয়ম :

হাতমুখ ধুয়ে মুখমণ্ডল, ঘাড়, গলা ও বাহুতে অল্প অল্প ক্রীম লাগান। হাতটি উপরের দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হালকা-ভাবে মালিশ করুন। ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী প্রভাব দেখাতে শুরু করলেই হয়তো আপনার ত্বক সামান্য চিন্‌চিন্ করতে পারে, কিন্তু তার জন্যে ঘাবড়াবেন না, খুব শিগ্‌গিরই তা ঠিক হয়ে যাবে।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী সম্বন্ধে যদি আরও কিছু জানার থাকে তাহলে এই ঠিকানায় লিখুন :

শ্রীমতি কবিতা কুমার, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী পরামর্শদাতা, পো : আ : বক্স ৭৫৮, বম্বে ৪০০ ০২১।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী-র আগে

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী-র পরে

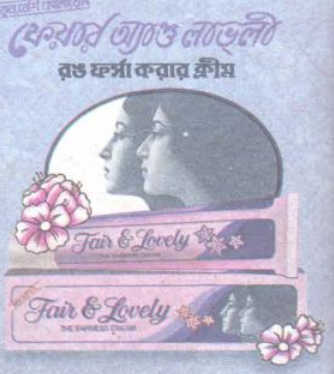

প্রকৃতির কোমলতায় রঙ এমন ফর্সা করে দেখে চোখে পলক পড়েনা।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

ক্রিকেট খেলা এক জিনিস নয় গো নাতনি !"

"সেঞ্চুরি হয়নি ?"

"সেটাই তো গল্প ! শুনছিস কোথায় তুই ! ভুনিকাকা নব্বুই পেরোল টপাটপ। বছর-দুই আমাদের লয়াবাদের আশেপাশে ভীষণ চুরি বেড়ে গিয়েছিল। মানে, ভুনিকাকার জন্যে লয়াবাদে চোর-ছ্যাঁচোড় উৎপাত করতে না পেরে আশেপাশে জড়ো হচ্ছিল। যত চুরি-চামারি সেখানে। তারা এসে কোতোয়ালিতে নালিশ করল ! বলল, এটা হচ্ছে কী ? এ-দিককার চোর-ছ্যাঁচোড়রা ওদিকে চলে যাচ্ছে। তাদের অন্ন তোমরা উঠিয়ে দিচ্ছ, আর আমরা মরছি। হয় ভুনিকাকাকে লোন্ দাও, আমাদের ওদিককার চোর ধরে দিক ; না-হয় তোমরা তোমাদের চোর রিটার্ন নাও।"

বুলবুলি হেসে ফেলল। বলল, "তোমাদের ভুনিকাকা অন্যদের জায়গায় চোর ধরতে গেল ?"

"ঠিক বলেছিস। উপায় কী না গিয়ে। কোতয়ালির দারোগা এসে বলল, 'এ ভুনিবাবু, কুছু চোর ইধারে লিয়ে আসুন। সব উধারে চলে গেলে হামলোগকো জিঁলাবি-উলাবি কোন্ খিলাবে ?'"

"চোররা পুলিশকে জিলাবি খাওয়ায় ?"

"ওখানে খাওয়াত। জিলিপি, গজা, বালুসাই, পান-জরদা··· আরও কত কী ! চোর না-খাওয়ালে যাদের বাড়িতে চুরি হত তারা সেপাইদের খাওয়াত। বাড়িতে এলে অতিথিকে খাওয়াতে হবে না ?"

"ও ! তা ভুনিকাকা কী করল ?"

"করবে আর কী ! বেপাড়ায়, মানে অন্য জায়গায় গিয়ে চোর ধরতে লাগল। এক বছরেই আট-দশটা ধরে ফেলল। নব্বুই পেরিয়ে গেল।"

"ছক্কা মেরে-মেরে নব্বুই পেরোল।"

"তা বলতে পারিস।"

"তারপর ?"

"তারপরই হল মুশকিল। বিরানব্বুই না চুরানব্বুই পেরোবার পর আর চোর পাওয়া যায় না। চোরের আকাল পড়ে গেল। আমাদের লয়াবাদ নি-চোর হয়ে গেল। বড়-বড় চোরদের কথা বাদ দে, ছিঁচকে চোর, ঘটিবাটি-চোর, কাপড়-চোর, আলুপটল-চোর, কোনও চোরই আর পাওয়া যায় না। কী বিশ্রী অবস্থা ! লোকে দরজা-জানলা হাট করে খুলে রাখে, কলতলায় ঘটিবাটি ফেলে রাখে, কাপড়চোপড় সময়মতন তুলে নেয় না। জানে কোনও জিনিসটি চুরি যাবে না, যেমনটি যে-জায়গায় আছে তেমনি পাওয়া যাবে।"

"তোমাদের ভুনিকাকার খুব মনখারাপ হচ্ছিল নাকি ?"

"ভীষণ। ভুনিকাকার খাওয়া কমতে লাগল। মুখের হাসি গেল, ছিপ বগলে করে মাছ ধরতে যাওয়া বন্ধ হল, শুকিয়ে যেতে লাগল কাকা !"

"কেন ?"

"সেটাই তো কথা। ভুনিকাকা চৌরশতম্ বলে যে-খাতাটা লিখছিল, সেটা বই করে বের করার ইচ্ছে। চুরানব্বুইয়ে এসে আটকে যাচ্ছে। বাকি ছ'টা পায় কোথায় ?"

"সত্যি তো ! কোথায় পাবে ?"

"একটা বছর হাত গুটিয়ে বসে থাকার পর কাকা একটা কুকুর-চোর ধরল। মল্লিক ডাক্তারের বাড়ি থেকে একটা লোক মল্লিকদের নেড়িফক্সের ছানা নিয়ে পালাচ্ছিল। কাকা হাতেনাতে ধরে ফেলল।"

"নাইনটি ফাইভ ?"

"হ্যাঁ। পঁচানব্বুই। আর পাঁচটা।"

"ইশ্— ! কোনও রকমে একটা ছক্কা— !"

"কোত্থেকে মারবে ভুনিকাকা ছক্কা ? লয়াবাদ যে ফক্কা হয়ে রয়েছে। চোর নেই। কাকার চোখে জল পড়তে লাগল। বড়-বড় নিশ্বাস ফেলত।"

"বেচারি ?"

"মাস চার-পাঁচ অপেক্ষা করে ভুনিকাকা বলল, 'ঠিক আছে, ব্যবস্থা হচ্ছে।' ব্যবস্থাটা কী বলতে পারিস ?"

"কেমন করে বলব ?"

"তা হলে শোন ব্যাপারটা। ভুনিকাকার দেহটা যেমনই হোক মনটা ছিল নরম, মায়ায় ভরা। কারও কষ্ট সহ্য করতে পারত না। কাকা যে চোর ধরত তাদের কী করত জানিস ?"

"থানায় ধরিয়ে দিত ?"

"না না। গোড়ায় দু-একবার দিয়েছিল। তারপর চোরদের কান্নাকাটি দেখে আর থানায় দিত না।"

"কী করত ?"

"বলেছি না, ভুনিকাকা মালগাড়ির গার্ডসাহেব ছিল। কাকা করত কী, ধরাপড়া চোরগুলোকে নিজের গাড়িতে, মানে ব্রেকভ্যানে বসিয়ে নিয়ে তিরিশ পঞ্চাশ ষাট একশো মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে কোথাও নামিয়ে দিত। বলত, 'যা, আর চুরি করবি না, খেটে খেগে যা।' এক-আধটা টাকাও তাদের হাতে দিয়ে দিত ভুনিকাকা।"

"সেই প্রথম থেকে ?"

"হ্যাঁ রে, দু-চারটে বাদ গিয়েছে। গোড়ার দিকে যাদের নামিয়ে দিয়ে এসেছিল, তারা তো এতদিনে বুড়োসুড়ো হয়ে গিয়েছে। তাদের আর পাত্তা পাবে কোথায় ! চোররা স্বভাব পালটেছে, না, এখনও ছেলেপুলেকে চুরিবিদ্যে শেখাচ্ছে কে জানে !"

"ভুনিকাকা কী করল, তাই বলো ?"

"কাকা বলল, 'দাঁড়া, মাথায় বুদ্ধি এসেছে। দু-পাঁচ বছর আগে যাদের আদ্রা, বাঁকড়ো, চক্রধরপুরে ছেড়ে এসেছি, তাদের খোঁজ করে ক'টাকে ধরে আনব। পাঁচটা হলেই আমার হয়ে যাবে। বই শেষ।'"

বুলবুলি গালে হাত তুলে অদ্ভুত এক শব্দ করল।

আমি বললাম, "তারপর কী হল শোন। ভুনিকাকা মাসখানেক পর থেকে একটা-দুটো করে পুরনো চোর ধরে আনতে লাগল লয়াবাদে। এনেই আবার ধরতে লাগল। নিরানব্বুই হয়ে গেল। চৌরশতম্ বই রেডি। কলকাতার ছাপাখানাকে টাকাপয়সা দিয়ে ছাপার ব্যাপার সব ঠিক করে ফেলল ভুনিকাকা। আর মাত্র একটা। অন্‌লি ওয়ান। তা শেষ চোরটাকে আনবার সময় ভুনিকাকাতে আর চোরেতে একটা শর্ত হয়ে গেল। চোর বলল, 'বাবু, আমি ধরা পড়তে রাজি। কিন্তু ধরা পড়ার পর আপনি আমাকে আপনার মালগাড়ি করে পাচার করতে পারবেন না। আমাকে থানায় জমা করে দিতে হবে।' ভুনিকাকা রাজি হয়ে গেল। বইটা শেষ করাই আসল। একটার জন্যে আটকে থাকবে নাকি ?"

"লাস্ট চোর আমাদের লয়াবাদে এল ?"

"এল। ধরা পড়ল। থানায় জমা করা হল তাকে। ভুনিকাকার চৌরশতম্ বইও ছাপা হয়ে বেরোল ! কিন্তু তোকে কী বলব রে, বুলবুলি, দেখতে দেখতে লয়াবাদে চোরে-চোরে ছেয়ে গেল। পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে কত চোর হয়ে গেল !"

"তোমাদের ভুনিকাকা কী করল ?"

"ভুনিকাকা আর চোর ধরত না। বলত, কেষ্টর জীব। থাকুক। থানা-পুলিশ যা করার করুক। আমি আর চোর ধরব না। বুড়ো হয়ে গিয়েছি। রিটায়ার করেছি। লোকের মনে আর কষ্ট দেব না। ভুনিকাকার বইটা আর পাওয়া যায় না। ফুরিয়ে গেছে। নয়তো হরেক রকম চোরের গল্প শোনাতে পারতাম তোকে।"

ছবি : বিমল দাস

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিষ্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট
ফর্মুলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা
খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ
আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

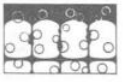

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা
দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী
খাবারের কণাগুলো বার করে আনে,
রোগজীবাণু হ'তে দেয় না।

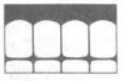

ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল,
নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত
মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।

কি তাজা মিষ্টি স্বাদ!

বিশ্বকাপ

মৃণাল বসুচৌধুরী

নিতাই খুড়োর যে ছেলেটি নিত্য ভোগেন বাতে,
বিশ্বকাপের খেলা দেখতে গ্রীষ্মকালের রাতে—
টিভি'র সামনে বসে থাকেন আগেভাগেই একা—
পাড়ার লোকে ভিড় করলে যদি না যায় দেখা ;
খেলা ঘিরে অনেক রঙিন স্বপ্ন ছিল তাঁর—
হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় সমস্ত ছারখার ;
মারাদোনার খেলা দেখে মন ভরে যায় সুখে—
অদৃশ্য এক দুঃখ তবু কাঁপন লাগায় বুকে ।
খেলোয়াড়রা আঘাত পেলে বুজিয়ে ফেলেন চোখ
নিজের পায়ের জন্যে তখন হঠাৎ বাড়ে শোক ।
দিনরাত্তির এখন তাঁর একটি আরাধনা—
সুস্থ এবং সবল থাকুক, সকল মারাদোনা !

নদীর গল্প

শিবময় দাশগুপ্ত

নৌকোর সারি বাতাসে অল্প দোলে
জাহাজের বাঁশি দূর থেকে শোনা যায়,
মজার শহরে রাত্তির ঘন হলে...
খোকা ঠায় জেগে বসে থাকে জানলায় ।
জেলেদের জালে মাছের রুপোলি ঝাঁকে,
গাঙফড়িংয়ের সবুজ ডানায় ঝরে
সকালের রোদ, দুপুরে চিলের ডাকে
নদীটির কথা সারাদিন মনে পড়ে !
পিতল-রঙের সামান্য জলধারা,
জোয়ার-ভাটায় মিশে আছে মা'র স্নেহ
জলে ছায়া ফেলে চন্দ্র-সূর্য-তারা,
একটিবারের স্নানেতে জুড়োয় দেহ ।

এ নদী তোমার, খোকার, আমারও প্রিয়,
যে না চেনে, তাকে গল্পটি বলে দিও ।

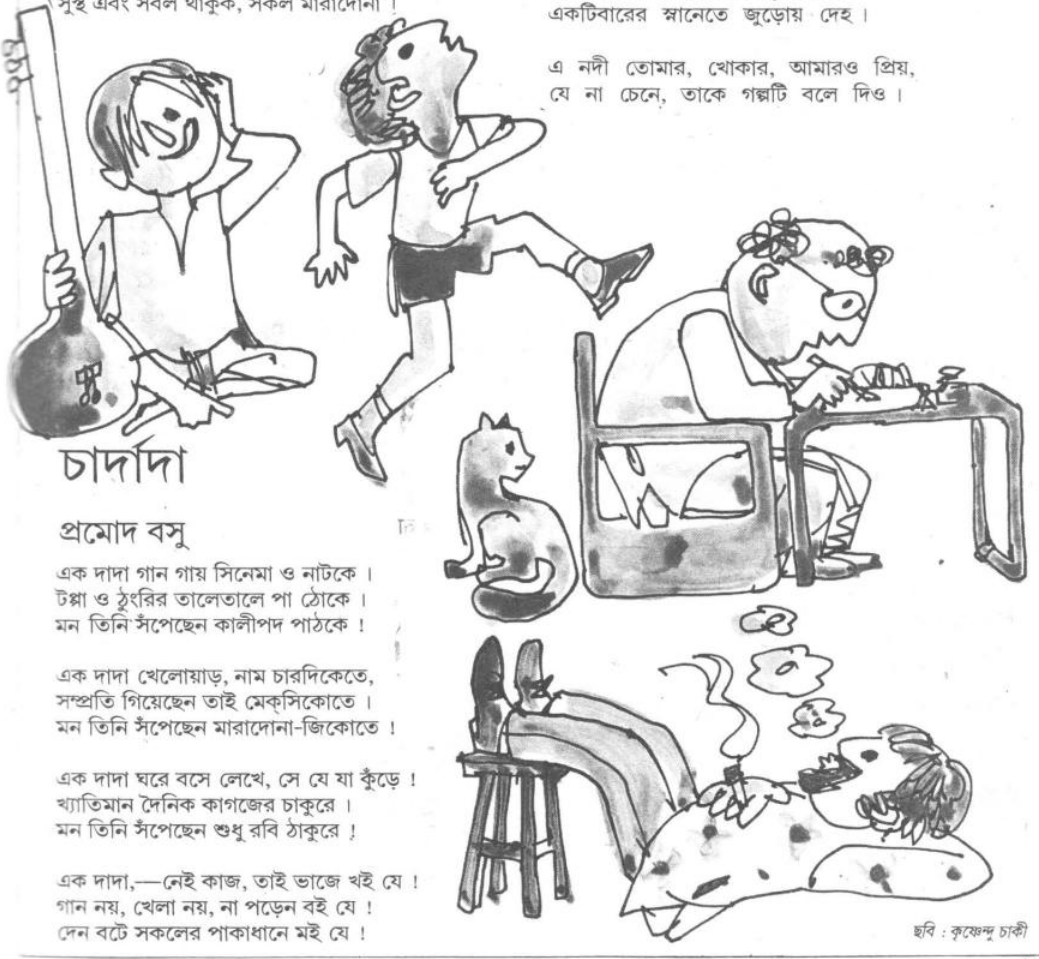

চাদাদা

প্রমোদ বসু

এক দাদা গান গায় সিনেমা ও নাটকে ।
টপ্পা ও ঠুংরির তালেতালে পা ঠোকে ।
মন তিনি সঁপেছেন কালীপদ পাঠকে !

এক দাদা খেলোয়াড়, নাম চারদিকেতে,
সম্প্রতি গিয়েছেন তাই মেক্সিকোতে ।
মন তিনি সঁপেছেন মারাদোনা-জিকোতে !

এক দাদা ঘরে বসে লেখে, সে যে যা কুঁড়ে !
খ্যাতিমান দৈনিক কাগজের চাকুরে ।
মন তিনি সঁপেছেন শুধু রবি ঠাকুরে !

এক দাদা,—নেই কাজ, তাই ভাজে খই যে !
গান নয়, খেলা নয়, না পড়েন বই যে !
দেন বটে সকলের পাকাধানে মই যে !

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

নীলমূর্তি রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সন্তু এখন কলেজে পড়ে। একদিন সে তার দুই সহপাঠী জোজো আর অরিন্দমের সঙ্গে বারুইপুর বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে জোজোর পিসেমশাই অংশুমান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। কথায় কথায় তিনি কাকাবাবুর কথা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। কাকাবাবুকে তিনি তাঁর জীবনের প্রধান শত্রু বলে মনে করেন, কাকাবাবু নাকি একবার আফগানিস্তানে অংশুমান চৌধুরীকে অপমান করেছিলেন। পরদিন থেকে তিনি লোক মারফত কাকাবাবুর কাছে অদ্ভুত সব জিনিস পাঠাতে লাগলেন। এদিকে দু'জন ভদ্রলোক এসে কাকাবাবুকে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে একটা মূর্তি চুরি করে আনার প্রস্তাব দিলে তাঁর দারুণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তারপর....

আজ সন্তুর কলেজ ছুটি, আজ সে কাকাবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবে। অংশুমান চৌধুরী এসব কী অদ্ভুত জিনিস পাঠাচ্ছেন ? ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি সেদিন সন্তুর ভাল লাগেনি। কাকাবাবুর ওপর খুব রাগ। উনি কাকাবাবুর কিছু একটা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবেন নিশ্চয়ই। অথচ ওঁর কথা সন্তুর মুখে শুনে কাকাবাবু একটুও পাত্তাই দিলেন না।

আজ যে বাক্সটা পাঠিয়েছেন, সেটার মধ্যেও প্রায় কিছুই নেই বলতে গেলে। চৌকো কাগজের বাক্সটা সুন্দরভাবে প্যাক করা, ওপরে কাকাবাবুর নাম লেখা। কিন্তু ভেতরে যে জিনিসটা রয়েছে, সেটা কেউ এরকম প্যাকেট করে পাঠাতে পারে, তা বিশ্বাসই করা যায় না। একটুখানি আলুর তরকারি : দু-তিন টুকরো আলু, তাতে মশলা মাখানো, কিন্তু ঝোল নেই। একেবারে শুকনো।

প্রথম দিন এল দু-তিনটে মানুষের চুল। তারপর এক চিমটে আলুর তরকারি। এর তো মাথা-মুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। কালকের বাক্সটা দেখে কাকাবাবু কোনও মন্তব্যই করেননি, কিন্তু সন্তু যে এই ব্যাপারটা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না।

কাকাবাবু এখনও মর্নিংওয়াক থেকে ফেরেননি। দরজার কলিংবেল শুনে সন্তু ছুটে গেল। খাকি প্যান্ট ও খাকি হাফ-শার্ট পরা একজন পিওন-শ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "ইয়ে রায়চৌধুরী বাবুকা কোঠি হ্যায় ? সাহাব হ্যায় ঘর মে ?"

সন্তু বলল, "না, সাহেব আভি নেহি হ্যায়। আপকা কেয়া জরুরত হ্যায় ?"

লোকটি বলল, "হামারা সাহাব রায়চৌধুরীবাবুকো বুলায়া।"

সন্তু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপকা সাহাব কৌন হ্যায় ?"

লোকটি পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বার করে সন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ইসমে লিখা হ্যায়। রায়চৌধুরীবাবু লৌটনেসে তুরন্ত ইধার যানে বলিয়ে ! বহুতই আর্জেন্ট হ্যায়।"

লোকটি কাগজটা দিয়ে চলে গেল। কাগজটি খুলে সন্তু আর-একপ্রস্থ অবাক হল। একটা সাধারণ হ্যাণ্ডবিল। পার্ক স্ট্রিটের একটা কাপড়ের দোকানের নাম লেখা, বিজ্ঞাপন হিসেবে এরকম কাগজ রাস্তায় ছড়ানো হয়। ঠিকানার নীচে কেউ লাল কালির দাগ দিয়ে হাতে লিখে দিয়েছে ওয়ান পি· এম·।

সন্তুর চড়াত করে রাগ ধরে গেল। কাকাবাবুকে কেউ কখনও পিওন দিয়ে ডেকে পাঠায় না। কাকাবাবু সচরাচর কারও বাড়িতে যান না। কারও খুব দরকার থাকলে বাড়িতে এসে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে। কাকাবাবুর তো ডিটেকটিভগিরি করা পেশা নয়। চুরি-ডাকাতি বা খুন-জখমের কেস নিয়ে যারাই আসে, কাকাবাবু তাদের বলেন, 'আমার কাছে এসেছেন কেন, পুলিশের কাছে যান।'

আর এই লোকটার এত সাহস, সাধারণ একটা হ্যাণ্ডবিল পাঠিয়ে সেই ঠিকানায় কাকাবাবুকে দেখা করতে বলেছে ? কে লোকটা ? এখনও দৌড়ে গেলে হয়তো ওই পিওনটিকে ধরা যায়। কিন্তু ও সম্ভবত কিছুই বলতে পারবে না!

কাকাবাবু ফিরলেন একটু পরেই।

সন্তু প্রথমেই বলল, "কাকাবাবু, বারুইপুরের অংশুমান চৌধুরী কাল তোমাকে একটা বাক্স পাঠিয়েছিলেন, সেটা তুমি দ্যাখোনি ?"

কাকাবাবুর মুখখানা আজও থমথমে, কোনও ব্যাপারে খুব চিন্তিত। গম্ভীর ভাবে বললেন, "হ্যাঁ, দেখেছি, ওর মধ্যে তো কিছু নেই। যা ছিল তুই বার করে নিয়েছিস ?"

"না তো। বাক্সটা ওইরকম ভাবেই এসেছে। ওর মধ্যে শুধু কয়েকটা চুল পড়ে আছে। মানুষের চুল বলেই মনে হয়।"

"চুল ?"

"হ্যাঁ। আজও একটা বাক্স এসেছে। তার মধ্যে যা আছে, সেটাও পাঠাবার কোনও মানে বুঝতে পারছি না।"

"আজ আবার কী এসেছে, দেখি !"

সন্তু দৌড়ে গিয়ে দ্বিতীয় বাক্সটা নিয়ে এল। কাকাবাবু সেটার মধ্যে কয়েক পলক দেখলেন মাত্র। তারপর বিরক্তভাবে বললেন, "ধ্যাত্ ! এ তো মনে হচ্ছে কোনও পাগলের কাণ্ড। ফেলে দে। এগুলো সব ফেলে দে !"

তারপর সন্তু একটু আগের হ্যাণ্ডবিলটার কথা বলল। কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, "এই দোকানে আমি কখনও যাইনি। চেনা কেউ পাঠায়নি। মনে হচ্ছে, কেউ-কেউ আমাকে অকারণে বিরক্ত করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। তাদের তাদের কী লাভ কে জানে !"

"কাকাবাবু, তুমি অংশুমান চৌধুরীকে একেবারেই চেনো না ?"

"কিছুই তো মনে পড়ছে না। তা ওইসব বাক্সটাক্স না পাঠিয়ে উনি নিজে এসে দেখা করলেই তো পারে।"

"আমার বন্ধু জোজোকে ডাকব। ওর পিসেমশাই হয়, ও অনেক

কিছু বলতে পারবে, তাতে তোমার মনে পড়ে যেতে পারে।"

"এরকম পাগলকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না এখন। তবু ঠিক আছে, ডাকিস তোর বন্ধুকে, শুনে দেখব!"

এরপর কাকাবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

সন্তু ঠিক করল, দুপুরবেলাতেই সে বেরিয়ে জোজোকে ডেকে আনবে। জোজো কাকাবাবুর সামনে কতরকম গুল ঝাড়তে পারে, সেটা দেখা যাক।

একটু বাদেই অরিন্দম এসে হাজির হল, সন্তু খুশি হয়ে বলল, "তুই এসেছিস, ভালই হয়েছে। চল, একটু পরে জোজোদের বাড়ি যাব। জোজোর সেই পিসেমশাই কী কাণ্ড করেছে জানিস? কাকাবাবুকে রোজ একটা করে বাক্স পাঠাচ্ছে।"

অরিন্দম বলল, "কিসের বাক্স?"

সন্তু ওকে সব ব্যাপারটা খুলে বলল। বাক্স দুটো এনে দেখাল।

অরিন্দম হেসে উঠে বলল, "আরে, জোজোর পিসেকে দেখে আমি ভেবেছিলুম, দ্বিতীয় এক প্রোফেসর শঙ্কু। এখন দেখছি বোম্বাগড়ের রাজা! ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা। অতদূর থেকে লোক দিয়ে এতবড় একটা বাক্স ভরে পাঠাচ্ছে এঁটো দু' টুকরো আলুর দম! কেন বাবা, বেশি করে পাঠালেই পারত, আমরা খেয়ে নিতুম! আর এগুলো যে মানুষের চুল তুই কী করে বুঝলি, সন্তু? ভাল্লুকের লোমও তো হতে পারে!"

সন্তু বলল, "উনি জন্তুজানোয়ার সহ্য করতে পারেন না, মনে নেই? সেই জন্যই আমি বুঝে নিয়েছি মানুষের চুল।"

অরিন্দম বলল, "আমার বড়-জামাইবাবু সায়েন্স কলেজে পড়ান। তাঁকে ওই নামটা বললুম, বড়-জামাইবাবু বললেন, তিনি ওই নাম জন্মে শোনেননি। তবে সেলফ মেইড সায়েন্টিস্ট হতে পারে। এরকম অনেক আছে। নিজের বাড়িতে কয়েকটা যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তারপর নিজেদের সায়েন্টিস্ট বলে প্রচার করে।"

"কাকাবাবুর ওপর এত রাগ কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। কাকাবাবুও কিছুই মনে করতে পারছেন না।"

হঠাৎ ওপর থেকে কাকাবাবু জোরে জোরে ডাকলেন, "সন্তু! সন্তু!"

অরিন্দম বলল, "তোকে কাকাবাবু ডাকছেন, যা শুনে আয়। আমি এখানে বসছি।"

সন্তু বলল, "তুইও চল না আমার সঙ্গে। কাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

কাকাবাবু অরিন্দমকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এই-ই তোর বন্ধু জোজো নাকি?"

সন্তু বলল, "না, এর নাম অরিন্দম। এই অরিন্দমও আমাদের সঙ্গে বারুইপুরে গিয়েছিল।"

কাকাবাবুর মুখে এখন সেই গাম্ভীর্যের ভাবটা নেই। বরং ঠোঁটে চাপা হাসি। তিনি বললেন, "ওই বারুইপুরের ভদ্রলোকের বাড়িতে টেলিফোন আছে?"

সন্তু বলল, "তা তো ঠিক বলতে পারছি না। লক্ষ করিনি।"

"এ ভদ্রলোকের দেখছি সত্যিই মাথায় ছিট আছে। উনি আমায় এই যে এক-একটা বাক্স পাঠাচ্ছেন, এগুলো আসলে সাঙ্কেতিক চিঠির একটা একটা টুকরো, বুঝলি! এরকম আরও পাঠাবেন। কিন্তু তার আর দরকার নেই, উনি কী বলতে চান আমি বুঝে গেছি। আমার সব মনে পড়ে গেছে। কিন্তু আফগানিস্তানে তো নয়, ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল পঞ্জাব আর বেলুচিস্তানের সীমান্তে একটা ছোট্ট জায়গায়। অনেকদিন আগেকার কথা। সেই জায়গাটার নাম ছিল কান্টালাপুরা। ভদ্রলোকের বাড়িতে টেলিফোন থাকলে আমি বলে দিতুম যে, আপনাকে আর কষ্ট করে চিঠি পাঠাতে হবে না।"

"কাকাবাবু, উনি চুল আর আলুর তরকারি পাঠিয়ে কী চিঠি লিখছেন?"

"তোদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমার আগেই ধরা উচিত ছিল, কিন্তু আমি মাথা ঘামাইনি। শোন, বুঝিয়ে দিচ্ছি। চুলের ভাল বাংলা কী?"

"কেশ।"

"আর একটা আছে, কুন্তল। আর ওই যে আলুর তরকারিটুকু, ওটা কী জানিস, একটা শিঙাড়া ভাঙলে তার মধ্যে ঠিক ওইটুকু তরকারি দেখতে পাবি। ওকে বলে পুর। কচুরি, শিঙাড়া, পিঠে এইসবের মধ্যে নানারকম পুর দেওয়া থাকে না? তা হলে কী হল, কুন্তলপুর। ওই কান্টালাপুরা জায়গাটার কথা বললুম, অনেকে বলে, ওই জায়গাটার আগেকার নাম ছিল কুন্তলপুর।"

অরিন্দম বলল, "শুধু ওই নামটা একটা কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিলেই পারতেন?"

"সেইজন্যই তো বলছি, ভদ্রলোকের মাথায় খানিকটা ছিট আছে। তবে লোক খারাপ নন, একটু ছেলেমানুষ মতন, এই যা। তবে, সেবারে আমি ওঁর সঙ্গে খানিকটা খারাপ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলুম ঠিকই।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কী হয়েছিল সেবারে?"

"সেটা আর তোদের শুনে দরকার নেই। তবে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় লোকেরা রেগে গিয়ে ভদ্রলোকের মাথার সব চুল কামিয়ে কী যেন একটা আঠা মাখিয়ে দিয়েছিল, সেটা আমি চেষ্টা করেও আটকাতে পারিনি।"

"ওই জন্যই ওঁর মাথাজোড়া টাক। আর একটাও চুল গজায় না।"

"ভদ্রলোক যখন আমার ওপর এখনও খুব রেগে আছেন, তখন আমি ওঁর কাছে ক্ষমা চাইতে চাই। কিন্তু টেলিফোন না থাকলে মুশকিল। একটা চিঠি লিখলে তোরা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারবি?"

"জোজোকে বললে দিয়ে আসতে পারে।"

"আচ্ছা তাই-ই লিখে দেব তা হলে।"

দুপুরবেলা সন্তু আর অরিন্দম গেল জোজোর বাড়িতে। দরজার বেল বাজাতেই দোতলার বারান্দায় জোজো এসে ওদের দেখল। তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের চুপ করতে বলে ইশারায় জানাল যে, সে নেমে আসছে।

অরিন্দম সন্তুর মুখের দিকে তাকাল, সন্তু বলল, "আমরা তো জোজোর নাম ধরে ডাকিনি, শুধু বেল বাজিয়েছি, তবু ও আমাদের চুপ করতে বলল কেন?"

অরিন্দম বলল, "সবাই যেরকম ব্যবহার করে, জোজোও তাই করবে, তুই এরকম আশা করিস কী করে?"

জোজো দরজা খুলে বাইরে এসে অতি সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর নিজে পা টিপে-টিপে এগিয়ে যেতে যেতে বন্ধুদেরও সঙ্গে ডাকল।

সন্তু আর অরিন্দম ওর দু'পাশে চলে এল, অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, দুপুরবেলা তোর বাড়ি থেকে বেরোনো নিষেধ বুঝি?"

জোজো ফিসফিস করে বলল, "না, না, তা নয়। আমাদের বাড়িতে এখন কে এসেছেন তোরা কল্পনাও করতে পারবি না। বাবার সঙ্গে নিরিবিলিতে আলোচনা করছেন। গণ্ডগোল হলে বাবার ডিসটার্বেন্স হয়।"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "কে এসেছে রে, কে?"

জোজো বলল, "সে নামটা বলা যাবে না ভাই। তা হলে ওয়ার্লড পলিটিক্সে গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। উনি এসেছেন ছদ্মবেশে।"

"তোদের বাড়ির সামনে কোনও গাড়ি-টাড়ি তো দেখছি না।"

"তোদের মাথা খারাপ, আমাদের বাড়ির সামনে একটা বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে স্পাইরা সব জেনে যাবে না?"

"যাক বাবা, তা হলে নাম জেনে দরকার নেই।"

"তোরা হঠাৎ দুপুরবেলা এলি? কী ব্যাপার?"

সন্তু বলল, "তোকে অসময়ে এসে ডিসটার্ব করলুম, সেজন্য দুঃখিত। ব্যাপার কী জানিস, তোর পিসেমশাই আমাদের বাড়িতে দুটো চিঠি পাঠিয়েছেন..."

জোজো থমকে গিয়ে বলল, "চিঠি? অসম্ভব! আমার পিসেমশাই জীবনে কাউকে চিঠি লেখেন না। আমার বাবাকেই কখনও চিঠি লেখেননি। আমার পিসিমা যতদিন বেঁচে ছিলেন, উনিও চিঠি পেতেন না! উনি নাকি কলম ছুঁতে চান না।"

অরিন্দম বলল, "কেন, কলম তো কোনও জন্তু-জানোয়ার নয়।"

জোজো বলল, "এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয় অরিন্দম। সবাইকে নিয়ে ঠাট্টা করা যায় না। আমার পিসেমশাই তোদের বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছেন, মোট কথা এটা আমি বিশ্বাস করি না।"

সন্তু বলল, "উনি কলম দিয়ে কাগজে লিখে চিঠি পাঠাননি বটে, কিন্তু যা পাঠিয়েছেন তাকে চিঠিই বলা যায়। এখন কাকাবাবু একটা উত্তর দিতে চান। উনি অবশ্য হাতে লিখেই দেবেন। সেই চিঠিটা তুই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবি। কিংবা, ঠিকানাটা বল পোস্ট করে দেব।"

জোজো হঠাৎ চোখ গোল-গোল করে বলল, "চুপ! স্পাই!"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "তুই কাকে স্পাই বলছিস? সন্তুকে?"

জোজো আঙুল তুলে একটা জিপগাড়ি দেখাল। একদম নতুন নীল রঙের জিপ। তার সামনের সিটে দু'জন লোক অলস ভঙ্গিতে বসে আছে। যেন তাদের কোথাও যাবার তাড়া নেই।

অরিন্দম বলল, "তুই কি ভূতের মতন চারদিকে স্পাই দেখছিস নাকি? স্পাই তোর কী করবে?"

জোজো বলল, "আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমাকে তোলে আড়ালে লুকোতে দে!"

জিপগাড়ির লোক দু'জন একসঙ্গে জিপ থেকে নেমে দৌড়ে এল ওদের দিকে।

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

ডোরাকাটা জামা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : *ইস্কুলের ফাংশানে নানান মজাদার কাণ্ড। তারপর দুজন লোক নিতুকে জিপে তুলে নিয়ে পালায়। পথে তর্কাতর্কি, লম্বু বেঁটেকে ধাক্কা মেরে জিপ থেকে ফেলে দেয়। পরে আর একটা জিপ পিছন থেকে এসে তাদের ধরে ফেলে। সেই জিপে আছে সুকু, বডিবিল্ডার কমল ভৌমিক ও ডি· এম·। গোবদা-গোছের একজনের মোটরবাইকে চেপে বেঁটেও এসে চড়াও হয় লম্বুর উপর। কিন্তু কমল ভৌমিকের রদ্দা খেয়ে কেতরে পড়ে। লম্বু লোকটা আর কেউ নয়, সে নাকি গোয়েন্দা-লেখক সুদর্শন। গোবদা ছেলেটা বেঁটেকে ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার চায়। সুদর্শন বলেন, ভোলানাথ পাহাড়ে যে-সায়েব হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজে দিলে সে পুরস্কার পাবে। কথায়-কথায় কমল ভৌমিক সুদর্শনকে বলেন, তাঁরও একখানা বেতো উপন্যাস লেখার কথা ছিল। দুটো জিপই রওনা হয় চিড়িয়াখানার দিকে। পথে এক সিমেন্টের কারখানা দেখে ডি· এম· বলেন, 'ওখানে লাঞ্চ করব।' তারপর···*

জিপ চলেছে ফরফর করে। বাতাসে চুল উড়ছে। ডি· এম· কমল ভৌমিককে বললেন, "আচ্ছা মশাই, আপনার এত জোর হল কী করে?"

"ব্যায়াম করে।"

"আরাম করে?"

ডি·এম· কানে কম শোনেন। কমল ভৌমিক কান-ফাটানো গলায় বললেন, "আরাম করে নয়, ব্যায়াম করে। ব্যায়াম করে জোর বেড়েছে।"

"ও ব্যায়াম। খিদে কীভাবে বাড়ে?"

"খুব জল খেলে।"

"খুব ঘোল খেলে আবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

"ঘোল নয়, ঘোল নয়। জল, জল খেতে হবে।"

"ও জল।"

পাশেই জলের ফ্লাস্ক ছিল। ডি· এম· ঢকঢক করে আধ ফ্লাস্ক জল খেয়ে বললেন, "ছাবড়িওয়াল আবার এত খাওয়ান যে, খেয়ে শেষ করা যায় না। দুটো পেট হলে ভাল হয়। আর একেবারে ফাসক্লাশ রান্না গন্ধেই জল এসে যায় জিভে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "সংযম চাই, সংযম। অসুখ করে অসংযমীর।"

ডি· এম· চমকে উঠে বললেন, "বোম। বোম মারবে? কে বোম মারবে?"

কমল ভৌমিক বললেন, "আর তো পারা যায় না। এমন জানলে একটা লাউড-স্পিকার আনতুম। গলা চিরে যাবার জোগাড়।"

ডি· এম· বললেন, "ফিরে যাবার অত তাড়া কিসের। আপনি তো বেড়াতে এসেছেন। যখন হোক ফিরলেই হবে। তা ছাড়া আপনি হলেন ডি·এম-এর গেস্ট। ছাবড়িওয়াল কে? হু ইজ ছাবড়িওয়াল। আপনাকে আমি খাওয়াব। ভাববেন না আপনি জলে পড়ে আছেন। অ্যায়, রোককে।" গাড়ি ঘ্যাঁস করে থেমে গেল।

ডি· এম· তড়াক করে নেমে পড়লেন। কমল ভৌমিক, নিতু, সুকু সবাই অবাক, কী হল রে বাবা! ডি·এম· এদিক-ওদিক তাকালেন। অন্যেরাও তাকাল। কী খুঁজছেন ভদ্রলোক। কাকে খুঁজছেন। কিছুই বোঝা গেল না। বন পাতলা হয়ে এলেও চারপাশে বন। কোথাও কোনও জনবসতি নেই। বহুদূরে সিমেন্ট ফ্যাকট্রির কোয়ার্টার্স, ঘরবাড়ি। চিমনি দিয়ে সাদা ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

রাস্তার ধারে খাদ। অনেকটা নীচে একটা গোরু চরে বেড়াচ্ছে। ডালপালা খাচ্ছে। কোথা থেকে চলে এসেছে বেড়াতে বেড়াতে। ডি·এম· গোরুটাকে দেখেই তাঁর পাহারাদারদের বললেন, "পাকড়ো পাকড়ো।" যেন ওই গোরুটাকেই খুঁজছিলেন।

দুটো চৌকিদার হড়হড় করে ঢাল বেয়ে নেমে গিয়ে শিং ধরে টানতে টানতে গোরুটাকে ওপরে নিয়ে এল। মাঝারি মাপের কালো একটা গোরু।

নিতু সুকুকে প্রশ্ন করলে, "গোরু কী হবে রে ভাই।"

সুকু বললে, "ডি· এম· তো, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, গোরু অপরাধ করেছে, তাই সাজা হবে।"

"কী অপরাধ? গোরুর আবার অপরাধ! গোরু বলে রাস্তার ওপর নোংরা করলেও কিছু হয় না। গোরু তো মা।"

"আরে, সে অপরাধ তো শিশুও করে। গোরুতে শিশুতে তফাত নেই। আসলে এর অপরাধ খুব গুরুতর। জঙ্গল-কাটা কি জঙ্গল-খাওয়া মারাত্মক অপরাধ। একটা গোরু সকাল থেকে সন্ধে কতটা জঙ্গল খেয়ে ফেলে জানো। সে অঙ্ক জেলা অফিসে আছে। গোরুটার বিচার হবে।"

"তারপর জেল হবে।"

"দেখাই যাক।"

ডি·এম· পাহারদার দু'জনকে বললেন, "দ্যাখো, দুধ আছে কি না। দেখতা নেহি কমলবাবুকো ভুখ লাগি হুই।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আমার ভুখ লাগলেও, দুধ এখন খাব না।"

আস্তে বলেছিলেন, ডি·এম· শুনলেন ওষুধ ভাল লাগে না। সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "ওষুধ আমারও ভাল লাগে না। যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল।"

কমল ভৌমিক গলা ফাটিয়ে বললেন, "দুধ আমি এখন খাব না।"

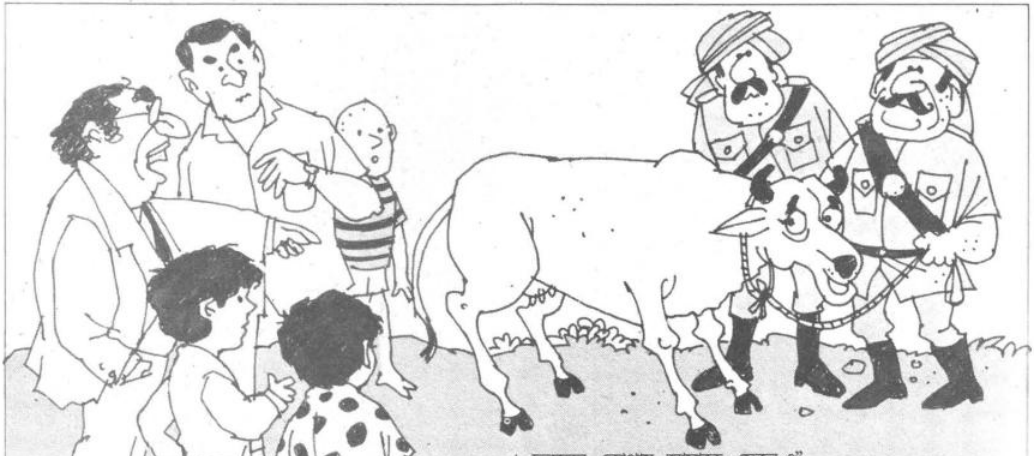

ডি·এম· এইবার শুনতে পেলেন, বললেন, "তা হলে কী খাওয়াব আপনাকে। এই জঙ্গলে আর আমি কী পাব। আপনি তো আর গোরু নন যে পাতা খাওয়াব।"

কমল ভৌমিক বললেন, "এই তো বললেন ছাবড়িওয়াল আমাদের লাঞ্চ খাওয়াবে।"

ডি·এম· শুনতে পেয়েছেন। কমল ভৌমিক বেশ জোরেই বলেছেন। ডি·এম· বললেন, "এই তো বললেন, ছাবড়িওয়ালের ওখানে আপনি খাবেন না। খাওয়া উচিত হবে না।"

কমল ভৌমিক সুকুকে বললেন, "বুঝলে কমরেড, এর চেয়ে মানুষের মৃত্যু ভাল। চিৎকার করে করে গলা ফেটে গেল। দুপুর পেরিয়ে গেল। খিদে পেয়ে পেয়ে পিত্ত পড়ে গেল।"

কমল ভৌমিক হঠাৎ ডি· এম-এর কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ভীষণ জোরে বললেন, "আমি খাব, আমি খাব, আমি খাব।"

"আম খাবেন। মশাই এটা আমের সময়।"

কমল ভৌমিক হতাশ হয়ে পথের ধারে একটা পাথরে বসে পড়লেন। ডি· এম· বললেন, "দুধ তা হলে খাবেন না।"

কমল ভৌমিক মাথা নেড়ে জানালেন, না। আর পাহারাদার দু'জন হেঁকে বললে, "সাহাব, ইসমে দুধ নেহি হ্যায়। বিলকুল টিনকা মাফিক খালি।"

ডি· এম· অসম্ভব রেগে গিয়ে বললেন, "কেয়া গোরু হুয়া লেকিন ইস্টক মে দুধ নেহি রাখা, এ ক্যায়সা গোরু।"

একজন পাহারাদার সাহস করে বললে, "মালুম কোই খা লিয়া।"

"কৌন খায়া। উসকো যাঁহা হায় ওঁহিসে পাকাড়কে লে আও। মেহমান আদমিকা সামনেমে মেরা বেইজ্জতি হো চুকা।"

কমল ভৌমিক জীবনে এমন সমস্যায় পড়েননি। তিনি পাথরের আসন ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, নিতু, সুকু আর সুদর্শনকে জিপে উঠতে বলে নিজে ড্রাইভারের আসনে বসেই জিপ চালু করে দিলেন। ইঞ্জিনের শব্দে ডি· এম· চমকে উঠে বললেন, "এ কী, চললেন কোথায় আমাকে ফেলে?"

কমল ভৌমিক চিৎকার করে বললেন, "সিমেন্ট ফ্যাকট্রিতে লাঞ্চ খেতে।"

ডি· এম· শুনেছেন। শক্ত শক্ত কথা, যুক্তাক্ষরঅলা কথা, কথার শেষে ই বা ঈ থাকলে সহজেই শুনতে পান। চিৎকার করে বললেন, "বাঃ, যার নেমন্তন্ন সে-ই পড়ে রইল। আপনারা তো আমার গেস্ট।"

"তা হলে গোরু-ঘোড়া না করে উঠে আসুন।"

সুকু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "আরে, আরে, সেই জিপটা কোথায় গেল!"

"অ্যাঁ, কোন্ জিপ?" সকলে চমকে উঠলেন। সত্যিই তো, দ্বিতীয় জিপটা নেই। ওই জিপে বেঁটে আর দু'জন পাহারাদার ছিল। জিপ চালাচ্ছিল নেপিয়ারের লোক। ডি· এম·-এর হুকুমে পাহারাদার দু'জন নেমে এসে গোরু ধরতে ছুটেছিল। যখন ডি· এম· গোরু-গোরু আর দুধ-দুধ করছিলেন, সেই সময় জিপটা সরে পড়েছে।

কমল ভৌমিক স্টার্ট বন্ধ করে নেমে এলেন। শুরু হল পরামর্শ, কী করা হবে এবার। ওদিকে ছাবড়িওয়ালের লোভনীয় লাঞ্চ, এদিকে বেঁটে ভেগেছে।

ডি· এম· বললেন, "জিপের নম্বর কেউ দেখেছে।"

কারও মুখে উত্তর নেই। অতবড় গোয়েন্দা সুদর্শন তিনি কেবল বলছেন, "যদ্দুর মনে হয়, যদ্দুর মনে হয়..."

সুকু একটা চিরকুট এগিয়ে দিয়ে বললে, "এই হল জিপের নম্বর।"

ডি· এম· খুশি হয়ে বললেন, "ভেরি গুড, ভেরি গুড, এই ছেলেটা আমার অ্যাসেট।"

সুদর্শন বললেন, "আপনারা লাঞ্চ খেতে যান। আপনাদের নামিয়ে দিয়ে আমি জিপটার পেছনে ধাওয়া করি। যাবে কোথায়, এই তো রাস্তা সোজা চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। পেছন থেকে গিয়ে কাঁক করে ধরব।"

কমল ভৌমিক বললেন, "অতই সোজা। বেঁটে একটা ঘুসি হাঁকড়ালে সবকটা দাঁত ঝরে যাবে।"

"ঝরলেই হল! আমি দাঁত দু'পাটি খুলে পকেটে রেখে দোব।"

"ও, ফলস টিথ! তা হলে অবশ্য ভয় নেই। ঘুসোঘুসির সময় শরীরের দুটো জিনিস বড় ট্রাবল দেয়, এক দাঁত, আর দুই নাক।"

"কমলবাবু, আমারও অসম্ভব জোর। মানুষকে দেখে বোঝা যায় না। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমার কাছে বিলেত থেকে চিঠি এসেছিল টারজানের বইয়ে অভিনয় করার জন্যে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

ভূতের গল্প নয়

চৈতালি চট্টোপাধ্যায়

পাশের বাড়ির মনসা ভাল করে ভোরের আলো ফোটার আগেই, প্রায় মাঝরাত্তিরে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল।

সোনামণি এসব কিছুই জানত না। জানার কথাও নয়। ঘরের পুবমুখো জানলাটা খুললে অবশ্য মনসাদের বাড়ি নজরে পড়ে। দুটো বাড়িই মুখোমুখি, মাঝখানে শুধু একটা গলির ফারাক। তা, জানলা খুলবে কে? সোনামণি আজকাল যতক্ষণ বাড়ি থাকে, ভুরু গোঁজ করে পড়ার টেবিল থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও নড়ে না। পাড়ায় কুরুক্ষেত্র ঘটে গেলেও তার তাতে কী-ই বা আসে যায়?

বাড়িতে এখন কিছুদিন হল সোনামণির বিরুদ্ধে মিলিটারি আইন জারি করা হয়েছে। মূল ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল অবশ্য মাসকয়েক আগে। জানুয়ারি মাসে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ওঠার রেজাল্ট বেরোল যখন, গোলাপি রঙের রিপোর্টটা দেখতে দেখতে মা, বাবা আর ঠাক্‌মার চোখগুলো ছানাবড়া হয়ে উঠছিল, তখনই সোনামণি জানতে পারল তার দুঃখভোগের দিন শুরু হয়ে গেছে।

রাগ তো হওয়ারই কথা। যে মেয়ে ক্লাসে বরাবর পাঁচজনের মধ্যে নিজের পজিশন রেখে এসেছে সে কিনা একেবারে পা পিছলে থারটিন্‌থ-এ নেমে গেল! রিপোর্টটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গনগনে চোখে তাকালেন বাবা, "ছ্যাছ্যা, এত দূর অধঃপতন হয়েছে তোমার।"

মা'র চোখে তো প্রায় জল এসে গিয়েছিল। নামকরা এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী তিনি, তাঁর মেয়েরই পড়াশুনোর কিনা এই দশা। ঠাক্‌মাও খরখর করতে করতে ঠাকুরঘরে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়েছিলেন।

দুঃখ সোনামণিরও হয়েছিল। নিজের ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল কাকে দোষ দেবে সে। নিজেকে? স্কুলের প্রিয়তম বান্ধবী ঈশিতাকে? নাকি গোলপার্কের বইয়ের খুপরিগুলোকে?

গল্পের বইয়ের নেশা খুব একটা কোনওদিনই ছিল না সোনামণির। ঈশিতাই সব গোলমাল করে দিল। টিফিনের সময় পাতলা একটা খবরের কাগজের মলাট দেওয়া বই হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিল, "পড়ে দ্যাখ, দারুণ গল্পটা..."

তারপর কী যে হল, বাড়ি এসে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে রাত জেগে বইটা শেষ করেছিল ও। পরদিন ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই ঈশিতাকে ডেকে এককোণে নিয়ে গেল সোনামণি। তার চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে, গলায় চাপা উত্তেজনা, "ডিটেকটিভ বইটা তুই কোথ্থেকে পেলি রে?"

"ওই তো, আমাদের বাড়ি থেকে

একটুখানি গিয়েই গোলপার্কে অনেক ছোট-ছোট স্টল আছে, ওরা টাকা ডিপোজিট রেখে বই পড়তে দেয়।"

"শোন এবার থেকে পয়সা জমা দেওয়ার সময়, আমিও হাফ দেব, বুঝলি ?"

ঈশিতার সঙ্গে সোনামণির এসব কথাবার্তা হয়ে গেছে অ্যানুয়াল পরীক্ষা শুরু হওয়ার চার মাস আগে। তারপর যথারীতি গোয়েন্দা গল্পের নেশায় সোনামণির স্কুলের পড়াশুনোর সময়ে টান পড়তে শুরু করেছে। অবশেষে পরীক্ষায় এই শোচনীয় ফলাফল।

জানুয়ারি মাসের খারাপ রেজাল্টের জের সোনামণি তারপর আস্তে আস্তে সামলে উঠছিল। পড়াশুনায় আবার আগের মতো মনোযোগী হওয়া, ডিটেকটিভ বই পড়ার ঝোঁক কমানো, এ-সবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু মোক্ষম ঝামেলাটা হয়ে গেল এই সেদিন। স্কুলের গার্ডিয়ান্স' মিটিংয়ে মা গিয়েছিলেন। বড়দি সরাসরি তাঁকে ডেকে বললেন, "মিসেস ঘোষ, আপনার মেয়ের পড়াশুনোয় এরকম গাফিলতি ঘটবে, আমরা ভাবতেই পারি না।"

বাড়িতে সেই থেকেই শুরু হয়ে গেছে প্রায় নন-স্টপ্ বকুনি। কোথাও বেরনো বারণ, শুধু সপ্তাহে দু'দিন সুচিত্র-স্যারের কাছে অঙ্ক কষতে যাওয়ার সময়টুকু ছাড়। বিকেলে পাশের বাড়ির টুকটুকির সঙ্গে ছাতে উঠে একটু গল্পগুজব করব, বাবা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'গত বছর পুরোটাই ফাঁকি দিয়েছ, এবার আর কোনও বিশ্রাম নেই, শুধু বই নিয়ে বসে থাকবে। আসছে বছর মাধ্যমিক, সে খেয়াল আছে ?'

অমন যে ঠাকমা, সোনামণি যার নয়নের মণি, তিনিও এখন ভয়ানক শত্রুতা করছেন। কখনও যদি সে টেলিভিশনের সামনে গিয়ে একটু বসে, ঠাকমা অমনি উঠে গিয়ে টিভি বন্ধ করে দেন। অপমানে চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে সোনামণির। কিন্তু উপায় কী, দোষ করলে শাস্তি পেতেই হবে।

স্কুলে যাওয়ার আগে খেতে বসেছে সোনামণি। বাড়ির কাজের লোক শ্রীধর হাতায় করে গরম ভাত দিতে দিতে বলল, "মনসাদের বাড়ির সামনে মেলা লোক জমেছে, দেখেছ দি'মণি ?"

"কই, না তো," বলে সোনামণি মুখ তুলে তাকাতেই অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল শ্রীধর, "ওমা, কোথায় ছিলে গো তুমি, মনসা বাড়ি থেকে পালিয়েছে, জানো না নাকি ?"

ভাঙা ভাতের মধ্যে ডাল ঢালতে ঢালতে আপনমনে বকবক করে চলল শ্রীধর, "কাল পরীক্ষায় ফেলের খবর এয়েচে, আর ওর বাবা একটা লাঠি দিয়ে কী ছাগল-পিটুনিই না

পেটাল ছেলেটাকে, বোঝো এখন ঠেলা—"

শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে মা এসে দাঁড়ালেন কাছে। তাঁর স্কুল দেরিতে শুরু হয়, সোনামণির একটু পরেই বার হন তিনি।

"সোনামণি, বিকেলবেলা টুকটুকির সঙ্গে ছাতে একটু ঘোরাঘুরি করে এলে পারিস তো, সারাক্ষণ বই নিয়ে বসে থাকলে শরীর খারাপ হয়।"

বাবা অফিসে বেরিয়ে গেছেন। ঠাকমাও ধারেকাছে নেই। মা'র কথা শুনে সোনামণি হাসবে কি কাঁদবে বুঝে উঠতে পারছিল না। প্রতিটা বিকেল কী অসহ্য কষ্টেই না তার কাটে ! এই তো পরশুদিনের কথা, আকাশে কাঁচা সোনার মতো রোদ্দুরের গায়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে ছেলেরা, নীচে গলিতে এক্কাদোক্কার ঘর কেটে কারা যেন খেলছে, মাঝে-মাঝেই ভেসে আসে হুল্লোড়। মন শক্ত করে লাইফ সায়েন্সের বই খুলে বসেছিল সোনামণি, করুণ মুখে দরজায় এসে দাঁড়াল টুকটুকি। গলায়-গলায় ভাব দুজনের। বন্ধুর জন্য দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে ওর।

"কাকিমণিকে বলব একবার ?"

"না থাক, তুই যা এখান থেকে।" ঢোঁক গিলে কান্না সামলে নেয় সোনামণি।

এখন মা'র এহেন পরিবর্তন দেখে নিজের কান দুটোকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না ও। যাই হোক, ভাববার সময় নেই বেশি, এক্ষুনি স্কুল-বাস এসে পড়বে।

বইপত্র গুছিয়ে বাসে উঠে বসার পরে সোনামণির চোখের সামনে মনসার মুখটা ভেসে উঠল। ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে, অথচ একটু বড় হওয়ার পরেই মনসা কেমন যেন পালটে যেতে থাকল। পাশেই জেলেদের এক বিরাট বস্তি, সেই জেলেপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে দিয়েছিল ও। স্কুল পালিয়ে সারাদিন বসে বসে গুলি খেলত ওদের সঙ্গে। একদিন রাস্তায় মনসার সঙ্গে হঠাৎ ওর দেখা হয়ে গিয়েছিল। টুকটাক কথা বলতে বলতে ওর মুখে বিশ্রী একটা গন্ধ পেয়েছিল সোনামণি। গন্ধটা ওর খুবই চেনা, ওদের বাড়ি তৈরি করার সময় ছাত পেটাতে এসেছিল যেসব কামিনেরা, তারা সারাক্ষণ ছুকছুক করে বিড়ি খেত। ওদের গায়েও এই একই গন্ধ পেত সোনামণি। মা বলতেন, 'ভুবনবাবু একটুও নজর দেন না, দিন দিন অমানুষ হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।' মনসার বাবার বিশাল তেজারতি কারবার, ছেলেকে দেখার সময় কোথায় তাঁর ! কাজেই ছেলে যে মাধ্যমিকে ফেল করবে, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে ! মনসার কথা ভাবতে ভাবতে মনখারাপ হয়ে যাচ্ছিল সোনামণির।

বিকেলে টুকটুকির সঙ্গে ছাতে গেল ও। অনেকদিনের জমানো কথা খরচ করে নামতে নামতে প্রায় সন্ধে। বুক দুরদুর করছিল সোনামণির, নির্ঘাত বাবা-মা বকুনি দেবেন। অথচ কেউ-ই রাগ করলেন না। উপরন্তু বাবা ডেকে বললেন, "নিউ এম্পায়ার-এ একটা খুব ভাল ফিল্ম দেখাচ্ছে। নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে নাকি ভূতটুত আছে। দেখবি তো বল্, রোববারের টিকেট কেটে রাখব।"

ঠাকমাও হেসে হেসে এ-কথা সে-কথা বললেন। রাতারাতি বাড়ির সকলের হলটা কী ? ভারী অবাক লাগে সোনামণির। আজই

বিকেলে জলখাবার খাওয়ার সময় শ্রীধর বলছিল, মনসাকে নাকি মগরাহাট স্টেশনে কে দেখতে পেয়েছে। ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শ্রীধর বলল, "ছেলেটা বোধহয় বিবাগী হয়ে যাবে !"

ঘটনাটা দুঃখের হলেও সোনামণির হাসি পাচ্ছিল, কেননা বিবাগী হয়ে তো লোকে হিমালয়ে যায় আর মগরাহাট দিয়ে হেঁটে হেঁটে বড়জোর সুন্দরবন অবধি পৌঁছনো যেতে পারে। কী যে বলে শ্রীধর ! এ-সব কথা বলার পরেই শ্রীধর এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে কিন্তু মনসার খবর জানাতে মানা আছে দি'মণি, মাকে যেন বলে দিওনি আবার।"

পরদিন শনিবার। সকাল-সকাল স্কুল থেকে বাড়ি ফিরল সোনামণি। দ্যাখে, দরজার কাছেই শ্রীধর দাঁড়িয়ে, উত্তেজিত ভাবভঙ্গি। ওকে দেখেই ঝুঁকে পড়ল সামনে, "কী কাণ্ড, ওই হোথায় রেল লাইনে একটা ছেলে নাকি কাটা পড়েছে, পরনে মনসার মতো শার্ট-প্যান্ট। সঠিক বেত্তান্ত জানা যায়নি, তবে ওদের বাড়িতে সবাই বেজায় কান্নাকাটি করতেছে।"

সন্ধেবেলা হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসেছে সোনামণি, রাঙামাসি-মেসো এলেন বেড়াতে।

"সোনামণি," বসার ঘর থেকে মাসির গলা কানে আসতেই বইখাতা গুছিয়ে রেখে মাসি-মেসোর কাছে এসে বসল সোনামণি। টেলিভিশনের পর্দায় তখন নিরুদ্দিষ্ট ছেলেমেয়েদের ছবি দেখাচ্ছে। কথা বলতে বলতে সবারই এক-আধবার চোখ চলে যাচ্ছে সেদিকে। রাঙামাসি বলে উঠলেন, "দ্যাখ সেজদি, এসব নিশ্চয়ই পরীক্ষায় ফেল-করা ছেলেপুলের দল, বাড়ি থেকে পালিয়েছে। কেমন বুকের পাটা···"

মেসো বললেন, "কেন, আজকাল তো কাগজ খুললেই দেখবে হয় পালিয়েছে, নয় জলে ডুবে মরেছে। কী সব যে হয়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েদের, মা-বাবার বকুনি পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না।"

মা এতক্ষণ মন দিয়ে সকলের কথা শুনছিলেন, আচমকা তাকালেন সোনামণির দিকে। "দেখে আয় তো, শ্রীধর ভাত নামিয়েছে কি না, তোকে খেতে দিয়ে দিতে বল্।"

এত তাড়াতাড়ি কোনওদিনই খেতে বসে না সোনামণি। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা'র কথায় উঠতে হল তাকে। যেতে যেতে শুনতে পেল মা চাপা স্বরে রাঙামাসিকে বলছেন, "ওর সামনে এসব আলোচনা করিস না। খুকু, আজ স্কুলে তৃপ্তিদিও বলছিলেন···"

রাতে শোবার সময় মাথার ধারের জানলাটা খুলতে গিয়েই বুকটা ধক্ করে উঠল সোনামণির। গরম লাগছে খুব, কিন্তু জানলাটা খুললেই ল্যাম্পপোস্টের আলোয় মনসাদের বাড়িটা স্পষ্ট নজরে পড়ে যায়। বন্ধই থাক বরং জানলা।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাড়ির সকলের অদ্ভুত ব্যবহারের কথা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছিল সোনামণি। চালাক মেয়ে সে, বারবারই তার মনে একটা ক্ষীণ প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল, তবে কি মনসার জন্যেই··· ? ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সোনামণি।

মাঝরাতে স্বপ্নের ঘোরে মনসা এসে ঢুকল তার ঘরে। ওকে দেখে সোনামণি ভয় পেয়ে ওঠার আগেই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে কান্না জুড়ে দিল মনসা। কী মুশকিল ! চোখের সামনে কাউকে কাঁদতে দেখলে সোনামণির ভীষণ অসহায় মনে হয় নিজেকে। কী করবে সে এখন ? মাকে ডাকবে ? তার আগেই কথা শুরু করল মনসা, "দ্যাখ্ তো, কী বোকার মতন কাজটা করলাম আমি ! বেঁচে থাকলে সামনের বার পরীক্ষা দিয়ে নিশ্চয়ই পাশ করে যেতাম। ছিঃ ছিঃ, ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে।"

মুখ নিচু করে মনসার কথাগুলো শুনতে শুনতে সোনামণিরও চোখ ছলছলিয়ে উঠছিল। মাথা তুলে ওকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেখল ভুস্ করে মনসা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সোনামণি চোখ রগড়াতে রগড়াতে প্রথমেই দেখে নিল জানলার ছিটকিনি, ঠিকমতোই লাগানো আছে। তবে কিনা, ব্যাপারটা ভৌতিকই হোক, আর স্বপ্নই হোক, এখন কিন্তু একটুও গা ছমছম করছে না সোনামণির।

চায়ের টেবিলে ঠাকুমা আর মা বসে ছিলেন। বাবার চেয়ারটা খালি। সোনামণি এসে কোকো দেওয়া দুধের কাপটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল, "জানো ঠাকুমা, কাল রাতে মনসা এসেছিল আমার ঘরে !"

"ওমা সে কী কথা ! বৌমাকে পইপই করে কতদিন বলেছি, মেয়েটার সঙ্গে শোও, তা আজকাল সব এইটুক-টুক দুধের বাচ্চারা নাকি একা ঘুমোতেই ভালবাসে !" ঠাকুমার গলায় স্পষ্টই আতঙ্কের সুর।

মা'র মুখটাও কেমন শুকিয়ে গেছে। দু'জনের দিকে তাকিয়ে সোনামণির গলা ঠেলে একটা হাসির স্রোত বুড়বুড়ি কেটে ওপর দিকে উঠে আসতে চাইছিল, এমন সময় ড্রেসিং গাউনের দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। সোনামণি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলল, "জানো বাপি, আমি এখন থেকে এমন মন দিয়ে পড়াশুনো করব, মাধ্যমিকে ঠিক স্টার পাব, দেখো তোমরা···"

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। মাথার ধারের জানলাটা সোনামণি আর বন্ধ করে শোয় না আজকাল।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

রথ মানেই এতকাল জানতাম, ভেঁপু-বাঁশি, খেলনা আর পাঁপড়ভাজা। রাজ্যের পাতা আর ফুল জোগাড় করে রথ-সাজানো। তারপর পাঁপড়ভাজা খেতে-খেতে, ভেঁপু বাজাতে-বাজাতে, খেলনা আর ঠাকুর-বসানো রথ টেনে নিয়ে যেতে-যেতে রথের ছুটির মজাটাকে তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করা।

এবার দেখছি অন্য রকম। ছোট্কা এবার মেলা থেকে কিনে এনেছে হরেক গাছের টব। সেইসঙ্গে বেশ কিছু গাছও। ছাদের কোণে জল-বাতাস পেয়ে, ছোট্কার পরিচর্যায়, গাছগুলো ফনফন করে বেড়ে উঠেছে। ছোট্কা অবশ্য নিজেই বলেছে, গাছ কেনার আসল ব্যাপারটা।

এবছর নাকি বন-মহোৎসবের সময়ই রথের দিন। ছোট্কা তাই এক ঢিলে দু' পাখির ব্যবস্থা করেছে।

দু' পাখিই বা বলি কেন। তিন পাখিও বলা যায়। কেননা, রথ আর বন-মহোৎসবের কথা মনে রেখেই এবারের নতুন ধাঁধা বানিয়েছে ছোট্কা।

প্রথম ধাঁধা ॥ বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা জুড়ে টবসুদ্ধু গাছ বসাবেন বলে ঠিক করলেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, পাঁচ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে পর পর টব বসিয়ে যাবেন। কিন্তু বাদ সাধল মনের মতো গাছ পাওয়া।

রথের মেলা ঘুরে-ঘুরে শেষ পর্যন্ত

কয়েকটি গাছ জোগাড় হল বটে, কিন্তু, দেখা গেল, মূল পরিকল্পনার থেকে চারটি গাছ কম পাওয়া গেছে।

তখন ভদ্রলোক করলেন কী, পাঁচ ফুটের বদলে সাত ফুট করে ব্যবধানে গাছগুলিকে টবসুদ্ধু বসিয়ে গেলেন। এতে অবশ্য পুরো রাস্তাতেই গাছ বসল। কেবল দুটো টবের মধ্যের দূরত্ব, পাঁচ ফুটের বদলে বেড়ে, হল সাত ফুট।

বলতে পারো, রাস্তাটার দৈর্ঘ্য কত ফুট ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ পাঁচটা তিন দিয়ে একত্রিশ লিখতে পারো ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

পষডিকীচি

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১২৮। ৬৪ জন ছেলেমেয়ের নিমন্ত্রণ ছিল। ৪৮ জন এসেছিল। তার মধ্যে ছেলের সংখ্যা ১৬, মেয়ের ৩২। ছেলেরা খেয়েছে দুটি করে ৩২টি, মেয়েরা তিনটি করে ৯৬টি। (২) লহমা। (৩) ক্ষমতাহীন।

সত্যসন্ধ

"চিড়িয়াখানায় আমি যাব না ভাই। ওখানে ভীষণ বাঁদরের উৎপাত।"

"আপনাকে দেখার পর থেকেই তো ওরা চিড়িয়াখানায় আসতে শুরু করেছে।"

"অত ধৈর্য নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা মাছধরা দেখছ, নিজে ধরলেই তো পারো।"

"আমার অত ধৈর্য নেই ভাই।"

"মা, একটা চামচ দাও না।"

"হাত দিয়ে খাও পিকলু। হাতটা কিসের জন্যে ?"

"চামচ ধরার জন্যে।"

"ডাক্তারবাবু, একবার আমার বাড়িতে আসবেন ? আমার ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে।"

"আমি তো রাত্রি ন'টার পর কারও বাড়িতে যাই না।"

"কুকুরটা যে একথা জানত না ডাক্তারবাবু।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

মজার খেলা

আটটা কাঠি দিয়ে ১৪০ লিখে কাঠি সরিয়ে নানান মজার সমস্যা তোমাদের যে খুব ভাল লাগছে, এ-কথা জেনে আবার দুটো নতুন সমস্যা ও তার সমাধান শিখিয়ে দিচ্ছি। এমনভাবে বসাতে হবে যাতে উত্তর হয় দশ।

দ্বিতীয় সমস্যাটাও দুটো কাঠি সরিয়ে ফের নতুনভাবে বসানোর। শুধু, এবার উত্তর যেন হয় পঁচিশ।

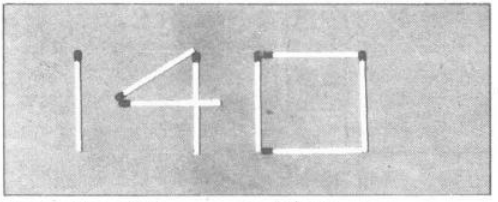

প্রথমে আটটা কাঠি দিয়ে ১৪০ লিখে ফেলো।

এবার, প্রথম সমস্যা।

দুটো কাঠি সরিয়ে ফের ব্যবহার করা চলবে না।

তোমাদের যদি হয়ে গিয়ে থাকে নীচের উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

প্রথম সমস্যার সমাধান :

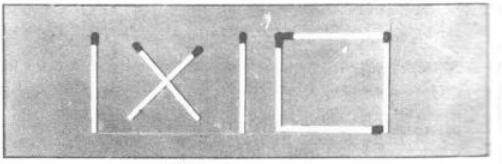

দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান :

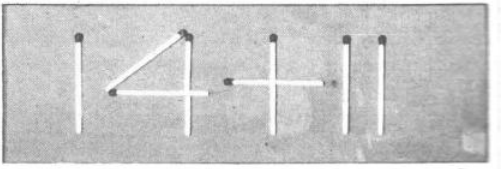

কী, তৈরি তো ?

বেশ, এবার নিজেরা চেষ্টা করো। ওহো, সে-কথাটা মনে আছে তো, উত্তরে রোমান হরফ

মজারু

চেষ্টা করো, তুমিও পারবে

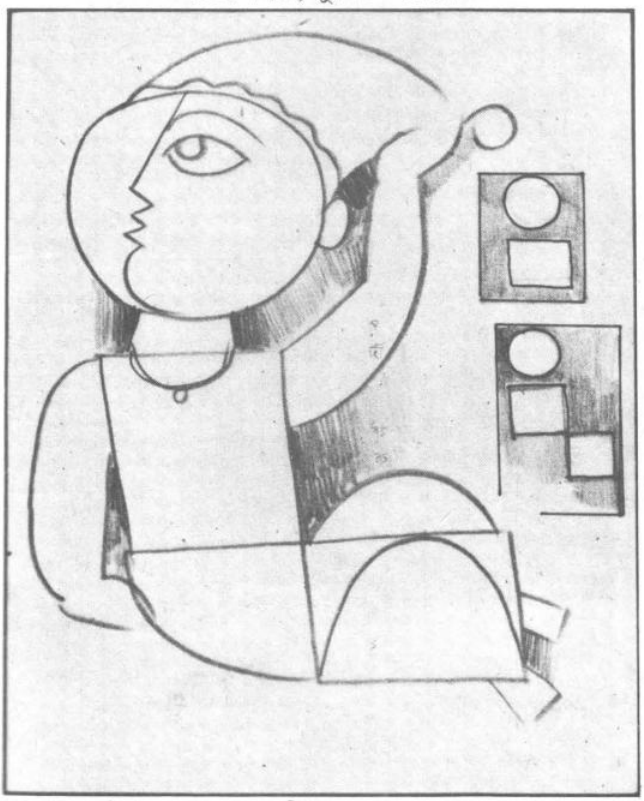

গতবার আঁকার পাতায় ছেলেটির নড়েচড়ে ওঠার কথা জানিয়েছি। ছেলেটির মাথায় পরিয়ে দেওয়া টুপিটি পছন্দ হয়নি বলে খুলে ফেলছে ঘাড় ঘুরিয়ে। আর তার বসার ধরনও গেছে পালটে। শুধু লক্ষ রাখবে, এসব নড়াচড়ার জন্য রেখার টানটোনের গতি ছুটছে কোন্ দিকে ? একটু চেষ্টা করলেই দেখবে তুমি কত সহজে আরও কত কী আঁকতে পারছ !

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিসের ফোটো

ফোটো : রবিন বিশ্বাস

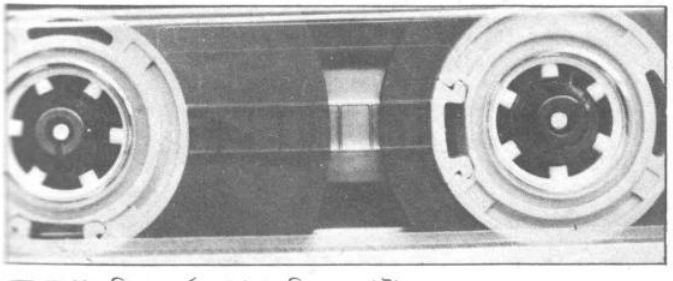

গত সংখ্যায় ছিল রেকর্ড প্লেয়ারের ডিস্কের ফোটো

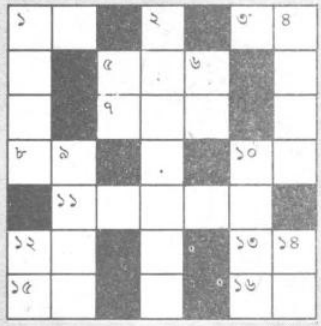

সংকেত : পাশাপাশি : (১) যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম। (৩) যে-খেলায় রাজা-মন্ত্রী হাতি-ঘোড়া থাকে। (৫) স্বপ্ন। (৭) কপাল। (৮) সুবিখ্যাত মসজিদ। (১০) মাটির টানে আকাশে ওড়ে। (১১) যেখানে বসে নকল আকাশে গ্রহনক্ষত্র দেখা যায়। (১২) একই শব্দ দুবার বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো : গাধা কি — — ? (১৩) মাছ ধরার ফাঁদবিশেষ। (১৫) কী খেলে গুণ গাইতে হয় ? (১৬) গ্রীষ্মের ফল।

উপর-নীচ : (১) মেরুদণ্ড। (২) এখানে এশিয়ার একটি বিখ্যাত ফুটবল-প্রতিযোগিতা হয়। (৪) বালি জমে-জমে তৈরি ঢিবি। (৫) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (৬) বহুদিন বাঁচে আর পথিককে ছায়া দেয় এই গাছ। (৯) জানালা। (১০) চার অক্ষরের শব্দ, মাঝখানটা হালকা। (১২) চোয়াল। (১৪) অবনত বা অনুন্নত।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

নি	গ	ড়	■	ছো	ব	ল
ছ	ড়ি	■	আ	■	ল	ক্ষ
ক	ম	■	ব	■	বা	ণ
■	সি	ং	হা	স	ন	■
বা	■	■	ও	■	■	শ
হ	■	প	য়া	র	■	ম
বা	র	ণ	■	ফা	ল্গু	ন

বড়লোকের কাণ্ড

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : লাইগেটে পর পর চুরি আর খুন। প্রথমে অ্যাষ্টনের বাড়িতে চুরি, পরে কানিংহামদের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে চোর তাদের কোচোয়ানকে গুলি করে মারে। বন্ধু হেটারের কথায় জানা যায়, অ্যাষ্টন আর কানিংহামদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে মামলা চলছে। স্থানীয় পুলিশ ইন্সপেক্টর খুনের তদন্তে হোমসের সাহায্য চান। অ্যাষ্টনের বাড়িতে চুরির কোনও সূত্র না পেলেও কানিংহামদের কোচোয়ান-খুনের বেশ কিছু সূত্র তিনি পেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মৃত কোচোয়ানের হাতে পাওয়া একটা সাংকেতিক চিরকুট। তবে কি চোরের সঙ্গে কোচোয়ানের আঁতাত ছিল, পরে মতান্তর হওয়ায় খুন হয় ? হাওয়া বদল করতে এসেও হোম্‌স জড়িয়ে পড়েন রহস্য-তদন্তে। তারপর···

হোম্‌স ইন্সপেকটরের কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে খুব খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললে, "এই কাগজটা সত্যিই খুব ইন্টারেস্টিং। আমি যা ভেবেছিলুম তা তো নয়। এ বেশ গভীর জল।"

এরপর হোম্‌স আর কোনও কথা না বলে মাথা হেঁট করে চিন্তা করতে লাগল। হোম্‌স যে এই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমত মাথা ঘামাচ্ছে তা দেখে তরুণ পুলিশ ইন্সপেকটর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

খানিক পরে ইন্সপেকটরকে লক্ষ করে হোম্‌স বললে, "আপনি একটু আগে বলছিলেন যে, ডাকাতদের সঙ্গে বাড়ির চাকরের যোগসাজস ছিল, আর এই কাগজটা ওদেরই কেউ কাউকে লিখেছিল ওখানে ওসময়ে দেখা করতে বলে, সেটা যে একদম অসম্ভব তা নয়। কিন্তু এই লেখাটা দেখে মনে হচ্ছে···," কথাটা শেষ না করেই হোম্‌স আবার মাথা নিচু করল। বুঝলুম যে, লেখাটা হোম্‌সকে ভাবিয়ে তুলেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে হোম্‌স যখন মুখ তুললে তখন তার দিকে তাকিয়ে আমি তো অবাক। তার চোখেমুখে আগেকার সেই ঝকমকে ভাবটা ফিরে এসেছে। চোখ দুটো ছুরির মতো চকচক করছে। এক মুহূর্তে হোম্‌স যেন তার হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। হোম্‌স চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। উৎসাহে সে একেবারে টগবগ করছে।

"ইন্সপেকটর, আপনাকে আমি সব কথা বলব। তার আগে আমি সব কিছু একবার ভাল করে দেখে নিতে চাই। আজ পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে তা কিন্তু মোটেই তুচ্ছ ব্যাপার নয়। এর মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা আমাকে সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। কর্নেল, যদি কিছু মনে না করেন তো আপনি আর ওয়াটসন এখানে বসে গল্পগুজব করুন, আমি ইন্সপেকটরকে সঙ্গে নিয়ে চারধার একবার ঘুরে আসি। সব শুনে আমার কয়েকটা কথা মনে হচ্ছে। সেগুলো ঠিক কি ভুল আমি একবার যাচাই করে দেখতে চাই। আমাদের দেরি হবে না। আধ ঘন্টার মধ্যেই ফিরে আসব।"

পাক্কা দেড়টি ঘন্টা কেটে গেল। হোম্‌সের টিকির দেখা নেই। কী হল ভাবছি, এমন সময় ইন্সপেকটর এসে হাজির। "মিঃ হোম্‌স ওই দিকের মাঠে পায়চারি করছেন। আপনাদের আমার সঙ্গে সেখানে যেতে বললেন। তাঁর ইচ্ছে আমরা চারজন একই বাড়ির ভেতরে ঢুকি।"

"বাড়ির ভেতরে ঢুকব ? কার বাড়ির ? মিঃ কানিংহামের ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কেন ?"

ইন্সপেকটর খুবই হতাশ ভাবে কাঁধ নাচালেন, "কেন তা আমি বলতে পারব না। নিজেদের মধ্যে কথা বলেই বলছি, কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হচ্ছে মিঃ হোম্‌স এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। এমন উদ্ভট-উদ্ভট কাণ্ড করছেন যে কী বলব ! থেকে-থেকে আবার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠছেন।"

ইন্সপেকটরকে আশ্বস্ত করে আমি বললুম, "আপনি ঘাবড়াবেন না। আমি বরাবর দেখে আসছি যে, হোম্‌সের পাগলামির মধ্যেও একটা যুক্তির পরম্পরা থাকে। কারণ না থাকলে সে কোনও কাজই করে না।"

ইন্সপেকটর নিচু গলায় বললেন, "লোকে অবশ্য ভাবতে পারে যে ওর কাজকর্মের ধারায় পাগলামিটাই বেশি। সে যাই হোক, এখন কাজ শুরু করার জন্যে উনি ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনারা যদি তৈরি থাকেন তো চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

আমরা যখন মাঠে এসে পৌঁছলুম তখন হোম্‌স ট্রাউজার্সের পকেটে হাত পুরে মুখ বুকের সঙ্গে প্রায় ঠেকিয়ে দিয়ে পায়চারি করছিল।

আমাদের দেখে হোম্‌স বললে, "বেশ গোলমেলে ব্যাপার। ওয়াটসন, শহর থেকে দূরে হাওয়া বদলাতে আসা সার্থক হয়েছে। সকালটা আজ খুব আনন্দে কাটল।"

কর্নেল বললেন, "মনে হচ্ছে যেখানে খুন হয়েছে সেখানে আপনি গিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ। ইন্সপেকটরের সঙ্গে এক চক্কর ঘুরে এলুম।"

"কিছু সুরাহা হল ?"

"হ্যাঁ, তা হয়েছে বইকী। অনেক নতুন জিনিস দেখলুম। চলুন যেতে যেতে সব কথা বলব। প্রথমে উইলিয়মের মৃতদেহটা পরীক্ষা করলুম। লোকটা গুলিতেই মারা গেছে।"

"আপনি কি গুলিতে মারা যাবার কথাটা বিশ্বাস করেননি ?"

"তা নয়। তবে গোয়েন্দাকে সব কিছু যাচাই করে নিতে হয়। আর এই যাচাই করাটা বৃথা যায়নি। মিঃ কানিংহাম আর তাঁর ছেলের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তাঁরা দু'জনেই বাগানের ঠিক কোন্ জায়গা দিয়ে বেড়া টপকে খুনি পালিয়েছিল, তা দেখিয়ে দিলেন। এই খবরটা খুবই কাজের হয়েছে।"

"তা তো বটেই।"

"তারপর আমরা গেলুম উইলিয়মের বুড়ি মায়ের কাছে। তাঁর কাছে অবশ্য নতুন কিছু জানতে পারিনি। একে তো থুত্থুড়ে বুড়ি, তার ওপর

আবার এই ব্যাপারে একেবারে ভেঙে পড়েছেন।"

"তা বেশ। কিন্তু তদন্তের ফল কী হল?"

"তদন্তের ফলে এটা জানতে পেরেছি যে, এটা একটা অদ্ভুত ধরনের ক্রাইম। তবে আশা করি, সদলবলে ওখানে হাজির হয়ে আমরা এই রহস্যের কিনারা করতে পারব। ইন্সপেকটর আর আমি দু'জনেই একমত যে, মৃত ব্যক্তির হাতে যে কাগজের টুকরোটা পাওয়া গেছে তাতে তার মৃত্যুর সঠিক সময়টা লেখা আছে। আর এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।"

"হ্যাঁ। এই তথ্য থেকে আমরা একটা সূত্র পেয়ে যেতে পারি।"

"এটাই একটা সূত্র। যে-ই চিঠিটা লিখে থাকুক সে-ই উইলিয়মকে অত রাত্রে ঘর থেকে বের করে এনেছিল। কিন্তু চিঠির বাকি অংশটা কোথায় গেল?"

ইন্সপেকটর বললেন, "বাকি অংশটার জন্যে আমি চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।"

"কাগজটা মৃত উইলিয়মের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে এই কাগজটা ফিরে পাওয়ার জন্যে কেউ খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই কাগজটাতে এমন কিছু ছিল যাতে পত্রলেখকের পরিচয় ফাঁস হয়ে যেত। কথা হচ্ছে, কাগজটা মৃতের হাত থেকে টেনে নিয়ে সে করল কী? নিশ্চয়ই কাগজটা সে তার জামার পকেটে পুরে ফেলবে। কাগজটার একটা কোণ যে ছিঁড়ে গেছে সেটা খুব সম্ভব সে খেয়াল করেনি। যদি টুকরো কাগজের বাকি অংশটা কোনওভাবে জোগাড় করতে পারা যায় তবে রহস্যের বারো আনাই সমাধান হয়ে যাবে।"

"সে কথা ঠিক। তবে অপরাধীকে ধরতে না পারলে তার পকেট হাতড়ানো যাবে কী করে?"

"হ্যাঁ। সে ব্যাপারটা অবশ্য ভেবে দেখতে হবে। তা ছাড়া একটা বড় কথা, চিঠিটা উইলিয়মকে পাঠানো হয়েছিল। চিঠিটা যে লিখেছিল সে নিজেই নিশ্চয়ই এটা পৌঁছে দেয়নি। তা হলে সে তো মুখেই কথাটা বলে আসতে পারত। চিঠি লেখার দরকার হত না। চিঠিটা কে পৌঁছে দিয়েছিল? নাকি চিঠিটা ডাকে এসেছিল?"

ইন্সপেকটর বললেন, "আমি খোঁজখবর করেছিলুম। গতকাল বিকেলের ডাকে উইলিয়ম একটা চিঠি পেয়েছিল। সে খামটা নষ্ট করে ফেলে।"

ইন্সপেকটরের পিঠ চাপড়ে হোম্‌স বললে, "দারুণ! আপনি পোস্টম্যানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সত্যি আপনার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ আছে। যাক, আমরা উইলিয়মের বাড়ির কাছে এসে পড়েছি। কর্নেল, আপনারা যদি আসেন তো খুনের জায়গাটা আপনাদের দেখিয়ে দিই।"

যে বাড়িতে উইলিয়ম থাকত সে বাড়ির পাশ দিয়ে আমরা চলে গেলুম। বাড়িটা ছাড়িয়ে একটু গেলেই একটা রাস্তা। রাস্তার দুধারে ওক গাছের সারি। সেই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে কুইন অ্যানের আমলের একটা পুরনো বাড়ি। হোম্‌স আর ইন্সপেকটর আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলল। বাড়ির পাশে একটা দরজা। সেই দরজার পরে

বাগান। বাগানের বেড়ার ধারেই রাস্তা। রান্নাবাড়ির দরজার কাছে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিল। হোম্‌স কনস্টেবলকে বললে, "দরজাটা খুলে দাও তো অফিসার।" তারপর কর্নেলকে বললে, "ওই যে সিঁড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে অ্যালেক কানিংহাম দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখানে উইলিয়ম আর তার খুনি ধস্তাধস্তি করছিল। বাঁ দিকের ওই যে দ্বিতীয় জানলাটা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে দাঁড়িয়ে মিঃ কানিংহাম দেখেছিলেন যে, ওই ঝোপটা দেখছেন, ওই ঝোপের বাঁ দিক দিয়ে লোকটা ছুটে পালাচ্ছে। একই দৃশ্য অ্যালেকও দেখতে পান। ওই ঝোপটার জন্যেই কানিংহামরা জায়গাটা দেখাতে পেরেছে। মিস্টার অ্যালেক আহত লোকটির কাছে ছুটে যান। তারপর তার শুশ্রূষা করতে থাকেন। এখানকার জমিটা খুব শক্ত। তাই কোনও পায়ের ছাপ পড়েনি যা পেলে আমরা রহস্য সমাধানে এগোতে পারতুম।"

হোম্‌স যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল তখন বাগানের রাস্তা ধরে বাড়ির পেছন দিক থেকে দু'জন লোক এগিয়ে আসছিলেন। দু'জনের মধ্যে একজন বেশ বয়স্ক। আর একজন কমবয়সী। বয়স্ক ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালে চোখে পড়ে তাঁর মোটা-মোটা ভুরু আর বড়-বড় চোখ। ভদ্রলোকের মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেছে। কমবয়সী লোকটি, যাকে বলে বেশ শৌখিন যুবক। পরনে বেশ রঙদার বাহারি পোশাক। চোখেমুখে হাসিখুশির ভাব। আমার মনে হল যে, পরিবেশের সঙ্গে ছোকরা একেবারেই বেমানান।

ছোকরাটি হোম্‌সকে লক্ষ করে বললে, "এখনও তদন্ত করছেন? আমার ধারণা ছিল আপনারা মানে লণ্ডনওলারা কখনও ভুল করেন না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি খুনিকে ঝটপট ধরে ফেলার এলেম আপনাদের নেই।"

হোম্‌স হাসি-হাসি মুখ করে বললে, "আমাকে আর-একটু সময় দিন।"

অ্যালেক কানিংহাম বললে, "সময় আপনার লাগবেই তো। খুনিকে যে ধরবেন তার কোনও সূত্রই পাওয়া যাচ্ছে না।"

ইন্সপেকটর বললেন, "না, একটা সূত্র আমরা পেয়েছি। আমাদের মনে হচ্ছে যে, যদি আমরা···আরে আরে আরে। মিঃ হোম্‌স, কী হল আপনার?"

হোম্‌সের মুখের চেহারা হঠাৎ কী রকম যেন হয়ে গেল। চোখের তারা বড়-বড় হয়ে ঘুরতে লাগল। চাউনি কেমন ঘোলাটে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হোম্‌স মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তার মুখ দিয়ে চাপা গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। হোম্‌সের শরীরের অবস্থা দেখে সকলেই রীতিমত ভয় পেয়ে গেলুম। হোম্‌সকে ধরাধরি করে রান্নাবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে একটা বড় আরামকেদারায় তাকে শুইয়ে দেওয়া হল। বেশ কিছুক্ষণ পরে হোম্‌স সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ দেখে বোঝা গেল যে, সে খুব লজ্জা পেয়েছে।

"আপনারা হয়তো ওয়াটসনের কাছে শুনে থাকবেন যে, কিছুদিন আগে আমার খুব বড়রকমের অসুখ করেছিল। এখন সেরে উঠেছি, তবে পুরোপুরি সুস্থ হইনি। মাঝে-মাঝে শরীরটা কেমন করে, তখন এই ধরনের একটা নার্ভাস শকের মতো হয়।"

মিঃ কানিংহাম বললেন, "আমাদের গাড়ি তা হলে আপনাকে বরং বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

হোম্‌স বললে, "যখন আমি এখানে এসেই পড়েছি একটা ব্যাপার যতক্ষণ না যাচাই করতে পারছি ততক্ষণ আমার মনে শান্তি হবে না। ব্যাপারটা সত্যি কি না সেটা সহজেই জানা যেতে পারবে।"

"কী জানতে চান বলুন?"

"আমার মনে হচ্ছে যে, উইলিয়ম বেচারা হয়তো ডাকাত পড়বার আগে নয়, পরেই বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল। আপনারা কেন ধরে নিচ্ছেন যে, দরজা ভাঙা হলেও ডাকাত বাড়িতে ঢুকতে পারেনি?"

মিঃ কানিংহাম গম্ভীরভাবে বললেন, "এটা তো জলের মতো পরিষ্কার। আমার ছেলে অ্যালেক তখনও শুতে যায়নি। বাড়ির মধ্যে কেউ ঢুকলে সে নিশ্চয়ই টের পেত।"

"উনি ঠিক কোথায় বসে ছিলেন?"

"আমি আমার বসার ঘরে বসে ধূমপান করছিলুম।"

"সে ঘরের জানলা কোন্‌টা?"

"বাঁ দিকের শেষ জানলা। বাবার ঘরের পাশেরটা।"

"আপনার ঘরের সব আলো জ্বলছিল তো?"

"অবশ্যই।"

হোম্‌স হেসে উঠে বললে, "হুঁ, অদ্ভুত কাণ্ড! ঘরে আলো জ্বলছে। সে আলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। তার মানে বাড়ির লোকজন এখনও জেগে আছে। এসব জেনেও ডাকাত, যে কিনা কিছুদিন আগেই এই এলাকার আর একটি বাড়িতে চুরি করেছে, বাড়ির দরজার চাবি ভেঙে ভেতরে ঢুকবে? এটা খুবই আশ্চর্যের কথা নয় কি?"

"এমনও তো হতে পারে যে, লোকটা ঘাগি।"

"আর তা ছাড়া কেসটা বেশ গোলমেলে বলেই তো আপনার সাহায্য আমরা চাইছি। তবে," মিঃ অ্যালেক বলে চললেন, "আপনি যে বললেন ডাকাত বাড়ির ভেতরে ঢোকবার পর উইলিয়ম ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয় তা কিন্তু একেবারেই অসম্ভব। তা যদি হত তা হলে হয় কোনও না কোনও জিনিস চুরি যেত নয় জিনিসপত্র ওলটপালট হয়ে থাকত।"

"কোনও কিছু চুরি গেছে কি না তা অবশ্য ধরা পড়বে কী ধরনের জিনিস চুরি গেছে তার ওপর। এ-কথাটা ভুলবেন না যে, আমরা এমন একজন অপরাধীর খোঁজ করছি যার কাজকর্ম উদ্ভট। লোকটাও হয়তো খুব খামখেয়ালি। অ্যাক্টনের বাড়ি থেকে সে কী জিনিস চুরি করেছে ভাবুন। চুরি করেছে এক বাণ্ডিল সুতো, একটা সাধারণ পেপারওয়েট আর এই রকমের সব বাজে জিনিস।"

মিঃ কানিংহাম বললেন, "আমরা তো আপনাদের হাতে সব দায়িত্ব যখন দিয়েছি তখন আপনি বা ইন্সপেকটর যা করতে বলবেন আমরা তাই করব।"

হোম্‌স বললে, "তা হলে আমি আপনাকে প্রথমেই বলব যে আপনার দিক থেকে আপনি একটি পুরস্কার ঘোষণা করুন। সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করাতে অনেক দেরি হবে। প্রথমত কত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে সেটা ঠিক করতেই মাসখানেক লেগে যাবে। সরকারি দফতরে তাড়াতাড়ি কিছু করা হয় না। আমি একটা মুসাবিদা করেছি। আপনি যদি এটা পড়ে সই করে দেন তো কাজটা চটপট হয়ে যায়। আমি পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়ার কথা লিখেছি।"

মিঃ কানিংহাম হোম্‌সের হাত থেকে কাগজটা নিতে-নিতে বললেন, "পঞ্চাশ পাউণ্ড কেন পাঁচশো পাউণ্ড দিতেও আমি রাজি আছি।"

তারপর কাগজটা পড়তে পড়তে তিনি হোম্‌সকে বললেন, "কিন্তু আপনি এখানে যা লিখেছেন তা তো ঠিক নয়।"

হোম্‌স বললে, "খুব তাড়াহুড়ো করে লিখতে হয়েছে কি না—"

"এই দেখুন না, আপনি লিখেছেন, 'গত মঙ্গলবার রাত্রে পৌনে এগারোটার সময় এক দুঃসাহসিক···।' আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল পৌনে বারোটার সময়।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

স্পাইডারম্যান
তেজস্ক্রিয় মাকড়সার কামড়ে পিটার পার্কার ওই পোকার আনুপাতিক শক্তি পেয়েছে···
লেখা: স্ট্যান লি
আঁকা: ফ্রোরো ডেরি
6
মেরি জেন কেন বিয়ে করবে না তার আরও একটা কারণ আছে বলেছে। কারণটা শোনার মতো অবস্থা আমার ছিল না।
আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। কোনও কিছু আমাদের দুজনকে দুজনের থেকে দূরে রাখুক, তা চাই না!
কিন্তু আমাদের ভালবাসাটাই আসলে সমস্যা।
তার মানে, তুমি আমাকে ভালবাস না, বলছ?
ওঃ, না! ভালবাসি। তুমি তো জানো!
আমরা ভালবাসি বলেই তো একদিন সন্তান চাইব!
কিন্তু ওরা যদি তোমার ক্ষমতা পায়?
ছেলে যদি ঘরের ছাদে ঝুলতে ঝুলতে পড়াশোনা করে, আমি কী করে ওকে সামলাব?
অথবা মেয়ে যদি দেওয়ালে হামাগুড়ি দেয়!
আমি তোমাকে ভালবাসি পিটার, কিন্তু এটা পারব না!
আমার বলার কিছু ছিল না!
এরপর : নাটকীয় সিদ্ধান্ত!

স্পাইডারম্যান

লেখা : স্ট্যান লি
আঁকা : জোরো ডেরি

দৈত্যের মতো কাজ শুরু করলাম যাতে মেরি জেনকে ভুলে যাই···

ব্যাঙ্কের স্বয়ংক্রিয় টেলার নিয়ে গোলযোগ। ভুলব কী করে?

ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে কেউ একজন মে আন্টি ও আরও কয়েকজনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চুরি করেছে।

আমি আমার স্পাইডারম্যানের পোশাক পরতে চললাম। কিন্তু।···

না, পোশাকটা পরব না। তা হলে মেরি জেনের কথা মনে পড়ে যাবে!

ব্যাঙ্কের গোলযোগ মেটাতে হিরোর মতো চেহারা নেওয়ার দরকার নেই। পিটার পার্কারই এটা মেটাতে পারবে।

বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। আমার মনের সঙ্গে এর মিল পাচ্ছি।

ওহো, কে ওখানে?

এলিস ফস্টার। দেখে মনে হচ্ছে, ওর দারুণ পোশাকটা ভিজে গেলেও কিছু যায় আসে না।

অন্য কেউ হলে বর্ষাতি বা কিছু একটা চাইত।

এটাই সবচেয়ে বড় ক্লু। কিন্তু এমনই অমনোযোগী ছিলাম যে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি।

মেয়েদের আমি কখনও বুঝতে পারব না।

এরপর : যেন ভেলকি

এবার আর আমার সাধারণ পাউডারের কি দরকার?

সানলাইট-এর দাম এইটুকু আর, চমক রোদের মত

সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার

কাপড় ধোওয়ার কম দামী সাধারণ পাউডার তো কতই রয়েছে কিন্তু কাপড়ে চমক ভরে দেওয়া সব পাউডারের কর্ম নয়। আপনার দরকার সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার—এর দাম হ'ল, একেবারে ন্যায্য, আর কাপড়ে রোদের মত চমক আনে। শুধু একবার ব্যবহার করুন, তারপর আপনিও বলবেন, 'আমার আর সাধারণ পাউডারের কি দরকার।'

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/738i R Ben

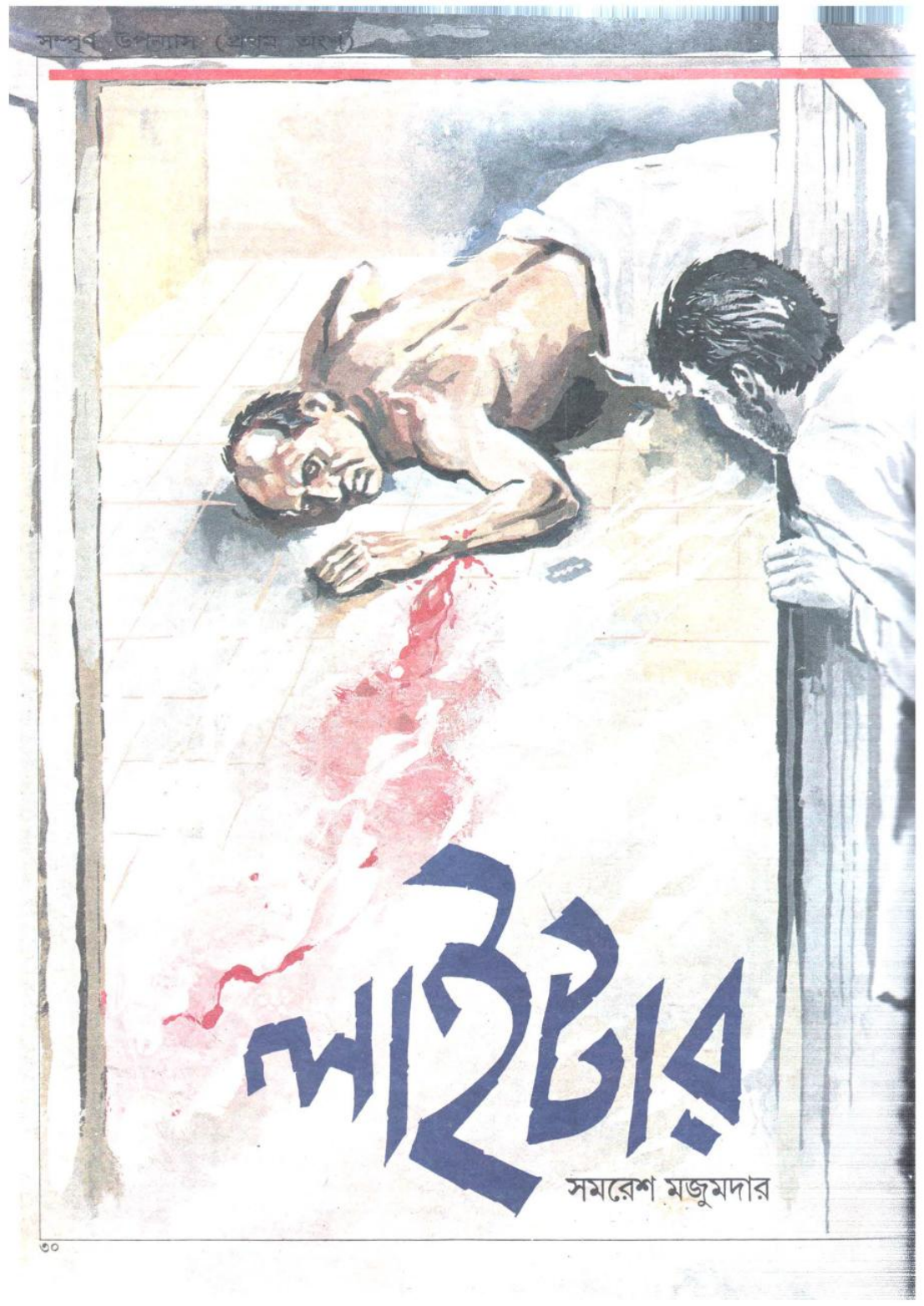

লাইটার

সমরেশ মজুমদার

'আলোছায়া'তে চমৎকার একটা ছবি দেখাচ্ছে। ক্রাইম অ্যাট মিডনাইট।.

দুপুরবেলায় আজ অর্জুনের কিছু করার ছিল না। গতকাল সে শেষ ইন্টারভিউ দিয়েছে। প্রতিবার মনে হয়েছে চাকরিটা হয়ে যাবে কিন্তু কখনওই হয়নি। বি· এ· পাশ করে সে এখন সত্যিকারের বেকার। অমল সোম জলপাইগুড়ি শহরে না থাকায় নতুন কোনও কেসও আসছে না। তা ছাড়া অমলদা বেশি কেস নেওয়া পছন্দ করেন না। দিন কুড়ি আগে কালিম্পং থেকে বিষ্টুসাহেব লিখেছিলেন তাঁর শরীর খুব অসুস্থ। রাত্রে ঘুম হয় না, হাঁটলে মাথা ঘোরে। ডাক্তাররা পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। চিঠির শেষে বিষ্টুসাহেব লিখেছিলেন, 'ঈশ্বরের তৈরি এই পৃথিবীতে আমি শুধু শুয়ে থাকব অর্জুন ? বাইরে কত কী ঘটছে, কিছুই দেখতে পাব না ? আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে, তা মাদার টেরেসাকে উইল করে দিয়ে যাব স্থির করেছি। ঈশ্বরের কাজে লাগুক।' এই চিঠি পেয়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করেছিল বিষ্টুসাহেবকে কালিম্পংয়ে গিয়ে দেখে আসে। কিন্তু কালিম্পংয়ে যাওয়া-আসায় তো অন্তত তিরিশটা টাকা খরচ। মায়ের কাছে আজকাল টাকা চাইতে লজ্জা করে।

'রূপমায়া'র সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে হাউসফুল বোর্ডটাকে ঝুলতে দেখল। কিন্তু তখনই কাটা-গদাইয়ের চোখে পড়ে গেল সে। অর্জুনকে দেখে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল সে। জোর করে তাকে সিনেমা দেখাবেই কাটা-গদাই। এই শহরে তার একটা বিশেষ খাতির আছে। শহরের যাঁরা মাথা, তাঁরা স্বীকার করুন বা না করুন, সাধারণ মানুষ তাকে খুব সমীহ করে। কাটা-গদাই এই সিনেমা হলের চত্বরেই থাকে। বোধহয় টিকিট ব্ল্যাকের ব্যাপারেও তার হাত আছে। কিন্তু সে বলল, "তুমি সিনেমা দেখতে এসে ফিরে যাবে এটা জলপাইগুড়ির লজ্জা।"

পয়সা দিয়ে টিকিট নিল অর্জুন। কাটা-গদাই রাজি হচ্ছিল না। সিনেমা হলে বসে অর্জুনের মনে হল, এই একটি কারণেই তার চাকরি হচ্ছে না। সবাই ভাবে ছেলেটা গোয়েন্দাগিরি করে, একে কাজ দিলে কোথা থেকে কী হয়ে যায়! ছবিটা সত্যি ভাল। মুগ্ধ হয়ে দেখল অর্জুন। অপরাধীকে বুঝতে পারা যাচ্ছিল না শেষ দৃশ্য পর্যন্ত। ছবি দেখে বেরিয়ে আসছে ভিড়ের সঙ্গে, হঠাৎ কানের পাশে ফিসফিসানি শুনল, "তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।"

মুখ ফিরিয়ে সে কাটা-গদাইকে দেখল। কাটা-গদাই বলল, "এখন নয়, পরে বলব।"

এই শহরে দু'জন গদাই খুব পরিচিত ছিল। পোড়া-গদাই আর কাটা-গদাই। সে ছেলেবেলা থেকে ওই নাম দুটো শুনে আসছে। কেন তাদের ওই নামে ডাকা হয়, তা কখনও জানতে চায়নি। কাটা-গদাই তার কাজে চলে গেলে অর্জুন অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। ঠিক কী বলতে চায় কাটা-গদাই। ওর সঙ্গে কী কথা থাকতে পারে? একটু আগে দেখা ছবির ডিটেকটিভকে একটা লোক ওইভাবে এসে বলেছিল, কথা আছে। অর্জুন হেসে ফেলল। নিশ্চয়ই কাটা-গদাই ছবিটা দেখেছে।

"এই অর্জুন। একবার এসো।"

ডাকটা শুনে সে বাঁ দিকে তাকাল। চৌধুরী মেডিক্যাল স্টোর্সের রামদা তাকে ডাকছেন। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ মানুষ। চেহারা দেখলে কিছুদিন আগে সিনেমার নায়ক বলে মনে হত। কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানোমাত্র রামদা বললেন, "একটু আগে এক ভদ্রলোক অমল সোমের খোঁজ করছিলেন। আমি বললাম, উনি শহরে নেই। তবু হদিসটা জেনে নিয়ে চলে গেলেন। খুব জরুরি ব্যাপার বলে মনে হল।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি ভদ্রলোককে চেনেন?"

"না, না। উনি এই শহরের মানুষ নন। সঙ্গে গাড়ি ছিল।"

অর্জুন আর দাঁড়াল না। একটা রিকশা নিয়ে সে হাকিমপাড়ায় যেতে বলল। এখন ভরা বিকেল। রোদ নেই। জলপাইগুড়ি শহরে বৃষ্টিটা সবে শেষ হয়েছে। শীত আসতে কয়েক সপ্তাহ দেরি। এই সময় হাঁটতে ভাল লাগে। কিন্তু শহরে অমল সোম নেই জেনেও ভদ্রলোক বাড়িতে গেলেন কেন? অবশ্যই কিছু লিখে যেতে চাইছেন। অথবা এমনও হতে পারে, অমলদার কোনও বন্ধুবান্ধব। অবশ্য এতকাল সেরকম কেউ আসেননি।

দূর থেকেই গাড়িটাকে দেখতে পেল সে। ওর গায়ে যে পরিমাণ ধুলো তাতে বোঝা যাচ্ছে সফরটা কম হয়নি। গেট খুলতেই হাবুকে দেখতে পেল। বাগান পরিষ্কার করছে সে। মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকে দেখে মুখে হাসি ফুটল তার। ইঙ্গিতে বাইরের ঘরটা দেখিয়ে দিল। অর্জুন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতেই চুরুটের গন্ধ পেল। গন্ধটা মোটেই ভাল নয়। আর তারপরেই ভদ্রলোকের মুখোমুখি হল।

বেতের চেয়ারে বসে চুপচাপ চুরুট খাচ্ছেন পঞ্চাশ পার হওয়া মানুষটি। বেশ মোটাসোটা, মাথায় টাক, চোখের তলায় কমলালেবুর কোয়া, পরনে ছাইরঙা স্যুট। অর্জুন ঘরে ঢুকে বলল, "নমস্কার। আপনি অমল সোমকে চাইছেন?"

ভদ্রলোক কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন অর্জুনকে পড়ে নিচ্ছিল।

"অমলদা বাইরে গেছেন।"

"খবরটা আমি শহরেই শুনেছি। এখানে এসে ওই নোটিসটা পড়েছি। আমাকে অশিক্ষিত ভাবার কি খুব কারণ আছে?" মুখের অভিব্যক্তি না পালটে চুরুট খেতে খেতে কথাগুলো বললেন ভদ্রলোক। এবং অর্জুন বুঝতে পারল ইনি সাধারণ নন।

সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তারপর শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, "বলুন, আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি। আমি অর্জুন। অমল সোমের সহকারী।"

"প্রথমে আমি দুটো প্রশ্ন করব। কোনও গোয়েন্দা তার খবরাখবর দেবার জন্যে একটা বোবা লোককে বাড়িতে রাখে কেন?" ভদ্রলোককে খুব উত্তেজিত দেখাল।

অর্জুন হেসে ফেলল, "আমি কিন্তু আপনার নাম জানি না।"

"কোনও দরকার নেই। আমি শুধু একজন কথা বলতে পারে এমন লোকের জন্যে বসেছিলাম। বোবা চাকর রেখে আর যাই হোক গোয়েন্দাগিরি চলে না।"

"প্রথমেই বলে রাখি গোয়েন্দাগিরি আমরা করি না। আমরা সত্যসন্ধানী। হাবু কথা না বলতে পারলেও অমলদা ওকে অতিপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অর্জুনের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার সোম কবে ফিরছেন?"

"জানি না। ওঁর ইচ্ছে হয়েছে সারা দেশটা ঘুরে আসবেন।"

"মোস্ট আনপ্রফেশনাল! এই জন্যেই দেশটার কিছু হল না। তা হলে আমি চলি!"

"আমি বুঝতে পারছি না এত দূর থেকে এসে আপনি চলে যাবেন কেন?"

"কারণ, যাঁর কাছে এসেছিলাম তিনি নেই বলে।" উঠতে চাইলেন ভদ্রলোক।

"কিন্তু রায়গঞ্জ অথবা মালদা থেকে আসতে অনেক সময় লেগেছে আপনার।"

"কী করে বোঝা গেল আমি কোত্থেকে আসছি?" ভদ্রলোক উঠলেন না।

"আপনি ডুয়ার্স থেকে আসছেন না। কারণ ডুয়ার্সের রাস্তাগুলো সুন্দর পিচের, তাতে ধুলো ওড়ে না। দার্জিলিং বা কালিম্পং থেকে নামছেন না। পাহাড়ে ধুলো নেই। কিন্তু আপনার গাড়ির যা অবস্থা তাতে ওই দিক থেকে আসছেন বলে মনে হয়।"

"অনুমান মিলল না। অমল সোমও এইরকম অনুমান করেন নাকি। তা হলে আসাটা বৃথাই হল।" ভদ্রলোক আর বসলেন না। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, "এই শহরে কোনও ভাল হোটেল আছে? আমি টায়ার্ড।"

"ভাল হোটেল নেই। তিস্তা বাংলোতে ট্রাই করতে পারেন।"

অর্জুন ওঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কোনও কথা না বলে গাড়ি ঘুরিয়ে তিনি চলে গেলেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছিল। উত্তেজনা নিশ্চয়ই আছে, বোধহয় প্রেশারও ওপরের দিকে। কিন্তু নিজের পরিচয়টা দেবার প্রয়োজন মনে করলেন না ভদ্রলোক। হঠাৎ নিজের ওপর তার রাগ হল। আগ বাড়িয়ে বলার কী দরকার ছিল কোত্থেকে আসছেন ভদ্রলোক। অমলদা যেমন ঠিকঠাক বলে দেন তেমন যদি সে বলতে পারত! তা ছাড়া সে নিজে কেস করতে চাইছে অথচ মুখ ফুটে ভদ্রলোককে সে-কথা বলতেও পারল না।

ঝুপঝাপ অন্ধকার নেমে গেল। দূরে শঙ্খ বাজছে। এ-বাড়িতে অবশ্য সে-বালাই নেই। অর্জুন বারান্দায় উঠে এসে দেখল হাবু আলো জ্বেলে দিল। তাকে দেখতে পেয়ে হাবু ওপাশের টেবিল থেকে দুটো খাম এনে সামনে ধরল। ওপরে অমল সোমের নাম লেখা, কোনায় ফ্রম বিষ্টুসাহেব। দ্বিতীয়টার ওপরে তার নাম লেখা। এই বাড়ির ঠিকানায় তার কোনও চিঠি আসে না। খানিকটা অবাক হয়ে সে খামটা খুলতেই অমলদার নামটা দেখতে পেল।

'স্নেহের অর্জুন, তোমার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি না দিয়ে নিজেরটা ব্যবহার করলাম। কারণ, যখনই কাউকে চিঠি লিখি, তখন তার ঠিকানা লিখতে হয়

নিজের ঠিকানায় চিঠি পাঠানোর সুযোগ আজ অবধি পাইনি। অবাক হোয়ো না।

গতকাল বোম্বাইতে এসেছি। একা-একা এই ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগছে। চেনা মানুষ যে একেবারেই সামনে আসেনি তা নয়, কিন্তু যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলছি। কবে ফিরব জানি না। হাবুকে টাকা-পয়সা দিয়ে এসেছি। মাঝে-মাঝে নিশ্চয়ই খোঁজ নিচ্ছ। নতুন কোনও কেস পেলে পারো তো কোরো। শুধু দুটো জিনিস মনে রাখবে। কখনও বেশি উৎসাহ দেখাবে না। আর সত্যের সন্ধানে যদি হনলুলুতেও যেতে হয় যাবে।

বিষ্টুসাহেবের জন্যে মনটা কিছুদিন থেকেই খারাপ। ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত অথর্ব হয়ে গেলেন। উনি কি কোনও চিঠিপত্র দিয়েছেন তোমাকে? আমার নামে দিলেও তুমি পড়তে পারো। বিষ্টুবাবু আমাকে একটা আমেরিকান লাইটার উপহার দেবেন বলেছিলেন। জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স কোম্পানির। এ-দেশে পাওয়া যায় না। ওঁর এক বোন থাকেন নিউইয়র্কে। তাঁকে লিখেছিলেন পাঠাতে। মানুষটি সত্যি ভাল। ওঁকে হারালে পরমাত্মীয়কে হারাব। শুভেচ্ছা জেনো। অমলদা।'

চিঠির তারিখ পাঁচ দিন আগের। অমলদা কোথায় যাবেন এরপরে, তার কোনও ইঙ্গিত দেননি। মানুষটি হঠাৎ কেন এমন ভবঘুরে হয়ে গেলেন, ভেবে পায় না অর্জুন।

এবার বিষ্টুসাহেবের চিঠিটার দিকে তাকাল। অমলদা যখন অনুমতি দিয়েছেন, তখন স্বচ্ছন্দে খোলা যেতে পারে।

'মাননীয়েষু, আশা করি ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রেখেছেন। আমি ভাল নেই। হাঁটতে বড় কষ্ট হয়। কালিম্পংয়ে একা খুব খারাপ লাগছে। তা ছাড়া আপনাদের সঙ্গ দীর্ঘকাল পাইনি। মনে পড়ে, সেই খুনখারাপি থেকে শুরু করে চণ্ডীগড় পর্যন্ত আমরা কত না রোমাঞ্চিত হয়েছি। ভাল বাংলা লিখতে পারি না বলে মার্জনা করবেন। একটি জরুরি ব্যাপার ঘটেছে। আমার যে বোন নিউইয়র্কে থাকে, সে বায়না ধরেছে যে, আমি যেন তার কাছে চলে যাই। সেখানে সে আমার চিকিৎসা করাবে। আমি জানি এই রোগ বার্ধক্যের। কোথাও গেলে সারবে না! কিন্তু বাঁচতে বড় লোভ হয়। এখানকার বাড়িঘর বিক্রি করে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে সেখানেই চলে যাই। একা যেতে সাহস হচ্ছে না। আপনি যাবেন? জানি খুব ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু এই বৃদ্ধ বন্ধুকে সাহায্য করা কি অসম্ভব? আমাদের পাশপোর্ট-ভিসা-টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে আপনার সম্মতি পেলেই। ইতি, গুণমুগ্ধ বিষ্টুসাহেব।'

মনটা কেমন হয়ে গেল অর্জুনের। ওইরকম হাসিখুশি মানুষটির এই পরিণতি তার একটুও ভাল লাগছিল না। কিন্তু এখন কী হবে? অমলদা কবে ফিরবেন জানা নেই। এই চিঠির খবরটাও তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার উপায় নেই। সে ঠিক করল বিষ্টুসাহেবকে বিস্তারিত জানাবে।

রাত হচ্ছিল। হাবুকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে বলবে বলে অর্জুন এগোতেই চোখে পড়ল, চেয়ারের নীচে কী একটা পড়েছে। নীল চকচকে জিনিসটায় আলো পড়ায় আকর্ষক মনে হচ্ছে। ঝুঁকে সে হাতে নিতে শীতল স্পর্শ এবং গঠনে বুঝল ওটা একটা লাইটার। এই বাড়িতে লাইটার তো এভাবে পড়ে থাকার কথা নয়। মনে পড়ল, এই চেয়ারে বিকেলের আগন্তুক বসে চুরুট খাচ্ছিলেন। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই, লাইটারটা তাঁর। মানুষটাকে দেখলে মনে হয় না তিনি এত অসতর্ক। সে টেবিলের ওপর লাইটারটা রাখতে গিয়ে পেছনে কয়েকটা অক্ষর দেখতে পেল। একটু কৌতূহলী হয়ে লাইটারটাকে চোখের সামনে ধরতেই স্পষ্ট পড়তে পারল, 'জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স।'

॥ দুই ॥

সাইকেল-রিকশা জলপাইগুড়িতে সন্ধে সাতটার পর পাওয়া যায় না। তা ছাড়া তিস্তা নদীর ধারে এই হাকিমপাড়াটা শহরের একধারে বলে এদিকে আসতেই চায় না। পথে বেরিয়ে অর্জুন খুব উত্তেজিত হয়ে হাঁটছিল। ব্যাপারটা স্রেফ কাকতালীয় হতে পারে। আজই অমলদার চিঠিতে সে জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স কোম্পানির কথা জানতে পারল। আবার ওই আগন্তুক যে লাইটার ফেলে গেছেন তাও জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স কোম্পানির। অথচ অমলদা লিখেছেন, এটা এদেশে পাওয়া যায় না! পি· ডব্লু· ডি· অফিসের সামনে দিয়ে বাঁক নিয়ে কয়লা ব্রিজ পেরিয়ে সে বাবুপাড়ায় চলে এল। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না বোঝা দায়।

ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে তিন নম্বর বাড়ির দরজায় শব্দ করল সে। ভেতর থেকে শুদ্ধ বাংলায় প্রশ্ন ভেসে এল, "পরিচয়?"

"আমি অর্জুন।"

দরজা খুললেন বৃদ্ধ। আশির কাছে বয়স। মাথায় শণের মতো

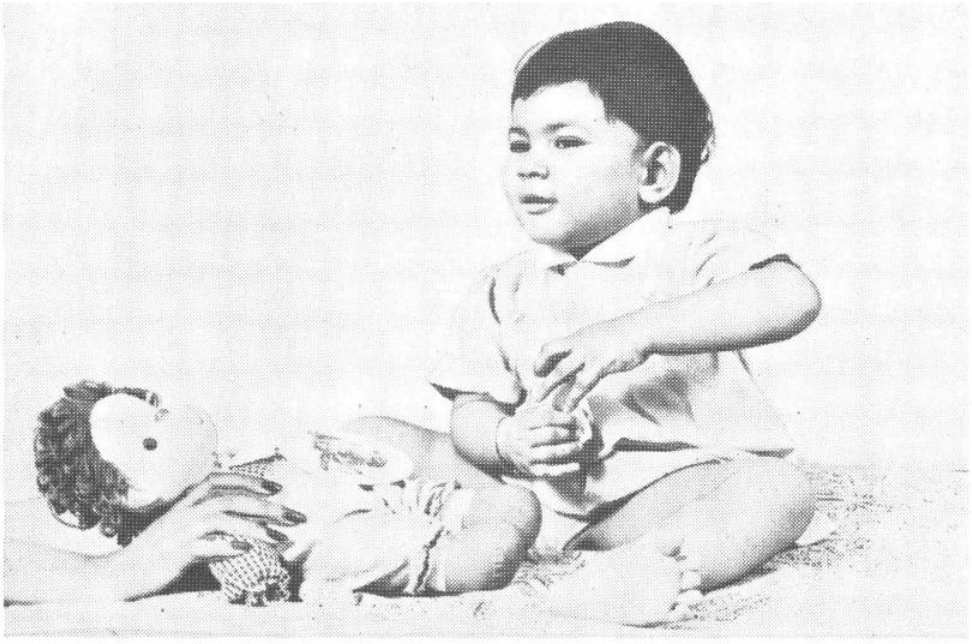

ভালবাসার উপহার যা শুধু বাড়ে আর বাড়ে

চিলড্রেনস গিফ্‌ট গ্রোথ ফান্ড ১৯৮৬

একটি বিনিয়োগ ৫ বছর অন্তর বোনাস ডিভিডেন্ডের সাথে যা ১২ গুণ অব্দি বাড়ে

ঠিক এর জন্যই আপনি অপেক্ষা করছিলেন। চিলড্রেনস গিফ্‌ট গ্রোথ ফান্ড ১৯৮৬ এমনিই এক প্রকল্প যা প্রিয় শিশুটির প্রতি আপনার যত্ন ও ভালবাসাকেই প্রকাশ করে তোলে।

এই প্রকল্পে আছে বছরে ১২.৫% হারে সুনিশ্চিত ডিভিডেন্ড যা আপনা থেকেই মূল বিনিয়োগের সাথে যোগ হয়। এবং প্রত্যেক ৫ বছরে আছে বিশেষ বোনাস ডিভিডেন্ড। এ সবের অর্থ হল' আপনার উপহারটি ৬ বছরে দ্বিগুন আর ২১ বছরে ১২ গুন হয়ে যায়।

অন্যান্য বৈশিষ্ট ঃ

যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক, পিতামাতা, স্বজন বা শুভাকাঙ্খী, ১৫ বছরের নীচে যে কোন শিশুকেই এই উপহার দিতে পারেন। বয়স যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই।

এই উপহার শিশুটির ২১ বছর বয়সে পূর্ণতা লাভ করে। ১৮ বছর বয়সেও ভাঙিয়ে নেওয়ার এক বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তার আগে মূল বিনিয়োগ বা ডিভিডেন্ড কোনটাতেই কেউ হাত দিতে পারবেন না।

নূন্যতম ৫০ টি ইউনিট বা তার গুণিতকে যে কোন সংখ্যক ইউনিটের জন্য আপনি আবেদন করতে পারেন। কোন উর্দ্ধসীমা নেই।

১৯৮৬-র ফিনান্স অ্যাকটে উপহার কর ছাড়ের সীমা ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)

আঞ্চলিক কার্যালয়
২ ও ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোনঃ ২৩-৯৩৯১, ২৩-১৬৩৮

শাখা কার্যালয়
আশা নিবাস ২৪৫ লুইস রোড, ভুবনেশ্বর ৭৫১ ০১৪
ফোনঃ ৫৬১৪১
পি. ডি. চালিহা রোড, শিলুপুকুড়ি, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০৩
ফোনঃ ২৩১৩১
জীবন দীপ বিল্ডিং, একজিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১
ফোনঃ ২২৪৭০

চুল। খুব রোগা। শীত-গ্রীষ্ম একটা গলাবন্ধ গেঞ্জি পরে থাকেন। হাসলেন তিনি, "কী সংবাদ তৃতীয় পাণ্ডব ? তিনি কি ফিরেছেন ?'

অর্জুন ভেতরে ঢুকল, "না। চিঠি দিয়েছেন, কবে ফিরবেন জানাননি।" এই বাড়িতে মোট পাঁচটি ঘর। যার সাড়ে চারটিতে বইপত্র ঠাসা। সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়, এই তথ্য অর্ধেক বিশ্বাস করেন সুধাময় সান্যাল। অর্ধেক কেন প্রশ্ন করলে বলেন, 'বইপত্র কাগজ দেখে অর্ধেক মনে হয়। বেশি স্মোক করলে গলায় লাগে, বাঁ দিকটা চিনচিন করে। কিন্তু যতক্ষণ ডাক্তার না বলছে ততক্ষণ, এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাব। আমার ক্যানসার হলে জলপাইগুড়ির কোনও মানুষ আর সিগারেট খাবে না।'

সুধাময় সান্যালের কাছে পৃথিবীর সব দেশের সিগারেট,পাইপ, তামাক এবং লাইটার আছে। দেশলাইয়ের বাক্স যে কত রকমের হয় না দেখলে ভাবাই যাবে না। ইদানীং উনি হাতে-পাকানো নেপালি সিগারেট খেতে ভালবাসছেন।

বেতের চেয়ারে বসে সুধাময় সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, "চাকরি পেলে না ?"

মাথা নেড়ে হাসল অর্জুন, "পাব-পাব করছি। আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি।"

"দরকার ছাড়া কেউ আসে না। আমি নাকি ক্যাটকেটে কথা বলি। বলে ফেলো !"

"জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স বলে কোনও লাইটার কোম্পানির নাম আপনি শুনেছেন ?"

সুধাময় সান্যাল অবাক হয়ে তাকালেন, "এ নাম তুমি জানলে কী করে হে ?"

"অমলদার চিঠিতে প্রথম জানি।"

"ও। অমলকে আমিই বলেছিলাম। অদ্ভুত লাইটার। আমেরিকানদের লেটেস্ট আবিষ্কার। আমি এখনও চোখে দেখিনি। 'টোব্যাকো' বলে একটা জার্নালে পড়েছিলাম। এমনিতে লাইটারটা লক্ করা থাকে। লক্ খুলে বোতাম টিপলে আগুন দেখতে পাবে না। কাছাকাছি সিগারেট নিয়ে গেলে ওটা ধরে যাবে। রাত্রে লাইটার জ্বাললে আলো দেখে কেউ যাতে বিরক্ত না হয় তাই এই ব্যবস্থা। অদৃশ্য আগুন বলতে পারো। এক নম্বর বোতাম অফ করে দু' নম্বরটা টিপলে লাইটারটা হয়ে যায় অস্ত্র। দশ ফুট যেতে পারে এমন একটা রে বের হয়, যা একটা হাতিকেও পাঁচ মিনিট অবশ করে রাখতে পারে। এই রে চোখে দেখা যায় না। আমেরিকান গভর্নমেন্ট লাইটারটাকে বাজারে ছাড়তে চায়নি। এখন শুনছি পরিচয়পত্র দেখিয়ে কিনতে হচ্ছে। আমার সংগ্রহে ওই বস্তুটি নেই। তোমার দাদাকে বলেছিলাম, যদি সম্ভব হয় ব্যবস্থা করতে। তিনি অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর এক বন্ধু কথা দিয়েছেন আমেরিকা থেকে আনিয়ে দেবেন। দেখা যাক। এদেশের মানুষ ওটা চোখেই দ্যাখেনি।" নেপালি সিগারেট ধরালেন তেকোনা দেশলাই কাঠি জ্বেলে। ধরিয়ে বললেন, "এটা সিঙ্গাপুর থেকে আনানো।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে অর্জুন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। তার হঠাৎ মনে হল, সুধাময় সান্যালকে বললে তিনি লাইটারটি নিয়ে নেবেন। অবশ্য তার পকেটে যে লাইটার রয়েছে সেটি এইরকম কাজ করবে কি না তা সে জানে না। কিন্তু দুর্লভ জিনিস যাঁরা সংগ্রহ করেন তাঁরা একটু পাগলাটে মানুষ হন। এমন গল্পও সে পড়েছে, একটা দুর্লভ বই সংগ্রহের জন্যে মানুষ খুন করতে বাধেনি সংগ্রাহকের। জোন্স অ্যাণ্ড জোন্সের লাইটারটা তার কাছে জানলে সুধাময় সান্যাল কিছুতেই ছাড়বেন না। অথচ বিকেলের আগন্তুক নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন খেয়াল হলেই। তখন কী জবাবদিহি দেবে সে ? উত্তেজনা চেপে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "জলপাইগুড়িতে ওই লাইটারের কথা আর কেউ জানে বলে মনে হয় ?"

চোখে চোখ রাখলেন সুধাময় সান্যাল, "কী ব্যাপার বলো তো ?"

"কোনও ব্যাপার নয়। যা বর্ণনা শুনলাম তাতে কৌতূহল হচ্ছে।"

"অ," একটু সহজ হলেন সুধাময় সান্যাল, "তোমাকে স্নেহ করি। তাই বলা যেতে পারে। তুমি রায়দের নাম জানো ? ওই যাদের পরিবারের মানুষরা আমেরিকায় থাকত। শিল্পসমিতিপাড়ায় বাড়ি। ওই বাড়ির ছোট ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স-এর নাম আমি জানি কি না। তোমার মুখেও একই কথা শুনে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম।"

"ভদ্রলোকের নাম কী ?"

"হরিপ্রসাদ রায়। সে আমাকে ওই লাইটার দেখাল। আমি লক্ খুলে বোতাম টিপলাম। কোনও ফ্লেম বের হল না কিন্তু সিগারেট ধরল। দ্বিতীয় বোতাম টিপতে রে বের হল হল না। বদলে অদৃশ্য আগুন দৃশ্যমান হল। ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। লাইটারটা জাল। দ্বিতীয় বোতাম টেপার পর রে বের হয় বলে ওটা আজ মূল্যবান। টোব্যাকোতে পড়েছি, হংকং থেকে জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স-এর নকল মাল বের হচ্ছে। কথাটা বলায় হরিপ্রসাদ খুব দুঃখিত হল। সে ওটা আমাকে দিতে চেয়েছিল, নিইনি। আসল ছেড়ে কে নকলে হাত দেয় !"

মিনিট-পাঁচেক এটা-সেটা বলে অর্জুন উঠে পড়ল। দ্রুত হেঁটে চলে এল করলা নদীর ধারে। এই জায়গাটা সন্ধের পরই অত্যন্ত নির্জন হয়ে যায়। পকেট থেকে লাইটারটা বের করে সে চোখের সামনে ধরল। ওপরটা সমান, কোনও গর্ত নেই। পাশে দুটো মসৃণ বোতাম আছে। ইংরেজিতে তাদের ওপর এক এবং দুই লেখা। ঠিক উলটো দিকে একটা চৌকো পাতের ওপর লক্ শব্দটা খোদাই করা। সন্তর্পণে সেটায় চাপ দিতে কুট্ করে শব্দ হল।

অর্জুন ইদানীং সিগারেট খাচ্ছে। দিনে চারটে। তার বেশি খাওয়ার ইচ্ছে হয় না, পয়সাও নেই। সে এখনও দাড়ি কামায়নি। গালে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের মতো সুন্দর দাড়ি বেরিয়েছে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে সে এক নম্বর বোতামটা টিপল। তারপর ধীরে সিগারেটের ডগাটা লক্ টেপার ফলে বের হওয়া একটা পেরেকের মাপে সরু গর্তের কাছে নিয়ে এসে টানতেই ধোঁয়া বের হল। সঙ্গে-সঙ্গে এক নম্বর বোতামটা দ্বিতীয়বার টিপে ওটাকে নিষ্ক্রিয় করল সে। সিগারেটে তার মন ছিল না। হাত কাঁপছিল। বুকের মধ্যে যেন ড্রাম বাজছে। এই আপাত-নিরীহ কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্রটি ভারতবর্ষে কারও কাছে নেই।

দ্বিতীয় বোতামটি পরীক্ষা করার জন্যে চারপাশে তাকাল। কোনও মানুষের ওপর প্রয়োগ করা যাবে না। সে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। থানার একটু আগে সে রাস্তার পাশে ঘাসে বসে জাবর কাটতে দেখল একটা ষাঁড়কে। সেই সময় দু'জন লোক গল্প করতে করতে এদিকে আসছিল। অর্জুন উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে ওদের যেতে দিল। তারপর ষাঁড়টার পাঁচ ফুটের মধ্যে চলে এল। একটু বিরক্ত হয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে ষাঁড়টা উঠে দাঁড়াল। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে ও মারা যাবে না ! খানিকক্ষণ শরীরটা অবশ হয়ে যাবে মাত্র। কিন্তু যদি মরে যায় ? অন্য কোনও প্রাণী, ইঁদুর, কাকের ওপর পরীক্ষা করলে হত না ! কিন্তু আজ রাত্রে তাদের কোথায় পাওয়া যাবে ! আর দ্বিধা না করে অর্জুন দ্বিতীয় বোতামটা টিপল সঠিক লক্ষ করে। ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর স্বচ্ছন্দে হাঁটতে লাগল। বিব্রত অর্জুন দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় বোতাম টিপতেই ছোট্ট আগুনটা দৃশ্যমান হল। যে-কোনও সাধারণ লাইটার জ্বাললে যেরকম আগুন বের হয়। লক্ করে লাইটার হাতে নিয়ে ঠোঁট কামড়াল অর্জুন। তার শরীর আচমকা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিকেলের অতিথির ফেলে যাওয়া লাইটারটাও জাল ? তার কষ্ট হচ্ছিল।

॥ তিন ॥

শিল্পসমিতিপাড়ায় হেঁটে আসতে বেশ সময় লাগল। রায়দের বাড়ি এই শহরের সবাই চেনে। এখন রাস্তাঘাটে তেমন মানুষ নেই। দোকানপাটও এই শহরে সাততাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া সিকদারবাড়ি ছাড়ালে দোকানও বেশি নেই। হরিপ্রসাদ রায়কে সে চেনে না। কিন্তু ভদ্রলোক থাকেন আমেরিকায়। এই গল্প সে জানে। মেমসাহেব বিয়ে করেছেন বলে বাড়িতে খুব ঝামেলাও হয়েছে। ওঁর বাবা খুব কনজারভেটিভ। অর্জুন ঠিক করেছিল হরিপ্রসাদ রায়কে অনুরোধ করবে তাঁর লাইটারটা দেখাতে। দুটো জাল জিনিসে কতটা তফাত দেখতে ইচ্ছে করছিল।

হরিপ্রসাদ রায় বাড়িতে নেই। দরোয়ান বলল, 'সাহেব কখন ফিরবেন বলে যাননি।' অর্জুন হতাশ হল। সিনেমা দেখবে বলে সাইকেল না নিয়ে বেরিয়ে এখন প্যা টনটন করছে। তবু ওর মনে হল যার লাইটার তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই ভাল। জাল জিনিস বয়ে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু সেই লোকটা এখন কোথায়?

জলপাইগুড়ি শহরে হোটেল বলতে একটাই। হোটেল না বলে একটা ভাল মেস বলাই সঙ্গত। আর আছে কয়েকটা বাংলো এবং জলপাইগুড়ি ক্লাব। শেষেরটার অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু সেখানে থাকতে গেলেও কোনও মেম্বারের সুপারিশ দরকার হয়। তিস্তা বাংলোটার অবস্থা খুব ভাল। যদিও খাবার আগে থেকে না বললে পাওয়া যায় না। যে মানুষ বিকেলে এসেছিলেন তাঁর পক্ষে এই শহরে থাকতে গেলে ওখানেই থাকতে হবে।

তিস্তা বাংলোটা শহর ছাড়িয়ে রেসকোর্সের ওপারে। অর্জুন দ্রুত হাঁটছিল। লোকটা খুব সাধারণ নয়। কথাবার্তায় ঔদ্ধত্য আছে। ওইভাবে বলাই সম্ভবত অভ্যেস। কিন্তু উনি নকল লাইটার নিয়ে এই শহরে আসবেন কেন বুঝতে পারছে না সে। পথে সেই হোটেলটা পড়েছিল। ম্যানেজারকে চেনে অর্জুন। তিনি বললেন, ওই বর্ণনার একটি লোক গাড়ি নিয়ে এখানে এসে খুব বাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, 'এটাকে হোটেল বলে? আপনাদের ব্যবসা চালাতে কী করে লাইসেন্স দেয় কে জানে!'

ম্যানেজার এ-কথায় খুব আঘাত পেয়েছেন। না-হয় একটু নর্দমার গন্ধ ঢোকে, বেডকভার রোজ পালটানো হয় না, তাই বলে এমন কথা! লোকটা গাড়ি নিয়ে এখান থেকে তিস্তা বাংলোর দিকে গিয়েছে।

অর্জুন যখন সেখানে পৌঁছল তখন রাত ন'টা। এখন এলাকায় নিশুতি রাত। গেট পেরিয়ে বিরাট বাংলোটাকে দেখল সে। আলো জ্বলছে। ঝকঝকে ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলোর সামনে কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। হতাশ হল সে। ভদ্রলোক হয়তো এখানে এসে কোনও ঘর খালি না পেয়ে শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। অনেক ভাল হোটেল আছে সেখানে। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। হাতে একটা জ্যান্ত মুরগি নিয়ে ঢুকছে। কাছাকাছি এসে সে লোকটাকে চিনতে পারল। এই বাংলোর বাবুর্চি। তাকে ওখানে দাঁড়াতে দেখে বাবুর্চিও একটু অবাক হয়েছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের বাংলোর সব ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছে?"

লোকটা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ সাব।" মুরগিটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এত রাত্রে মুরগি আনলে কেন?"

লোকটা বলল, "সাবলোককো মর্জি অ্যাইসাই হোতা হ্যায়। ছে বাজে ইঁহা রুম লিয়া আউর এক ঘন্টা পহেলে অর্ডার দিয়া মুরগি চাহিয়ে। আভি কাঁহা মিলেগা চিকেন? এক দোস্তসে লিয়া হ্যায়, দাম জাদা দেনে পড়েগা।"

অর্জুন সচেতন হল, "আচ্ছা। যে সাহেব বিকেলে এসেছে তার গাড়ি ছিল না?"

"হাঁ, থা।"

"তোমাদের এখানে গ্যারেজ আছে?"

"নেহি।"

"কত নম্বর রুমে সেই সাহেব আছেন?"

"তিন।" লোকটা আর দাঁড়াল না। মুরগি নিয়ে কিচেনের দিকে ছুটল। রাত্রের নির্জনতায় মুরগির প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠছিল।

অর্জুন বাংলোটার দিকে তাকাল। বিকেলের আগন্তুক যদি এখানে থাকেন তা হলে তাঁর গাড়ি কোথায় গেল? সে ধীরে-ধীরে বারান্দায় উঠে এল। কোলাপসিব্‌ল গেটটা টেনে দেওয়া কিন্তু এখনও তালা পড়েনি। চৌকিদারটা ধারেকাছে নেই। সোজা দোতলায় উঠে এল সে। লাউঞ্জের সোফায় বসে দু'জন ভদ্রমহিলা গল্প করছেন। অর্জুন উঠতেই তাঁরা একবার তাকিয়ে আবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আগামীকাল তাঁরা জলদাপাড়ায় যাচ্ছেন গণ্ডার দেখতে।

অর্জুন তিননম্বর ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, সেটা বন্ধ। লাউঞ্জ থেকে সরে আসায় কাউকে চোখে পড়ছে না। সে দরজায় নক করল। ভদ্রলোকের যখন রাতের খাওয়া হয়নি তখন নিশ্চয়ই এখনই ঘুমিয়ে পড়েননি। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। অর্জুন আর-একটু জোরে শব্দ করল। একটু অপেক্ষা সত্ত্বেও দরজাটা বন্ধই রইল। ভদ্রলোক যখন পরিশ্রান্ত তখন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। অর্জুন একটু অসহিষ্ণু হয়ে জোরে চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

একটু ইতস্তত করে অর্জুন ঘরে ঢুকল। মোটামুটি সুন্দর সাজানো ঘর। শহরের হোটেলের চেয়ে ঢের আধুনিক। কিন্তু কেউ নেই এখানে। যদিও একটা স্যুটকেস আর ব্রিফকেস রয়েছে। কিছু কাগজপত্র এবং রুমাল রয়েছে টেবিলের ওপর। বিছানা দেখে মনে হয় কেউ শুয়ে ছিল। জুতো-জোড়া বিছানার নীচে খোলা। ভদ্রলোক গেলেন কোথায়?

অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল। মালিকের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢোকা অবশ্যই অন্যায়। সে বাইরে বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকাল। কেউ নেই কাছাকাছি। সমস্ত ঘরের দরজা বন্ধ। আচ্ছা, ভদ্রলোক কি গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন? হয়তো অমলদার বাড়িতে গিয়েছেন লাইটারের খোঁজে। লোকটাকে দেখে অবশ্য মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই যে, উনি জানেন না লাইটারটা জাল। কিন্তু কেউ কি ঘরের দরজা খোলা রেখে বাংলোর বাইরে যাবে? তা ছাড়া জুতো পর্যন্ত রয়েছে ঘরে। চিন্তাটাকে বাতিল করল অর্জুন। তারপর আবার ঘরে ঢুকল। সে ঠিক করল, চেয়ারে বসে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না ভদ্রলোক ফেরেন।

মিনিট দশেক পার হয়ে গেল। রাত হচ্ছে। বাড়িতে আরও দেরি করে ফিরলে মা চিন্তা করবেন। অর্জুন উঠল। এবং তখনই তার বাথরুমের কথাটা খেয়াল হল। ভদ্রলোক হয়তো পরিষ্কার হবার জন্যে ওখানে গেছেন। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল সে। এতক্ষণ তো কারও বাথরুমে থাকার কথা নয়। অর্জুন ধীরে-ধীরে উঠে বাথরুমের দরজায় হাত রাখল। একবার শব্দ করল। তারপর একটু জোরে ঠেলতে গিয়ে নজরে পড়ল এপাশ থেকে ছিটকিনি বন্ধ রাখা হয়েছে। বিস্মিত হয়ে সেটাকে খুলে দরজা ঠেলতে অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোক বাথরুমের মেঝেতে শুয়ে আছেন পাশ ফিরে। তাঁর পরনে পাজামা। ঠিক তাঁর ওপরে খোলা কল থেকে জল এসে পড়ছে শরীরের ওপরে। ফলে জলের শব্দ হচ্ছে না। কিন্তু বাথরুমটা ভেসে যাচ্ছে। অর্জুন ধীরে-ধীরে শরীরটার পাশে এসে দাঁড়াল। দুটো চোখ খোলা। হাতের শিরা দুটো কাটা। তা থেকে অনর্গল রক্ত বেরিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেছে। এখনও কালচে হয়ে আছে কিছু জায়গা।

হাতের পাশে একটা ধারালো বিদেশী ব্লেড। দেখলেই বোঝা যায় উনি আত্মহত্যা করেছেন। অন্তত এক ঘন্টা আগে তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

॥ চার ॥

সহদেব বকসি বয়সে নবীন। স্মার্ট চেহারা। চালচলনে মনে হয় পুলিশ অফিসার না হয়ে যদি সিনেমার নায়ক হতেন, তবে আরও বেশি মানাত। পরের দিন বিকেলবেলায় থানায় তাঁর ঘরে বসে সহদেব কাঁধ নাচিয়ে বললেন, "ইটস্ এ সিম্পল কেস অব সুইসাইড। ভদ্রলোক বাথরুমে গিয়ে জলের কল খুলে নিজের হাতের শিরা কেটেছেন।"

অর্জুন চুপচাপ বসে ছিল সামনে। সহদেবকে তার ভাল লাগে। অমল সোমকে সহদেব ঠিক পছন্দ না করলেও অর্জুনের সঙ্গে ভাল ভাব আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "এটা তা হলে হত্যা নয়?"

"নট অ্যাট অল। কোনও মানুষের হাতের শিরা জোর করে কাটা যায় না। জোর করে ধরেবেঁধে তা করলে ধস্তাধস্তির চিহ্ন থাকত। ওর শরীরে কোনও দাগ নেই।"

"তা হলে উনি অমলদার কাছে গিয়েছিলেন কেন? নিশ্চয়ই কোনও বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল!"

"এইটেই তো এরা ভুল করে। হয়তো নিজে কোনও অন্যায় করেছিল, ভেবেছিল অমলবাবু বাঁচিয়ে দেবেন, কিন্তু তিনি না থাকায় ভয়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ভদ্রলোক আমাদের কাছে এলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। কাঠমাণ্ডু থেকে এসে জলপাইগুড়িতে মরতে হত না।"

অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাঠমাণ্ডু?"

"ও হ্যাঁ। তোমাকে বলা হয়নি! ভদ্রলোক এ-দেশের নাগরিকই নন। ওঁর কাছে আমেরিকান পাশপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। এইটে উটকো ঝামেলা। বিদেশী নাগরিক মারা গেলে অনেক নিয়মকানুন মানতে হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় আমাকে বিপাকে ফেলেছেন।" জলপাইগুড়ি থানার দারোগা সহদেব বকসিকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

"সত্যেন্দ্রনাথ রায়! ভদ্রলোকের সম্পর্কে আর কিছু জানা গিয়েছে?"

"এখনও জিনিসপত্র ভাল করে পরীক্ষা করিনি। পাশপোর্ট পেয়ে অথরিটিকে জানিয়ে এখন আদেশের অপেক্ষায় বসে আছি।" এইসময় আর একটা কেস এসে যেতে সহদেব তৎপর হলেন।

অর্জুন একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করল, "সহদেবদা, আমি ওঁর জিনিসপত্র দেখতে পারি?"

"কোনও লাভ হবে না। তুমি ভাবছ মার্ডার কেস। মোটেই না। হাত না বেঁধে শিরা কাটা যায় না। দ্যাখো, যদিও অফিসিয়ালি আমি তোমাকে দেখাচ্ছি না," সহদেব একজন সেপাইকে ডেকে হুকুম জানালে সে অর্জুনকে নিয়ে গেল মালখানায়।

স্যুটকেসটা দেখলেই বোঝা যায় বিদেশী। জামা-প্যান্টও তাই। ভদ্রলোকের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব ভাল। পাশপোর্টটাকে পেল না সে। কোনও টাকা-পয়সাও নেই। অথচ বিদেশী মানুষ নিশ্চয়ই খালি হাতে এখানে আসবেন না। একটা ডায়েরি দেখল, ভদ্রলোক তাতে বিশদ লেখেননি। ঠিক দশ দিন আগে তিনি প্যান অ্যাম এয়ারকোম্পানির মাধ্যমে দিল্লিতে নেমেছিলেন। দিল্লি থেকে কাঠমাণ্ডুতে এসেছিলেন চব্বিশ দিন আগে। অমল সোমের ঠিকানা লেখা পাশে ব্র্যাকেটে বিষ্ণুচরণ পত্রনবীশ লেখা। এইটে পড়ে সোজা হয়ে বসল অর্জুন। বিষ্টুসাহেবের কথা জানবেন কী করে সত্যেন্দ্রনাথ? উনি কি এখানে আসার আগে কালিম্পং-এ গিয়েছিলেন? অমলদার ঠিকানার নীচে

লেখা আছে, ভারতীয় গোয়েন্দাদের সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, এই লোকটির সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। ডায়েরির শেষ পাতায় কয়েকটা নম্বর লেখা। কী মনে হতে অর্জুন একটা কাগজে নম্বরগুলো লিখে নিল। A2501/ C/Q/B, A8972/ C/Q/B, A11121 /C/M.1 এগুলো কিসের নম্বর বুঝতে পারল না সে। ডায়েরিটা রেখে দিয়ে অন্য জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে দেখে যখন হতাশ হচ্ছিল, তখন স্যুটের ভেতরের পকেটে একটা কার্ড পেল সে। কার্ডে সত্যেন্দ্রপ্রসাদের নাম-ঠিকানা লেখা। নিউইয়র্কের কুইন্সে থাকতেন ভদ্রলোক। কার্ডের পেছন দিকটায় চোখ বোলাতে গিয়ে সে শক্ত হল। পরিষ্কার ইংরেজিতে লিখে রেখেছেন ভদ্রলোক, 'ভারতবর্ষে যাচ্ছি। যে কোনওদিন আমি খুন হতে পারি। জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পালন করবই। যদি আমার মৃত্যু হয় তা হলে এই কার্ড যিনি পাবেন তিনি অবিলম্বে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে বাধিত হব।' কার্ডটা রাখতে গিয়েও মন পালটাল সে। এই ঘরে এখন কেউ নেই। হয়তো অন্যায়, কিন্তু সে নিজের পকেটে ওটাকে চালান করে দিল।

তখনই তার বিশ্বাস হল সত্যেন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করেননি। জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স কোম্পানির হয়ে কোনও কাজ করতে তিনি এসেছিলেন এখানে। তিনি নিজের মৃত্যুর আশঙ্কা আছে জানতেন, তিনি আত্মহত্যা করবেন কেন? তা ছাড়া সে যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন দরজা ভেজানো ছিল। এমনকী বাথরুমের দরজাটাও ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না। এইভাবে সব খুলে রেখেই কেউ আত্মহত্যা করে নাকি। সত্যেন্দ্রনাথ যখন অমলদার বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে মোটেই নার্ভাস দেখাচ্ছিল না। বরং লোকটাকে মেজাজি দাম্ভিক বললে ঠিক বলা হয়, মনে হয়েছিল। আত্মহত্যা করতে চাইবার আগে কেউ

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট

ব্রিটানিয়া

মুরগির অর্ডার দেয় কি ? অর্জুন খুব নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। কিন্তু একথাও ঠিক, দুটো হাত বেঁধে তবেই শিরা কাটা যায়। যার হাত বাঁধা হবে, সে বাধা দেবে না ? প্রাণের জন্যে লড়াই করবে না ? তা হলে তো তার চিহ্ন সত্যেন্দ্রনাথের শরীরে থাকত !

ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না অর্জুন। এইসময় তার সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হল। যদিও সে বাইরে বয়স্ক মানুষের সামনে কখনও সিগারেট খায় না। সহদেবদা মনে হয় এঘরে এখনই ঢুকবেন না। সে সিগারেট বের করে দেশলাই বের করতে গিয়ে লাইটারটার স্পর্শ পেল। জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স, এই কোম্পানির দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসে সত্যেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। সে প্রথম বোতামটা টিপে অদৃশ্য আগুনে সিগারেট ধরাতে গিয়েই চমকে উঠল। যদি এর দ্বিতীয় বোতামটা সুধাময় সান্যালের জ্ঞান অনুযায়ী সক্রিয় হত তা হলে অদৃশ্য রে দশফুট পর্যন্ত ছুটে গিয়ে হাতিকেও অবশ করে দিতে পারত। মানুষ তো অজ্ঞান হতই। আর একটা জ্ঞানহীন মানুষের হাতের শিরা কেটে দেওয়া শিশুর পক্ষেও সহজ।

তার মানে জলপাইগুড়ি শহরে জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটার এসেছে। খুনি সেটাই ব্যবহার করেছে ? সত্যেন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই সে ভদ্রভাবে দেখাতে গিয়েছিল লাইটারটা। সত্যেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ওটা জাল। তাই কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবেননি। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে আততায়ী সরাসরি দ্বিতীয় বোতাম টিপে সত্যেন্দ্রনাথকে অজ্ঞান করে বাথরুমে টেনে নিয়ে গিয়ে হাতের শিরা কেটেছেন। ওই ব্লেড সত্যেন্দ্রনাথই ব্যবহার করেন। তাঁর দাড়ি কামাবার কিট্‌সে ওই ব্লেড আরও আছে।

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল অর্জুন। এই মৃত্যু-রহস্য সে এত দ্রুত সমাধান করবে ভাবতে পারেনি। আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছিল। অমলদা শহরে থাকলে শাবাশ দিতে বাধ্য হতেন। এখন তো সব ব্যাপার জলের মতো পরিষ্কার। কে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে লাইটার দেখাতে যেতে পারে ? কাল সুধাময় সান্যালের কাছে গিয়ে সে পরিচয় জেনে এসেছে। সহদেবদাকে এখনও লাইটারের কথা বলা হয়নি। ওকে অ্যারেস্ট করানোর পর সে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলবে। সে আরও চমকিত হল। হরিপ্রসাদ কি সত্যেন্দ্রনাথের আত্মীয় ? দু'জনের উপাধি তো এক। হরিপ্রসাদ গতকাল সুধাময় সান্যালের কাছে গিয়েছিল লাইটার পরীক্ষা করাতে। জাল জিনিসটা সরিয়ে রেখে সে আসল জিনিস নিয়ে গিয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। পরিচিত মানুষ দেখে তিনি ঘরে বসাতে আপত্তি করেননি। আর সেই সুযোগে কাজ হাসিল করেছে হরিপ্রসাদ। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। হরিপ্রসাদ কেন সুধাময় সান্যালের কাছে যাবে লাইটার দেখাতে ? একজন সাক্ষী কেউ রেখে দেয় ? তা ছাড়া লাইটারটার বিশেষত্ব তার অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যখন খুন হয়েছেন তখন হরিপ্রসাদ তার বাড়িতে ছিল না। এটা তো সে নিজের চোখেই দেখে এসেছে।

গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন সহদেবদা। অর্জুন কারণ জিজ্ঞেস করল। সহদেবদা বললেন, "একটু আগে এস· পি· সাহেব ফোনে জানিয়েছেন যে, সত্যেন্দ্রনাথের বডি যেন ডিফর্মড না হয় তার ব্যবস্থা করতে। কলকাতায় আমেরিকান দূতাবাসে পাঠাতে হবে বরফের বাক্সে ভরে। এ-শহরে ওসব জিনিস যে পাওয়া যায় না তা কি এস· পি· জানেন না ?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি সত্যেন্দ্রনাথের খুনিকে ধরতে চান ?"

"খুনি ! কী আজেবাজে বকছ ? ওই ঘরে সত্যেন্দ্রনাথ যাওয়ার পর তুমি ছাড়া কেউ ঢোকেনি," সহদেবদা হাসলেন, "কাউকে অ্যারেস্ট করতে হলে তোমাকেই তো করতে হয়। মাথা থেকে ভূত তাড়াও। সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে কেউ খুন করেনি। অমলবাবুর সঙ্গে থাকতে থাকতে তুমি সব্ ব্যাপারেই রহস্যের গন্ধ পাও।" ওঁর কথা শেষ হওয়ামাত্র টেলিফোন বাজল।

রিসিভারটা কানে লাগিয়ে কথা বলতে-বলতে একটু উত্তেজিত হলেন সহদেব বকসি। তারপর "ঠিক আছে, আসছি," বলে ওটাকে রেখে দিয়ে বললেন, "একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারব না। লোকটা আর অ্যাকসিডেন্ট করার সময় পেল না।"

"অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে ?" অর্জুন কৌতূহলী হল।

"হ্যাঁ। ঠিক কদমতলার মোড়ে। গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন ভদ্রলোক। বোধহয় ব্রেক ফেল করায় রাস্তার পাশে একটা দেওয়ালে সরাসরি ধাক্কা মারেন। বলছে তো স্পট ডেড।" সহদেব বকসি যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। অর্জুনের মন-খারাপ হল। কেন যে ড্রাইভাররা একটু ধীরেসুস্থে গাড়ি চালায় না ! কোন্ গরিব মানুষের সংসার গেল কে জানে ! সে জিজ্ঞেস করল, "সত্যেন্দ্রনাথের খবর নিতে আর কেউ আসেনি, না ?"

"না," সহদেব বকসি বেরিয়ে এসে জিপ আনতে হুকুম দিলেন, "মিস্টার রায় হয়তো এতক্ষণে স্পটে আমাকে না দেখে এস· পি·-কে কমপ্লেন করে ফেলেছেন। এই একটা শহর, যা বড়লোকদের শাসনে চলে। তুমি কোন্ দিকে যাবে ?"

"মিস্টার রায় মানে ?"

"শিল্পসমিতিপাড়ায় রায়বাড়ির কর্তা। তাঁরই ছোট ছেলে তো ওই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।"

"ছোট ছেলে ?" অর্জুন উত্তেজিত হয়ে উঠল, "হরিপ্রসাদ রায় অ্যাকসিডেন্ট করেছে ?"

জিপ এসে গিয়েছিল। সহদেব বকসি তাতে উঠে বসতেই অর্জুন ছুটে গেল, "আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি ?"

একটু বিস্মিত সহদেব বকসি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললেন। অর্জুন জিপে উঠে পড়ল। গোটাচারেক সেপাই রয়েছে পেছনে। অর্জুন তখনও বুঝতে পারছিল না, "আপনি ঠিক শুনেছেন ? হরিপ্রসাদ রায় অ্যাকসিডেন্ট করেছে ?"

"নামটা শুনিনি। রায়বাড়ির ছোট ছেলে বলল। সিরিয়াস হেড-ইনজুরি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। রায়বাড়ির অনেক মানুষ। হরিপ্রসাদ জলপাইগুড়ি শহরে কেন দুর্ঘটনা ঘটাতে যাবে। সত্যেন্দ্রনাথের খুনি এত সহজে··· বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করছিল না। যেতে যেতে অনেকবার সহদেব বকসিকে লাইটারটার কথা বলতে গিয়েও সামলে নিল সে। দেখা যাক, আর একটু অপেক্ষা করলে ক্ষতি কী !

থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা সোজা। যদিও দু'পাশে প্রচুর দোকানপাট, সিনেমা হলের ভিড়, কিন্তু পুলিশের ড্রাইভার জানে কী করে গাড়ি চালাতে হয়। কদমতলার কাছে পৌঁছে দেখল বেশ ভিড় সেখানে। পুলিশ লেগে গেল কাজে। সহদেব বকসির সঙ্গে অর্জুনও পৌঁছে গেল গাড়িটার কাছে। যে গাড়িকে দেখবে বলে অর্জুন তৈরি ছিল এটা সেটা নয়। গত বিকেলে দেখা সত্যেন্দ্রনাথের ধুলোয় মাখা গাড়ির বদলে একটা সাদা ফিয়াট দুমড়ে পড়ে আছে। ড্রাইভারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। সহদেব বকসি প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ নিচ্ছিলেন। গাড়িটা আসছিল একটু বেশি গতিতেই। পাশের মিষ্টির দোকানের মালিক বললেন, "ভদ্রলোক ঠিকই চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলাম ওঁর হাত স্টিয়ারিং থেকে পড়ে গেল। মাথাটা একদিকে হেলে পড়ল। ব্যস, দড়াম করে গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে আছড়ে পড়ল ওখানে।"

এক ডাক্তারবাবু সাইকেলে যাচ্ছিলেন সেই সময়। তিনি বললেন,

স্পষ্ট দেখলাম,, হার্ট অ্যাটাক কেস। অ্যাকসিডেন্ট হবার আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর মাথাটা স্ম্যাশড হয়েছে। স্পট ডেড।" কথাবার্তা বলে বোঝা গেল ভদ্রলোকের হৃদযন্ত্র বন্ধ হবার কারণেই ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আর কেউ আহত হয়নি।

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। তার মাথাটা এখন খালি। কিছুই চিন্তা করতে পারছিল না সে। রায়বাড়ির ছোট ছেলে হরিপ্রসাদ রায় মারা গিয়েছেন এ-কথা জানার পর সে কোনও নতুন কিছু ভাবতে পারছিল না।

সহদেব বকসি থানায় না ফিরে হাসপাতালে ছুটলেন। অর্জুন তাঁর সঙ্গ নিল। সেখানে তখন হৃদয়বিদারক দৃশ্য। রায়বাড়ির কর্তা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁকে ঘিরে সেবা করছে কয়েকজন আত্মীয়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকেই। খবর পেয়ে আসছেন শহরের গণ্যমান্যরা। সহদেব বকসির কাছ থেকে সরে এল সে। হরিপ্রসাদ রায় সত্যিই জীবিত নেই। ঠিক সেই সময় তার পাশে এক ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে। ফরসা, লম্বা মধ্যবয়স্ক মানুষটি গম্ভীর, উদভ্রান্ত কিন্তু শোকের উগ্র প্রকাশ নেই। চেহারায় বোঝা যাচ্ছে ইনি রায়বাড়ির একজন। অর্জুনের মনে হল, এঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। সে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "এটা কি হার্ট অ্যাটাক থেকে হল?"

ভদ্রলোক মুখ ফেরালেন। ওঁর চোখে যেন পরিচিত ভঙ্গি ফুটল। তারপর ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন, "ডাক্তাররা বলতে পারবেন কখন কার হার্ট অ্যাটাক হয়, আমি কখনও ওর বুকের দোষ আছে বলে জানতাম না। কী করে যে এমন হল! ওর হার্ট তো ভালই ছিল।"

"উনি কি ড্রিঙ্ক করতেন?"

"না, না। নেভার। আমেরিকায় থেকেও মদ ছোঁয়নি। আমি মাঝে-মাঝে খাই বলে রাগ করত। মদ সিগারেট কিছুই খেত না।" ভদ্রলোক চোখের জল মুছলেন।

"উনি আপনার কে হন?"

"হরি আমার ছোট ভাই।"

"ও। আমার নাম অর্জুন। সত্যসন্ধানী অমল সোমের সহকারী।"

"আপনাকে চিনতে পেরেছি ভাই।"

"কিন্তু আপনি বোধহয় সত্যি খবর জানেন না। হরিপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল। তখন ওর কাছে আমি একটা লাইটার দেখেছিলাম। সিগারেট না খেলে কেউ লাইটার রাখে?"

"ও হো। সেটা একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। এবার যখন ও কলকাতা থেকে এখানে আসে তখন ওর এক প্যাসেঞ্জারের লাগেজ নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে বেশি হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক ওকে অনুরোধ করেন একটা তিন কেজির প্যাকেট যদি হরি ক্যারি করে। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের নিয়ম ভাঙতে চায়নি হরি। কিন্তু কখনও কখনও অনুরোধ এড়ানো সম্ভব হয় না। বাগডোগরায় গেলে সেই ভদ্রলোক প্যাকেট ফিরিয়ে নিয়ে খুব ধন্যবাদ দিয়ে ওই লাইটারটা উপহার দিয়েছিলেন ওকে। বলেছিলেন, 'এ জিনিস ভারতবর্ষে আসেনি।' একই ট্রান্সপোর্টে ওরা শিলিগুড়িতে আসে। কিন্তু দুঃখের কথা, সেই ভদ্রলোকের কিছু মালপত্র ওর মধ্যেই খোয়া যায়। হরি লাইটারটা আমাকে দেখায়। আমরা কিছুতেই খুলতে বা জ্বালাতে পারছিলাম না। আজ মনে পড়ল সুধাময় সান্যালের কথা। হরি ওঁর কাছে গিয়ে সব জেনে এল। তারপর অবশ্য ওর সঙ্গে আমার আর কথা হয়নি। কিন্তু লাইটার ছিল বলেই প্রমাণ হয় না সে সিগারেট খেত।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। কিন্তু সে হাসপাতাল ছেড়ে গেল না। এই শহরে দুটো জাল লাইটার এসেছে। প্রথমটি তার পকেটে, দ্বিতীয়টি হরিপ্রসাদ রায়ের কাছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না জানলে অবশ্য কিছুই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এমনও তো হতে পারে হরিপ্রসাদের হার্ট অ্যাটাকই হয়নি। সে সহদেব বকসির কাছে পৌঁছে দেখল তিনি রায়-পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলছেন। এর মধ্যে ডাক্তার এসে রায়কর্তার চিকিৎসা শুরু করেছেন। একটু সুযোগ পেয়ে সে সহদেব বকসিকে জানাল, "পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আজ পাওয়া যাবে?"

"কেন?" স্পষ্টত বিরক্ত হলেন তিনি।

"আমি একটু আগ্রহী।"

"দ্যাখো অর্জুন, তোমাকে আমি স্নেহ করি। কিন্তু সব কিছুর একটা লিমিট আছে। দেখছ এটা দুর্ঘটনা, দিনের আলোয় সকলের সামনে ঘটেছে, আর তুমি তার মধ্যে রহস্য খুঁজছ।"

"আমি দুঃখিত সহদেবদা, তবু আপনি ওটা পেলে আমাকে বলবেন। ওঁর কাছে কী কী পাওয়া গেছে জানতে পেরেছেন?" অর্জুন শান্ত গলায় প্রশ্ন করল।

"একজন সাধারণ মানুষের কাছে যা পাওয়া যায়। আলমারির চাবি, মানিব্যাগ, চিরুনি। কোনও রহস্যজনক কাগজপত্র পাইনি। স্যাটিসফাইড?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "লাইটার?"

"লাইটার! এত জিনিস থাকতে লাইটারের কথা বললে কেন?"

"না, মানে উনি সিগারেট খান কি না জানতে চাইছি।"

"ও, সিগারেট খেলে হার্ট অ্যাটাক হবে, তাই! সত্যি, কল্পনার দৌড় বটে! না, কোনও লাইটার সিগারেট পাওয়া যায়নি ওর কাছে।"

ধীরে-ধীরে অর্জুন বেরিয়ে আসছিল হাসপাতাল থেকে। হরিপ্রসাদ লাইটারটা কী বাড়িতে রেখে বেরিয়েছিল! সেটাই স্বাভাবিক। যে সিগারেট খায় না, সে ওটা সঙ্গে নিয়ে যাবে কেন? এখনই যদি সে রায়বাড়িতে যায় তা হলে একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে।

এই সময় কাটা-গদাইকে দেখতে পেল অর্জুন। হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, এখানে কী উদ্দেশ্যে?"

"তোমাকে ফলো করে এখানে এলাম।"

"সে কী? কী ব্যাপার?" অর্জুনের মনে পড়ল গতকাল সিনেমা দেখে বেরোবার সময় কাটা-গদাই তাকে বলেছিল একটা জরুরি কথা আছে। কাটা-গদাই এপাশ-ওপাশ তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "রায়বাবুর ছেলে ছবি হয়ে গেছে, না?"

হেসে ফেলল অর্জুন। তারপর গম্ভীর হল আবার, "হ্যাঁ, উনি মারা গিয়েছেন।"

"এইটে ওর পকেটে ছিল।" কাটা-গদাই নিজের পকেট থেকে একটা নীল লাইটার বের করে অর্জুনের হাতে দিল। অর্জুন দ্রুত সেটার পেছনে তাকাল, জোন্স অ্যান্ড জোন্স। খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সে, "তুমি পেলে কোত্থেকে?"

মাথা নাড়ল কাটা-গদাই, "পুলিশকে যদি না বলো তা হলে বলতে পারি।"

"ঠিক আছে বলো।"

"আমার এক শিষ্য বডিটা গাড়ি থেকে টেনে বের করার সময় নিয়েছে। আমি জানতে পেরে বললাম, খুব অন্যায় করেছিস। ফেরত দিতে এসেছিলাম। এখন কী হবে?"

অর্জুন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেটাকে দেখে লুকনো নব্ টিপে আনলক করল। তারপর প্রথম বোতামটা টিপতেই অদৃশ্য ফ্লেম বের হল। সিগারেট ছিল না। একটা কাগজ গর্তের মুখটায় ধরতেই সেটা জ্বলে উঠল। এবার দ্বিতীয় বোতামটা? যদিও সে সুধাময় সান্যালের কাছে দেখেছে হরিপ্রসাদের এই লাইটারটা জাল তবু ঝুঁকি নিল না। হাতের

কাছে একটা কুকুর দাঁড়িয়ে ছিল, সেটার দিকে লক্ষ করে দ্বিতীয় বোতামটা টিপতেই সে ছুটে পালাল।

হতাশ হয়ে অর্জুন বলল, "এটা আমি নিচ্ছি। রায়বাবুদের ফিরিয়ে দেব। এসব আমেরিকান জিনিস। এদেশে কারও কাছে দেখতে পাবে না।"

হাসল কাটা-গদাই, "না অর্জুনভাই, আজকাল তামাম দুনিয়া নেপাল হয়ে এখানে চলে আসে। সেদিন, হ্যাঁ কালকেই, সন্ধেবেলায় রূপমায়ার সামনে একজন কায়দা করে সিগারেট ধরাল। লাইটার টিপল, আলো জ্বলল না, কিন্তু সিগারেট ধরে গেল।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল অর্জুন, "লোকটি কে? হরিপ্রসাদ রায়?"

"না, না। বাঙালি নয় লোকটা। লাল দাড়ি আছে।"

অর্জুনের সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল যেন। লাল দাড়িওয়ালা লোক। যার কাছে এইরকম একটা লাইটার আছে। কে বলতে পারে সেই লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম টিপলে রে বের হয় কি না। তার মানে এই শহরে তিনটে লাইটার এখন। যার দুটো জাল, একটা ঠিক।

সে কাটা-গদাইকে জিজ্ঞেস করল, "লোকটাকে আবার দেখলে চিনতে পারবে?"

একটু ভাবল কাটা-গদাই। তারপর বলল, "হ্যাঁ। চিনে নেব। কিন্তু তোমাকে অন্য কথা বলছিলাম। কেসটা খারাপ।"

"কী কেস?" অন্য কিছু শুনতে এখন মোটেই ইচ্ছে করছিল না অর্জুনের।

"পোড়ার পাখা উঠেছে। ও এবার মরবে, তুমি বাঁচাও ওকে।"

"কেন? ও কী করছে?"

"পাজিটা এবার স্মাগলিং-এ নেমেছে। আমার সঙ্গে দুশমনি থাকলেও ছেলেবেলার বন্ধু তো! তাই খারাপ লাগে। এতদিন রূপশ্রী হলে ব্ল্যাক করছিল, সে ঠিক আছে। কিন্তু এখন বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যায়। টানা মাল নিয়ে বাজারে বিক্রি করে।"

"কিন্তু পোড়া-গদাই আমার কথা শুনবে কেন?"

"শুনবে। তোমার দাদাকে আমরা ভয় পাই। তুমি তো তারই শিষ্য।"

হঠাৎ অর্জুনের মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, "পোড়া-গদাইকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?"

"ওর বাড়িতে। সেনপাড়ায়। যাবে তুমি?"

"যাব। আমাকে দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে তুমি চলে যেও।"

"হ্যাঁ। আমি পোড়ার বাড়িতে যাই না। পাজিটা বহুত বদমাস। নেহাত ছেলেবেলার বন্ধু, তাই!"

॥ পাঁচ ॥

দূর থেকে পোড়া-গদাইয়ের বাড়িটা দেখিয়ে নেমে পড়ল কাটা-গদাই রিকশা থেকে। যাওয়ার সময় বলল, "পোড়া যদি তোমায় বেইজ্জত করে তা হলে আমায় বলবে। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।"

অর্জুন আপত্তি করল, "না, না, তোমাকে দাঁড়াতে হবে না। আমারটা আমি বুঝব।"

টিনের চালা আর কাঠের দেওয়ালে তোলা দু'খানা ঘর হল পোড়া-গদাইয়ের বাড়ি। একটা বাচ্চা ছেলে সামনে বসে ছিল। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "গদাইবাবু বাড়িতে আছে?"

ছেলেটা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ। এবং, তখনই ভেতর থেকে ফ্যাঁসফেসে গলায় চিৎকার ভেসে এল, "কে, কে ডাকে?"

গলা তুলে অর্জুন নিজের পরিচয় জানাতেই একটা খালি গায়ে

আমাদের কোচ বলেছেন
দম বাড়াবার জন্য পুষ্টি দরকার।
দুধ, মল্টেড বার্লি-এইসব।
তাই উনি রোজ প্র্যাকটিসের আগে
নিজের হাতে আমাদের
হরলিক্স খাওয়ান।
হরলিক্স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণ ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।
Horlicks
The Great Nourisher
নতুন যুগের নতুন রূপে
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়
HMM-9044BEN(R)

লুঙ্গি পরা লোক বেরিয়ে এল। লোকটার মুখের একটা দিক বীভৎসভাবে পুড়ে গেছে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। পোড়া-গদাই অর্জুনকে দেখে অবাক হল। বোঝা যাচ্ছে সে ওকে চিনতে পেরেছে। অর্জুন হাসল, "তোমার সঙ্গে আমার একটু জরুরি কথা আছে গদাই।"

পোড়া-গদাই চারপাশ তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি একা?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"কী ব্যাপার বলুন তো?"

অর্জুন বলল, "ব্যাপারটা তোমার জন্যেই। কিন্তু এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো কথা বলার সুযোগ হবে না। আমি একটু ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই।"

"আপনি কী বলবেন আমি বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, আপনি ভেতরে আসুন। ঘরে বসে কথা বলতে পারি।" পোড়া-গদাই ওকে রাস্তা দেখিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। ঘরে একটি বউ বসে কাজ করছিল। নতুন লোককে দেখে ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেল বাইরে। অর্জুন দেখল একটা তক্তাপোশের ওপর ময়লা বিছানা। পাশের নড়বড়ে চেয়ারে বসল সে।

পোড়া-গদাই খাটে বসে বলল, "গরিবের বাড়িতে এলেন, কী ব্যাপার?"

অর্জুন বলল, "আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তুমি আমাকে তুমি বলতে পারো। যদি অবশ্য তুমি চাও তা হলে আমি আপনি বলতে পারি। আমার আপনিই বলা উচিত!"

"না, না, যা আছে তাই থাক। 'তুমি' শুনতেই ভাল লাগবে।"

"দ্যাখো গদাই, আমি তোমার সম্পর্কে কিছু-কিছু কথা জানি। তোমাকে যা বলব তা কেউ জানে না, তুমি যা বলবে তাও কেউ জানবে না। পুলিশ তো নয়ই, যদি তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো। এখন বলো তো, গত দু'দিনে তোমার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেছিল?" অর্জুন সরাসরি চোখের দিকে তাকাল। মুহূর্তে পোড়া-গদাই চোখ নামাল, তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "অনেক লোকই রোজ নানান ধান্দায় দেখা করে। আপনি কার কথা বলছেন যদি না জানি!"

অর্জুন বলল, "তোমার অচেনা লোক। জলপাইগুড়িতে থাকে না। কখনও দ্যাখোনি তাকে তুমি।"

পোড়া-গদাইয়ের চোয়াল শক্ত হল, "আপনি কী করে জানলেন?"

অর্জুন বুঝতে পারল সে ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছে। কিন্তু খুব সাবধানে জাল গোটাতে হবে। সে বলল, "দ্যাখো গদাই, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তুমি এমনিতেই আইনের চোখে অপরাধ করেছ। এখনও অবশ্য পথ খোলা আছে। ভেবে দ্যাখো।"

"ঠিক আছে। আপনি কতটা জানেন তা আরও বলুন। এসব তো ধোঁয়া-ধোঁয়া কথা।"

আচমকা ঢিল ছুঁড়ল অর্জুন, "সেদিন তুমি এয়ারলাইনসের গাড়ি থেকে একটা ব্যাগ সরিয়েছ?"

হকচকিয়ে গেল পোড়া-গদাই, "কী যা-তা বলছ? আমি ওখানে যাব কেন?"

"তুমি শিলিগুড়িতে যাও না?"

এবার মাথা নিচু করল পোড়া-গদাই। কিন্তু কোনও জবাব দিল না। অর্জুন আবার জিজ্ঞেস করল, "কথা বলছ না কেন? সিনক্লেয়ার হোটেলে যখন গাড়িটা পৌঁছল তখন একটা ব্যাগ পাওয়া যায়নি। তাই তো?" পোড়া-গদাই এবারও কথা বলল না। অর্জুন ওঠবার ভঙ্গি করল, "তুমি যখন জবাব দিচ্ছ না, তখন আমার কিছু করার নেই। সহদেব বকসি এবার আসবে তোমার কাছে।"

"না," প্রায় চিৎকার করে উঠল পোড়া-গদাই, "আপনি পুলিশকে কিছু বলবেন না, পায়ে পড়ি।"

"কেন?"

"ছেলে-বউ না খেয়ে মরবে।" প্রায় ককিয়ে উঠল পোড়া-গদাই।

"যখন অন্যায় করো তখন মনে থাকে না কথাটা?"

"বিশ্বাস করুন, লোভে পড়ে করেছি। বাজে ছবি এলে কে ব্ল্যাকে টিকিট নেবে বলুন। এখন কাটাটার খুব বাজার যাচ্ছে। ফি সপ্তাহে হিট ছবি আসে রূপমায়াতে। রূপশ্রীতে যত বদ্দি সিনেমা। তাই একজন লোভ দেখিয়েছিল বলে দুদিন গিয়েছিলাম।"

"ব্যাগের ভেতর কী ছিল?"

"কোনও লাভ হয়নি ব্যাগ এনে। তিনটে বাক্স ছিল। চল্লিশটা করে লাইটারের মতো দেখতে অথচ লাইটার নয় এমন জিনিস। কোনও মুখ নেই। বাজারে বিক্রি করতে চাইলে কেউ কিনবে না।"

এত দ্রুত সাফল্য আসবে অর্জুন ভাবতে পারেনি। তিন বাক্স লাইটার। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর হতেই হবে ওগুলো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আসল না জাল। যে লোকটা হরিপ্রসাদ রায়কে জাল লাইটার দিয়েছে, সে নিশ্চয়ই অত অসতর্কভাবে আসল লাইটার তিনটে বাক্সে আনবে না। কিন্তু জলপাইগুড়ির রাস্তায় আর একটি লোককে সেই লাইটারে সিগারেট ধরাতে দেখা গিয়েছে। ওই লোকটিই কি হরিপ্রসাদের সঙ্গে এক ফ্লাইটে এসেছে এই বাক্সগুলো নিয়ে! অর্জুন বাক্সগুলো দেখতে চাইল। খানিকটা ইতস্তত করে পোড়া-গদাই একটা ব্যাগ নামিয়ে আনল মাথার ওপরের একটা আধা সিলিং থেকে। তিনটে বাক্স ছিল ব্যাগটায়। তিনটেই খোলা হয়েছে। এবং কয়েক ডজন নীলাভ লাইটার পড়ে আছে তাতে। একটা তুলে নিয়ে সে পকেটে পুরল। পোড়া-গদাইয়ের সামনে খোলার কায়দাটা দেখিয়ে দিলে এগুলোকে আর পাওয়া অসম্ভব হবে। সে বলল, "তুমি এখনই এই বাক্সটা নিয়ে থানায় চলে যাও। সহদেব বকসি যদি ফিরে আসেন, তা হলে তাঁকে বলবে আমি পাঠিয়ে দিলাম, উনি যেন যত্ন করে রেখে দেন।"

পোড়া-গদাই দ্রুত মাথা নাড়ল, "না, না, আমাকে থানায় পাঠাবেন না। দারোগাবাবু বলেছেন যেন কখনও আমার মুখ দর্শন করতে না হয় ওঁকে। লোকটাকে আমার খুব ভয় লাগে।"

অর্জুন বুঝল কথাটা মিথ্যে নয়। সে পোড়া-গদাইকে বলল, "দ্যাখো, আমি এটা ঠিক করছি না। তোমাকে এক্ষুনি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত, ব্যাগ চুরি করার অপরাধে। কিন্তু তোমার বন্ধু কাটা-গদাইয়ের অনুরোধে একটা সুযোগ দিতে চাই। তুমি আর জলপাইগুড়ি শহরের বাইরে গিয়ে এইসব কাজ করবে না। হয়তো কত নিরীহ মানুষ তোমাদের হাতে এইভাবে সর্বস্ব হারায়। তুমি শহরের মধ্যে খেটে রোজগার করতে পারো না ভাল পথে? ওই বাচ্চাটা বড় হয়ে তোমাকে চোর বলবে সেটা ভাল লাগবে? তোমরা সিনেমা হলের টিকিটের ব্যবসা ছেড়ে দাও। দেখছ তো, ওতে প্রত্যেক সপ্তাহে আয় হয় না। তার চেয়ে বাজারে আলু-বেগুন নিয়ে বসলে অনেক বেশি লাভ। যাক, এই বাক্সগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি থানায়, তুমি কাটা-গদাইয়ের জন্যে এ-যাত্রায় রক্ষে পেলে, মনে থাকে যেন।" কথাগুলো একটানা বলে অর্জুন ব্যাগটা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এল।

পেছন-পেছন পোড়া-গদাই আসছিল। সে এবার কেমনগলায় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, সত্যি কাটার জন্যে আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেন? কাটা আমাকে ছাড়তে বলেছে?"

"হ্যাঁ। ও তোমাকে এখনও ভালবাসে। ও চায় তোমার ভাল হোক।"

"কিন্তু ব্ল্যাক নিয়ে ও হুজ্জুতি করে কেন ?"

"টিকিটের ব্ল্যাক করা বন্ধ হলে আর ওটা করবে না।" অর্জুন কথাগুলো বলে ভাবল ওকে সঙ্গে আসতে নিষেধ করবে। কাটা-গদাই নিশ্চয়ই এখনও অপেক্ষা করছে। কিন্তু তারপরেই ভাবল, দেখা যাক দু'জনে মুখোমুখি হয়ে কী করে !

কাটা-গদাই দাঁড়িয়ে ছিল একটা গাছের নীচে। ওদের আসতে দেখে ওর চোখ যেন কপালে উঠেছিল। তাকে ওখানে দেখতে পাবে ভাবতেও পারেনি পোড়া-গদাই। সে যেন কেমন মিইয়ে গেল।

অর্জুন কাটা-গদাইকে বলল, "তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই। এই ব্যাগটাকে থানায় দারোগাবাবুর কাছে আমার নাম করে পৌঁছে দিতে হবে।"

পোড়া-গদাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কাটা-গদাই বলল, "যে এসব এনেছে তাকে বলছেন না কেন ? নিজের পাপের নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করুক।"

হঠাৎ পোড়া-গদাইয়ের ভাবান্তর দেখা গেল, "ঠিকই বলেছে ও। আমাকে দিন, আমিই পৌঁছে দিচ্ছি। দারোগাবাবু যদি মুখ দেখে গরাদে পোরে তো তাই হোক।"

এবার কাটা-গদাই এগিয়ে এসে ব্যাগটা নিজের হাতে নিল, "থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমি চলি। আপনি কোন্ দিকে যাবেন ?"

অর্জুন হাসল, "আমি জেলাস্কুলের পাশ দিয়ে অমলদার বাড়িতে যাব।"

কাটা-গদাই ব্যাগটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলে দেখা গেল পোড়া-গদাই তার সঙ্গী হল। দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছে, কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। রাস্তাটা অনেক লম্বা, অর্জুন বুঝতে পারল, সে একটা ভাল কাজ করেছে। দুরন্তটা শেষ হবার আগে নিশ্চয়ই ওরা আগের মতো কথা বলবে। দু'মাসের জেল নির্ঘাত পাওনা ছিল পোড়া-গদাইয়ের। কিন্তু সেটা ওকে এভাবে শোধরাতে পারত না।

পোড়া-গদাই যে ব্যাগ চুরি করে এনেছিল, তাতে জাল-লাইটার রাখা আছে। পথে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হল অর্জুন। কিন্তু এই জাল-লাইটার নিয়ে এত জায়গা থাকতে আমেরিকা থেকে ডুয়ার্স-এ আসছে কেন লোকগুলো ? ধরা যাক, জাল-লাইটারকে আসল বলে চালিয়ে ভাল ব্যবসা করতে চায় ওরা। কিন্তু আসল লাইটারের খবর যেখানকার মানুষ জানে না সেখানে জালের আর কী দাম উঠবে ? তা ছাড়া নেপালের দৌলতে এসব অঞ্চলে প্রচুর বিদেশী লাইটার সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নকল জিনিস কি বাজার পেতে পারে !

কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার, একটি আসল লাইটার এই শহরে আছে। নকল তিনটে এখন তার কাছে, বাকিগুলো কাটা-গদাই থানায় পৌঁছে দিতে গিয়েছে। তিন-তিনটে লাইটার পকেটে রাখার কোনও যুক্তি নেই। সেই লোকটি এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্জুনের বিশেষ ধারণা, হরিপ্রসাদকে দুর্ঘটনা ঘটাতে বাধ্য করা হয়েছিল। ওই কদমতলার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম টিপে হরিপ্রসাদকে অবশ করে দেওয়া মোটেই কঠিন কাজ নয়। অবশ হয়ে গেলে হাত সরে আসবে স্টিয়ারিং থেকে, পা অকেজো হবে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু উলটোটাও হতে পারত। হরিপ্রসাদের গাড়ি কোনও পথচারীকে চাপা দিতে পারত এবং সে নিজে সামান্য আহত হয়ে বেঁচে যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে হত্যাকারী নিশ্চয়ই একটা ঝুঁকি নিয়েছে। কাউকে চাপা দেওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল এবং তা ঘটলে হয়তো গণ-ধোলাই-এ হরিপ্রদাদের প্রাণ বেরিয়ে যেত। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে রে স্পর্শ করার পাঁচ মিনিট পরে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়তো শরীরে থাকবে না। সত্যেন্দ্রনাথের পোস্টমর্টেমে কিছুই পাওয়া যায়নি। কিন্তু এসবই তার অনুমান। প্রশ্ন হল হরিপ্রসাদকে হত্যা করতে চাইবে কেন আততায়ী। আর সে ওখানে আসছে তাই-বা জানবে কী করে ? এই একই হত্যাকারী কী করে সত্যেন্দ্রনাথের শহরে আসার সংবাদ পেল ? মাথার ভেতরটায় জট পাকাচ্ছিল অর্জুনের।

অমলদার বাড়িতে পৌঁছে অর্জুন হাবুকে চা বানাতে বলল। ডাকে অর্জুনের কোনও চিঠি আসেনি। চিঠিপত্র এলে, সেটা যদি খুব ব্যক্তিগত না হয়, অমলদা নির্দেশ দিয়ে গেছেন, উত্তর দিতে। আজ সে একটা প্যাকেট পেল। হংকং থেকে প্রকাশিত হয় কাগজটা। কাগজটার নাম 'ক্রাইম অ্যাণ্ড প্যাশন'। বিখ্যাত রচনার নামে পত্রিকার নাম। অমলদার কাছে দেশ-বিদেশের অনেক অপরাধ-সংক্রান্ত কাগজ আসে। তাদের মধ্যে ক্রাইম অ্যাণ্ড প্যাশন আর 'ব্রেনওয়েভ' কাগজ দুটোর তুলনা হয় না। প্যাকেট খুলে ক্রাইম অ্যাণ্ড প্যাশন নিয়ে বসে গেল সে। এবং তখনই মনে পড়ল সত্যেন্দ্রনাথের গাড়ি পাওয়া যায়নি। ভদ্রলোক যদি আমেরিকার নাগরিক হন তা হলে এখানে গাড়ি পেলেন কোত্থেকে ? এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেই গাড়িটা গেল কোথায় ? অর্জুন ঠিক করল সমস্ত ব্যাপারটা সে পরপর কাগজে লিখবে। কোনও পয়েন্ট বাদ দেবে না। তারপর বারংবার সেটা পড়লে হয়তো মাথায় ভিন্ন চিন্তা উঁকি দিতে পারে। অমলদা বলেন, 'সবসময় কোনও ঘটনাকে যেমন দেখছ, তেমন ভেবো না। সবরকম সম্ভাব্য পথে ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা কোরো। প্রি-অকুপায়েড হওয়া মানে তুমি সত্য থেকে সরে যাচ্ছ।'

কাগজটার কভার স্টোরি, ব্যাঙ্ককে তিনটে খুন হয়েছে। তিনটে মানুষকে পোস্টমর্টেম করে কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু কোনও বিশেষ যন্ত্র দ্বারা তাদের হৃদযন্ত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হলে শরীরে যেসব লক্ষণ ফুটে ওঠে তার কোনও চিহ্ন নেই। এই তিনজন ব্যাঙ্ককের বিখ্যাত স্মাগলার ছিল। তিনজনই বাড়ির বাইরে মারা গিয়েছে। দু'জন দুটো রেস্তোরাঁতে। একজন মারা গিয়েছে গাড়িতে উঠতে গিয়ে।

খবরটা পড়ে অর্জুনের হাতের তালুতে ঘাম জমল। শুধু হৃদযন্ত্র বন্ধ করে দেবার মতো কোনও অস্ত্র বের হয়েছে নাকি ? শরীরে কোনও আঁচড় থাকল না, সামান্য কালশিটে পর্যন্ত সেই, পোস্টমর্টেমে কিছুই ধরা পড়বে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ মনে করবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। এই জিনিসটা যদি সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটত, তা হলে পুরো ব্যাপারটাই অজানা থেকে যেত তার কাছে। এবং তখনই তার মাথায় আর একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল। যদি জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম সরাসরি কোনও মানুষের হৃদযন্ত্রের দিকে তাক করে টেপা যায় তা হলে··· অর্জুন ঠিক বুঝতে পারছিল না তাতে শুধুই হৃদযন্ত্র অকেজো হয়ে যাবে কি না। পাঁচ মিনিট বাদে পরীক্ষা করলে যখন শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না তখন হৃদযন্ত্র আবার সবল হবে কি না ! তার সামনে পরীক্ষা করার কোনও রাস্তা খোলা নেই। সুধাময় সান্যালের একটা কথা মনে পড়ে গেল, 'ওই রে একটা বড় হাতিকেও পাঁচ মিনিট অবশ করে রাখে।' তা হলে একটা মানুষের হৃদযন্ত্র বন্ধ হবে না কেন ? কিন্তু একথা কি সত্যেন্দ্রনাথের খুনি জানত না ! সে তো স্বচ্ছন্দে দ্বিতীয় বোতামটা ওঁর হৃদযন্ত্র লক্ষ করে টিপতে পারত। নাকি সে আরও বুদ্ধিমান। ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার চেহারা দিতে চেয়েছে হৃদযন্ত্র বন্ধ করে !

পত্রিকাটির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে অর্জুনের চোখ একটা বিজ্ঞাপনে আটকে গেল। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি থেকে বিজ্ঞাপনটা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনটা পড়ল সে।

'আমরা দুঃখিত। গত তিন বছর ধরে আমরা একটা বিশেষ ধরনের

লাইটার তৈরি করছি। এই লাইটার মূলত ফেডারেল বুরো অব ইনভেস্টিগেশন বিভাগের জন্যে হলেও সরকারের অনুমতি পাওয়া সার্টিফিকেট দেখালে অল্প কিছু সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। সরকারি আপত্তিতে আর ওই লাইটার বাজারে ছাড়া হচ্ছে না। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি কোনও অসৎ ব্যবসায়ীর দল হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, নেপাল এবং ভারতবর্ষে ওই লাইটারের নকল মডেল চালু করার চেষ্টা করছে। যদিও তারা আমাদের নির্মিত লাইটারের কর্মক্ষমতার অর্ধেকটা আয়ত্ত করেছে, তবু ইতিমধ্যেই নানান বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যে সব সাধারণ মানুষ বৈধ অনুমতিপত্র দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে ওই লাইটার কিনেছিলেন, সেগুলো ফেরত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাত্র দুটো লাইটারের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। সেই দু'জন মানুষ এখন মৃত। আমরা এই পত্রিকার মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি, জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর তৈরি কোনও লাইটার এখন বাজারে নেই (শুধু ওই দুটি ছাড়া)। কেউ যদি এই কোম্পানির নামাঙ্কিত লাইটার কেনেন, কিংবা সংগ্রহ করেন, তা আইনত দণ্ডনীয় হবে।'

॥ ছয় ॥

ট্যাক্সিটা কখন এসে দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি অর্জুন। বিজ্ঞাপন তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। মাত্র দুটো ভাল লাইটার বাজারে ছাড়া আছে। এফ· বি· আই· নিশ্চয়ই চাইছে না সেগুলো সাধারণ মানুষের হাতে থাক। কিন্তু যারা ওই দুটো রেখেছে তারা কি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পড়ে ? এফ· বি· আই· খুঁজে পায়নি বলেই জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স এই বিজ্ঞাপন ছেপেছে। কিন্তু হঠাৎ ডুয়ার্সের এই অঞ্চলে লাইটারগুলো আসতে যাবে কেন ? অর্জুনের মনে হল, অমলদা থাকলে ব্যাপারটার একটা সুরাহা হয়ে যেত সহজে। দুটো খুন হল, অথচ কে খুনি, তার উদ্দেশ্য কী, তা-ই ধরতে পারল না সে এখন পর্যন্ত।

এই সময় হাবু এসে সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ইশারায় উঠতে বলল। হাবু যা বলে অমলদা তা স্পষ্ট বুঝতে পারেন। অমলদা বলেন, হাবুর ইশারায় রহস্য নেই। যে মন দিয়ে বুঝতে চায় তার কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। অনেক চেষ্টা করেছে অর্জুন। হাবু বোধগ্রস্ত হলেও মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়। এই মুহূর্তে কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারল।

ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই লোকটাকে দেখতে পেল। জিনসের প্যান্ট, চেক জ্যাকেট পরে যে লোকটা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার শুধু গায়ের চামড়াই নয়, ভাবভঙ্গিও বলে দিচ্ছে, বিদেশী। চোখাচোখি হতে লোকটা হাসল। বছর তিরিশের মধ্যে বয়স। বেশ নাদুসনুদুস চেহারা। মাথায় চুল অল্প।

বারান্দা থেকে নেমে অর্জুন বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল কাছে। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা বলল, "হাই ! আমল সোম ইজ দেয়ার ?"

অমলদার নামটার এমন হাল দেখে অর্জুন অনেক কষ্টে হাসি চাপল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, "নো। হি ইজ আউট অব দ্য টাউন।"

এখনও ইংরেজি বলতে গেলে তাকে ভাবতে হয়। আগে তো মনে-মনে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলতে চেষ্টা করত। এখন ঠিকঠাক শব্দ সময়মতো মাথায় আসতে চায় না কিছুতেই। লোকটার হতাশ প্রতিক্রিয়া সহজেই ধরা পড়ল। নিজের মনেই বলল, "মাই গড ! হোয়াট শ্যাল আই ডু নাউ। মে আই আস্ক ইওর গুড নেম প্লিজ ?"

"আমি অর্জুন। অমল সোমের সহকারী হিসেবে কাজ করছি। আপনার নাম জানতে পারি ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি জেমস, জেমস ব্রাউন। রয় আমাকে বলেছিল, যদি তার কিছু হয় আমি যেন মিস্টার সোমের সঙ্গে দেখা করি।"

"কে রয় ?" অর্জুন যাচাই করতে চাইল।

"এস· এন· রায়। উনি কি গতকাল এখানে আসেননি ?"

অর্জুন বলল, "আপনি ভেতরে আসুন।" এই সময় ট্যাক্সিওয়ালা বলল, "আমাকে এবার ছেড়ে দিন সাহেব। অনেকক্ষণ থেকে টাউনে এই ঠিকানা খুঁজতে ঘুরছি। পুরো নাম বলতে পারেন না ইনি। শেষ পর্যন্ত থানায় গিয়ে সব জেনে এলেন। আমাকে এখনই শিলিগুড়িতে ফিরে যেতে হবে।"

অর্জুন ইংরেজিতে জেমস ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আবার শিলিগুড়িতে ফিরে যেতে চাইছেন ? এই ট্যাক্সিওয়ালা দাঁড়াতে চাইছে না।"

জেমস বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমার আজকে এখানেই থাকা দরকার।" কথাটা শেষ করে জেমস পেছনের দরজা খুলে তার লাগেজ নামিয়ে নিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিল। লোকটার মানিব্যাগে প্রচুর টাকা দেখতে পেল অর্জুন। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলে সে জেমসকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। হাবুকে ডেকে দু'কাপ চা করতে বলে আরাম করে বসল সে, জেমসের মুখোমুখি। রহস্যটা বেশ জম্পেশ হচ্ছে। এই প্রথম নিজেকে বেশ স্বনির্ভর সত্যসন্ধানী বলে মনে হচ্ছে তার। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এস· এন· রায়ের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক ? আর আপনি এখানে আসছেনই বা কোত্থেকে ?"

জেমস এতক্ষণ অর্জুনকে দেখছিল। এবার ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমি কী করে বুঝব তুমি মিস্টার সোমের সহকারী ?"

অর্জুন হেসে ফেলল। তারপরেই মনে হল, সত্যি তো, সমস্ত চেনা মানুষের কাছে তার যে পরিচয়টা জানা, তা অচেনা লোকের কাছে অস্পষ্টই তো হবে। কিন্তু কী দিয়ে প্রমাণ করা যায় ? ওপাশের ঘরে একটা অ্যালবামে অমল সোম আর তার ছবি আছে। কিন্তু তা থেকে কী প্রমাণ হয় ? তা ছাড়া এই লোকটা তো অমল সোমকেই চেনে না। সে বলল, "আমি আপনাকে এই মুহূর্তে কোনও প্রমাণ দিতে পারব না। কিন্তু এই শহরের যে-কোনও মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।"

(আগামী সংখ্যায় শেষাংশ)

ছবি : অনুপ রায়

"আমি জানি, দুষ্টু ঐ দাঁতের রাক্ষসগুলোই আমার দাঁতে গর্ত করতে পারে!

মা আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ওগুলোই আসলে জীবাণু '(ব্যাকটিরিয়া)' যা, খাবারের টুকরোর সঙ্গে মিশে একরকম 'অ্যাসিড তৈরী করে', আর তারপর তা 'দাঁতের এনামেলের' ওপর হানা দিয়ে দাঁতে গর্ত তৈরী করে।
তবে আমার বাবা ও ভয় নেই তা জানি।

কারণ আমার দাঁতকে যে আগলে রেখেছে

আমার সুপার ফাইটার!

ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড

ওটাই তো আমাকে দাঁতের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতিয়ে দেয়!

আমার সুপারফাইটারের ফ্লোরাইড-ই তো দাঁতের এনামেল'-কে ভীষণ শক্ত করে দেয়'-তাইতো আর ঐ সব, দারুণ ব্যথা করা গর্তও হতে পারেনা।

আমার কত ভাল মা—ওঁর জন্যেই তো আমি আমার এই স্বাদওয়ালা ফেনাওয়ালা সুপারফাইটারের কথা জানতে পেরেছি।"

একটি আকর্ষণীয় নতুন প্যাকে

ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড
দাঁতের গর্ত প্রতিরোধকারী সুপারফাইটার

কঠিন চ্যালেঞ্জ এভারেস্ট

দীপালি সিংহ

পর্বতারোহণ এখন ক্রিকেট-ফুটবলের মতো না হলেও খেলা হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বে বড়-বড় পাহাড়ের শৃঙ্গে ওঠার রেকর্ডগুলি খেলাধুলোর জগতে পর্বতারোহীদের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বহু দেশে পর্বতারোহণ পেয়েছে সরকারি স্বীকৃতি ও আনুকূল্য। ভারতের লোকেরা সেই প্রাচীনকাল থেকেই ভ্রমণ, ব্যবসা, ধর্মপ্রচার, ধর্মসাধনা প্রভৃতি নানা কারণে পাহাড়ে যাওয়া-আসা করছেন। তবে পর্বতারোহণ বলতে যা বোঝায়, ভারতবর্ষে তা শুরু হয়েছে খুবই সাম্প্রতিক কালে। বিশ্বের নানা দেশে অবশ্য এটি একটি 'স্পোর্ট' বা খেলা হিসেবে প্রচলিত ছিল বহু আগে থেকেই।

অভিযানের দিক থেকে হিমালয় পর্বতমালার আকর্ষণ বিরাট। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে ক্রীড়া হিসেবে পর্বতারোহণ খুব বেশি ছড়িয়ে পড়েনি বা সরকারি স্বীকৃতিও পায়নি। আমরা যখন হিমালয় সম্বন্ধে কোনও আগ্রহই প্রকাশ করিনি, তখন বিদেশীরা এসে

অনেক তথ্য কুড়িয়ে নিয়ে গেছেন। আমরা সাংগঠনিকভাবে পর্বত অভিযানে উৎসাহী হওয়ার অনেক আগে থেকেই বিদেশীরা হিমালয়ে নানা অভিযান চালিয়েছেন। তাঁরা সফলও হয়েছেন বহুবার। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগে ও পরে বিশেষ করে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে পর্বতারোহণ একটি আনন্দদায়ক স্পোর্ট হিসেবে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন দেশের উচ্চ পর্বতমালাগুলির চূড়ায়-চূড়ায় তাঁদের সগর্ব পদক্ষেপের সাফল্যের ইতিহাস এই ধারণাকেই সুদৃঢ় করে।

এমনকী ১৯২৭-২৮ সালে যে 'হিমালয়ান ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়, তার প্রাথমিক সদস্যরা ছিলেন শুধুমাত্র ইউরোপিয়ানরা। ভারতবর্ষে পর্বতারোহণের সূচনা করেছিলেন এই ইউরোপিয়ানরাই, অবশ্য আর একটি বিশেষ গোষ্ঠীও তাঁদের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন পর্বতারোহণকে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মূলত তিব্বতী এই শেরপাদের বাস নেপাল ও ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, এঁরা দক্ষ পর্বতারোহী এবং পরিশ্রমী মালবাহক। তাই বিভিন্ন অভিযানে এঁদের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল। যাই হোক, ইউরোপিয়ানদেরই তৈরি শৈলশহর দেরাদুনের সাহেবি স্কুলের দেশী ছাত্রদের হিমালয়ে 'ট্রেকিং'-এ নিয়ে গিয়েছিলেন দুই সাহেব শিক্ষক। ১৯৪০ সালে সেই প্রথম সংগঠিত দলে হিমালয় ভ্রমণ। পাহাড় চড়ার সেই স্বাদ ভারতীয়রা উপলব্ধি করলেন। অজানাকে জানার আগ্রহে

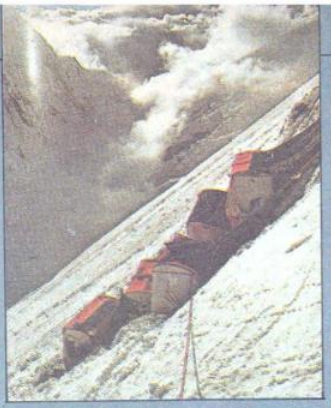

শুরু হল বার-বার পাহাড়ে ছুটে যাওয়া। দুন স্কুলেরই আর-এক শিক্ষক, তবে এবার আর সাহেব নন, খাঁটি দেশী হরি ডাং নামলেন অভিযানে। ১৯৫১ সালে তাঁর প্রথম অভিযান এবং ত্রিশূল- শীর্ষে আরোহণ এক চমকপ্রদ সাফল্যের ঘটনা। কিন্তু তখনও সেই রোমাঞ্চকর অভিযানের বিবরণ ভারতবাসীকে ততটা উত্তেজনা এনে দেয়নি, যতটা দিয়েছিল তেনজিং নোরগের এভারেস্ট বিজয়ের চমক।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টে ১৯৫৩ সালের ২৯ মে ভারতের তেনজিং নোরগে আর নিউজিল্যাণ্ডের এডমণ্ড হিলারির ঐতিহাসিক আরোহণ বিশ্ববাসীকে বিস্মিত, রোমাঞ্চিত ও পুলকিত করেছিল। সেই ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের নেতা কর্নেল হান্টকে অভিযানের পরিকল্পনা করার সময়ই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সম্ভব হলে ২৯ মে তারিখেই যেন এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয়ের চূড়ান্ত অভিযান চালানো হয়। কারণ, সেই দিনটি ছিল ইংল্যাণ্ডের রানি এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের দিন। সফল হল রানির অভিপ্রায়। আর শেষ হল অভিযাত্রীদের মরণপণ সাধনা।

ভারতবর্ষে পর্বতারোহণ অভিযানে সত্যিকারের প্রেরণা জাগাল তেনজিং-এর সেই চাঞ্চল্যকর সাফল্য এবং সেই প্রথম সরকারি মহলেও আলোচনা শুরু হল পর্বতারোহণের প্রচার ও প্রসার নিয়ে। তেনজিং নোরগের সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং যুবসমাজের মধ্যে পর্বতারোহণের উৎসাহ জাগাতে স্থাপিত হল ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ শিক্ষণ কেন্দ্র, দার্জিলিংয়ে। নাম হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট। তেনজিংকে করা হল তার ডিরেক্টর।

এভারেস্টের সুউচ্চ চূড়ায় জয়পতাকা ওড়ানোর স্বপ্ন দ্যাখেন না, এমন পর্বতারোহী পৃথিবীতে একজনও নেই। এভারেস্টের আকর্ষণ আজও তাই পর্বাতোরোহীদের কাছে অদম্য। এভারেস্টে সংগঠিত অভিযান শুরু হয়েছে বহুদিন থেকেই। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ এবং সুইস অভিযাত্রীরা বারবার এভারেস্ট অভিযানে বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে আসছিলেন। সে-যুগের উল্লেখযোগ্য অভিযান ১৯৩৫ সালে এরিক শিপটনের। যদিও সাফল্যের জয়মাল্য তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি, তা হলেও তখনকার সেই অভিযান ছিল কলাকৌশল ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের দিক থেকে অসাধারণ। কিন্তু প্রকৃতি কি এত সহজে পরাজিত হয়? ঘূর্ণিঝড়, বরফের ছোবল আর অলঙ্ঘনীয় গিরিশিরার ভয়াবহ অবস্থা তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। শেরপা হিসেবে তেনজিং-এর সেটাই ছিল প্রথম অভিযান। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করে নিয়ে পিছু হটতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাই বিভিন্ন অভিযানের অভিজ্ঞতায় নিজেকে তৈরি করে নিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন এভারেস্টে। এবার আর ব্রিটিশ দল নয়। ইউরোপ থেকেই আসা সুইস দলের সঙ্গী হলেন তিনি। এভারেস্টের পথে সমস্ত বাধা

ডিঙিয়ে এগিয়ে যাবার শপথ নিলেন। ১৯৫২ সালের সেই সুইস অভিযান বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। রেমন্ড লাম্বে-র নেতৃত্বে এই

ফোটো : তারাপদ ব্যানার্জি

অভিযান অবশ্য এভারেস্টের চূড়ার খুব কাছ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ২৮,২৫০ ফুট উঁচুতে সেই প্রথম মানুষের পদচিহ্ন পড়ল। সেই প্রথম সাফল্যের অধিকারীও তেনজিং নোরগে। তিনি সঙ্গী ছিলেন দলনেতা লাম্বের। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে, ব্রিটিশ দলের আগে এঁরাই এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারতেন।

১৯৫২-য় সুইস দলের নেতা হবার আগে ১৯৩৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত বিভিন্ন অ্যালপাইন ক্লাইম্বিং-এ নতুন নতুন রেকর্ড করেছেন লাম্বে। ১৯৩৮ সালে মঁ ব্লাঁ-য় তাঁর ঐতিহাসিক আরোহণের কাহিনী এখনও নবীনদের প্রেরণা জোগায়। শৃঙ্গ বিজয়ের পর ফেরার পথে প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝায় সেবার পথ হারিয়েছিলেন লাম্বে। চার-চারটি দিন তাঁকে

অক্সিজেন মুখোশ ও সাজসরঞ্জাম সহ পর্বতারোহী

বরফের ওপর কাটাতে হয়েছিল। ওপরে খোলা আকাশ আর নীচে জমাট বরফের মেঝে। অসহ্য ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া শরীর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আরও কাতর হয়ে আর চলতে চাইছিল না। তবু আশা ত্যাগ করেননি লাম্বে। দুঃসহ শীত ও বরফের কামড় উপেক্ষা করে, হিমবাহ, হিমানী সম্প্রপাত পেরিয়ে তিনি ক্যাম্পে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু পর্বতারোহণে তাঁর অদম্য সাহসের চরম মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছিল। তুষারক্ষতের জন্য লাম্বের দুটি পায়ের পাতা ও দু'হাতের কয়েকটি আঙুল কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। কিন্তু লাম্বে থেমে থাকেননি। আবার এভারেস্ট অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা তাঁর মুখের পেশিকে হিমালয়ের পাষাণে পরিণত করেছিল। অপরাজেয় লাম্বে একে একে অতিক্রম করেছিলেন পথের বিপদগুলি। সাফল্য প্রায় হাতের মুঠোয়, সেই অবস্থায় তাঁকে আবার একটা বড় ঝুঁকি নিতে হল। নিতে হল এক ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত। ২৭ হাজার ফুট উচ্চতায় খোলা আকাশের নীচে তাঁকে একরাত্রি কাটাতে হবে। তবে এবার আর একা নন, সঙ্গে আছেন শেরপা তেনজিং, যিনি এই পুরো দলটির বিশেষ প্রিয়পাত্র। অভীষ্টের এত কাছকাছি এসে ফিরে গেলে সুযোগ যদি আর কোনওদিনই না আসে, তাই ভয় জয় করলেন লাম্বে। দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি করে শরীর গরম রাখার চেষ্টায় আর ভোরের আলোর জন্য বিনিদ্র অপেক্ষায় সারা রাত কাটালেন। পরের দিন তেনজিংকে নিয়ে অপেক্ষায় আরও কিছুদূর (২৮,২১৫ ফুট) এগোনোর পর, শরীরিক ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন অবসন্ন লাম্বে, সে-বছরই শরতে আবার প্রকৃতির নিষ্ঠুর আঘাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল লাম্বের দ্বিতীয় এভারেস্ট অভিযান।

এরপর ১৯৫৩-য় ব্রিটিশ অভিযান, কর্নেল জন হান্টের নেতৃত্বে। সৌম্যদর্শন, শান্ত, বৃদ্ধ হান্টকেও দেখেছি দার্জিলিংয়ে, ১৯৭৩ এ, ওই অভিযানের ঠিক কুড়ি বছর পরে। তাঁর মাথার চুল, ভুরু, গায়ের, রঙ এমনকী চোখের পাতাও এত বেশি সাদা যে, হঠাৎ তাঁকে মার্বেল পাথরের মূর্তি বলে ভুল হয়। সুদক্ষ পর্বতারোহী এই হান্টের অভিজ্ঞতার শেষ নেই। নিপুণ, নিখুঁত পরিকল্পনা, উন্নতমানের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এবং শক্তিশালী, নির্ভীক সদস্যদের নিয়ে এভারেস্ট-চূড়ায় মরিয়া আক্রমণ চালিয়েছিলেন হান্ট। সবকিছুর বিনিময়ে এভারেস্ট জয়ই ছিল তাঁর একমাত্র পণ। তাঁর সেই চরম একাগ্রতা, দুর্জয় সঙ্কল্প আর অসীম ধৈর্যের পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন। পর্বতারোহণের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছে এভারেস্ট-শীর্ষে মানবের প্রথম পদক্ষেপ।

কর্নেল জন হান্ট

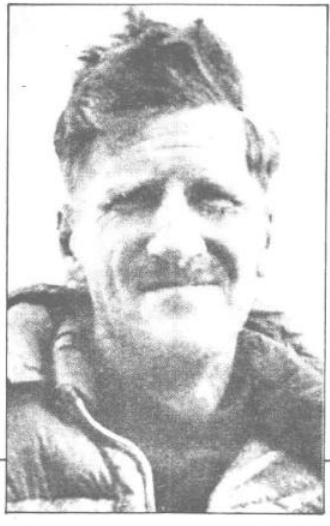

সেই ইতিহাসের অন্যতম নায়ক এডমণ্ড হিলারি। শুধু পাহাড় নয়, নদীতেও তাঁর কম ঝোঁক নেই। রোমাঞ্চের নেশায় তিনি উথালপাথাল করেছেন গঙ্গাকে। তাঁর সেই 'সাগর থেকে আকাশে' অভিযানের রোমাঞ্চ অভিযাত্রী মনকে তো বটেই, সাধারণ মানুষকেও বেশ কৌতূহলী করেছিল।

গত বছর মে মাসে দার্জিলিংয়ে হিলারি বলেছিলেন, 'বরফ আর পাথরের পাহাড় ফেলে আমায় এখন ফাইলের পাহাড়ে ডিঙোতে হচ্ছে।' সম্প্রতি নিজের দেশ নিউজিল্যান্ডের হয়ে ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে হাইকমিশনার হয়ে এসেছেন সার এডমণ্ড হিলারি। তিনটি দেশই তাঁর চেনা। ভারত ও নেপালে ঘুরেছেনও তিনি বিস্তর। মানুষজন একেবারে কাছের। তাই নতুন কিছু লাগছে না। 'কিন্তু এই বন্দিজীবনে নিজেকে পোষ মানাতে পারছি না এখনও।' হিলারি বলেছেন, অফিসের চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ পেরিয়ে তাঁর মন চলে যায় শেরপাদের দেশে, যেখানে তাঁর নিজের হাতে গড়া স্কুল, মেডিক্যাল ক্লিনিক, বাড়ি, ঘর, রাস্তা, সাঁকো সব রয়েছে। শেরপাদের জন্য নানা উন্নয়নমূলক কাজে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন তিনি। প্রিয়ভাষী এই মানুষটির জন্য ঝাঁকে-ঝাঁকে বাচ্চারা ছুটে আসে উষ্ণ অভ্যর্থনা নিয়ে, তাদের প্রিয় 'সহাব'-কে তারা ছাড়তেই চায় না। হিলারিও বলেন, 'ওদের নিয়েই আমার জগৎ। ওদের মধ্যে থাকতেই আমি ভালবাসি।'

১৯৬৩ সালে মার্কিন দলের সফল এভারেস্ট-অভিযানের শিখর আরোহণকারী সদস্য লুট জারস্টার্ড-এর জীবনও বৈচিত্র্যে ভরা। পর্বতারোহণকে শুধু খেলা হিসেবে না রেখে একে মানবসেবার কাজে লাগানো যায় কি না তা নিয়ে লুট অনেক ভেবেছেন। হাসিখুশি, আমুদে প্রকৃতির লোক। কেতাদুরস্ত চলাফেরা আর দারুণ স্মার্ট কথাবার্তা। পাহাড়ে যাওয়ার যে-আনন্দ, লুট তা অনেকের মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলেন। বিশেষ করে তাদের মধ্যে, যারা জন্ম থেকেই পৃথিবীর সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত। এরকম কয়েকজন অন্ধকে নিয়ে লুট বেরোলেন অভিযানে, প্রকৃতির সম্পদ যে শুধুমাত্র চোখে দেখার নয়, তাকে অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়ে, অন্তরের অন্তঃস্থলে তার ছোঁয়া পেতে হয় নিবিড়ভাবে, লুটের সেই অভিনব অভিযান যেন এই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সেই অভিযানের সাফল্য লুটকে আর এক মহান প্রেরণায় উদ্দীপিত করল। এবার তিনি মানসিক রোগী এবং সমাজবিরোধীদের নিয়ে

এক পরীক্ষামূলক অভিযানে উদ্যোগী হলেন। অরিগম স্টেট হাসপাতালের ৫১ জন রোগীকে (যার মধ্যে তিনজন খুনি) নিয়ে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথে পা বাড়ালেন লুট। এই অভিযান সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমাদের পরিবারে ও সমাজে যেটুকু ভালবাসা আমি পেয়েছি, তার কিছুটা অংশ আমি তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি। আর সেইখানেই আমার চরম সার্থকতা। এই অভিযান শেষে অনেক রোগীই তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে।' পর্বতারোহণকে এভাবে সমাজ উন্নয়নের কাজে লাগাবার কথা বোধহয় এমন করে আর কেউ ভাবেননি।

১৯৬৩-র সেই মার্কিন দলের অভিযান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নর্মান ডাইরেনফোর্থ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তিনবারে ছ'জন অভিযাত্রীকে পাঠিয়েছিলেন এভারেস্ট শিখরে। তার মধ্যে একবার ভয়াবহ পশ্চিমের পথে। তার আগে পৃথিবীর অন্য কোনও পর্বতারোহী ভীষণতম দুর্গম সেই পথে পা বাড়াননি। সেই অভাবনীয় সাফল্যের মহিমাকে কলুষিত করেছিল তাঁরই নেতৃত্বে আর-এক এভারেস্ট-অভিযানের গ্লানি। ১৯৭২ সালে তাঁরই নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক এভারেস্ট-অভিযান মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দলের এক সদস্যের মৃত্যুর সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছিল তাঁর কাঁধে। এ ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অক্ষম নেতৃত্ব, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও মন্দ পরিকল্পনার। এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, 'আমার এ -অভিযান যদি সফল হত, তবে হয়তো কোনও দিনই এসব কথা উঠত না। এভারেস্টের দক্ষিণ-পশ্চিম পথের প্রতি একটা মোহ আমার ছিল। প্রচলিত দক্ষিণ-পূর্ব পথে ততদিনে অনেকেই এভারেস্ট-শীর্ষে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। তাই নানা দেশ থেকে বাছা বাছা পর্বতারোহীদের নিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে চেয়েছিলাম। আমার সংগঠনে হয়তো সত্যিই কিছু ত্রুটি ছিল। কিন্তু সদস্যদের সহযোগিতা আমি পাইনি। সেটাই আমার দুর্ভাগ্য।'

ততক্ষণে আমার কল্পনায় ভেসে উঠেছে একটি মুখ। লাজুক হাসিমাখা, ফর্সা, সুন্দর একটি মুখ আর উজ্জ্বল দুটি চোখ। নাম হর্ষবর্ধন বহুগুণা, ভারতবর্ষের পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে সুপরিচিত একটি নাম। এই অভিযানের প্রকৃতির শিকার। নর্মান নিজে স্বীকার করেছেন, বহুগুণা ছিলেন দক্ষ পর্বতারোহী ও কঠোর পরিশ্রমী। অভিযানের সাফল্যের জন্য তিনি দুর্গম পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ভারী ভারী মাল টেনে তুলেছেন খাড়া বরফের দেওয়াল বেয়ে বেয়ে। সেই অভিযানেই দারুণ বন্ধুত্ব হয়েছিল সহ অভিযাত্রী উলফ্‌গ্যাং-এর সঙ্গে। সেই ভয়ঙ্কর দিনটিতেও তাঁরা একসঙ্গে নেমে

এভারেস্টে কয়েকজন খ্যাতনামা অভিযাত্রী। বাঁদিক থেকে এডমন্ড হিলারি, ডান্থ, জুনকো তাবেই

আসছিলেন অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে বিশ্রাম নিতে। উলফগ্যাং নিজের রুকস্যাক রেখে এসেছিলেন ওপরের ক্যাম্পে। তাই তিনি খালি হাতেই দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে পার হতে লাগলেন এক-একটা বাঁক। প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ের গর্জনে একজনের কথা অন্যের কানে যাচ্ছে না। বহুগুণা ছিলেন উলফগ্যাং-এর পেছনেই। তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। চেঁচিয়ে বন্ধুকে থামতে বলার শক্তিটুকুও ছিল না। বাঁকের দিকে পৌঁছে উলফগ্যাং বহুগুণাকে ইঙ্গিতে ডাকলেন, তাড়াতাড়ি চলে এসো। কিন্তু বহুগুণা তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছেন। কনকনে বরফের দেওয়ালে লেপ্টে-থাকা শরীরটাকে ঘষটে ঘষটে নিয়ে যাবার চেষ্টায় তাঁর গতি মন্থর। অবিরাম তুষারপাতের ফলে খুব কাছের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। তাঁর একহাতের দস্তানা খুলে গেছে, মাথায় হুড নেই। মুখের ওপর গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ জমছে। এর ওপর আবার নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে, তাঁর বুকের ক্যারাবিনা আটকে গেছে লম্বা দড়ির সঙ্গে। আর কয়েক পা এগোলেই এই ভয়াবহ রাস্তার শেষ। কিন্তু বহুগুণা আর এগোতে পারেননি। নীচের ক্যাম্প থেকে আসা উদ্ধারকারী দল বহুকষ্টে তাঁকে দড়ির ফাঁস খুলে অন্য দড়িতে ঝুলিয়ে খানিকটা নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই তুষার-তাণ্ডবের মধ্যে তাঁরাও নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছিলেন না। বহুগুণার তখন কোনও চেতনা নেই, তাঁর সমস্ত শরীর নিস্তেজ। হাওয়ার দাপট থেকে তাঁকে বাঁচাতে, দুজন উদ্ধাকারী তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে তাঁর অবশ, ভারী দেহটাকে একটা ছোট্ট ফাটলের আড়ালে রেখেছিলেন। ফেরা ছাড়া উপায় নেই। সেই দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে, অসহনীয় ঠাণ্ডায় মৃত্যুপথযাত্রী এক বন্ধুকে নিতান্তই বাধ্য হয়ে ফেলে গেলেন সহযাত্রীরা। ঝড়ের গোঙানি সেদিন তাঁদের কান্নাকেও ছাপিয়ে উঠেছিল। হতাশায় ভেঙে-পড়া কয়েকটি মানুষ তাঁদের প্রিয় বন্ধুকে শেষ বিদায় জানিয়ে সেদিন ফিরে গিয়েছিলেন আরও কয়েকটা প্রাণ বাঁচাতে। বহুগুণার অবশ শরীর ক্রমশ বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে এল। তাঁর চোখের সামনে মুছে গেল পৃথিবীর শেষ আলো।

তবে এভারেস্ট-অভিযানের তালিকায় ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৬৫-র ভারতীয় এভারেস্ট-অভিযান সারা বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। এই অভিযানে চারটি দলে ন'জন সদস্য এভারেস্ট-চূড়ায় পৌঁছে সারা পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিলেন। তার মধ্যে একটি দলে ছিলেন পৃথিবীর সর্বজ্যেষ্ঠ (৪২) ও সর্বকনিষ্ঠ সদস্য (২৩)। মোহন সিং কোহলির নেতৃত্বে এই অভিযানের আর-একজন সদস্য করলেন আর-এক বিশ্ব রেকর্ড। নওয়াং গোম্বু হলেন পৃথিবীর একমাত্র অভিযাত্রী, যিনি এভারেস্ট-চূড়ায় দ্বিতীয়বার আরোহণে সক্ষম হয়েছিলেন। গোম্বুর এই রেকর্ড পরবর্তীকালে বহু বছর অটুট ছিল। তেনজিং ও হিলারির নামের পাশে গোম্বুর নামটিও বিশ্ববন্দিত হয়ে উঠেছে।

ভাবতীয় দলের আর এক শিখর-আরোহী সদস্য ক্যাপ্টেন আলুওয়ালিয়া। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিনি এক নির্ভীক অফিসার। এভারেস্ট-অভিযান থেকে ফিরে আসার পর, দিল্লিতে তখন শুধু অভিনন্দন আর অভিনন্দন। চারদিক থেকে শুধু প্রশংসা, স্তুতি আর উপহার আসছে। আলুওয়ালিয়ার পদোন্নতি হল। তিনি হলেন মেজর। পেলেন ভারত সরকারের দেওয়া পদ্মশ্রী খেতাব। সুখেই জীবন কাটছিল। হঠাৎ এল কর্তব্যের ডাক, যুদ্ধে যেতে হবে। যুদ্ধে হঠাৎ একটা গুলি এসে বিঁধল আলুওয়ালিয়ার পিঠে। তারপর কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল। এভারেস্টের চূড়ায় দাঁড়ানো মানুষটি আজও পর্যন্ত নিজের পায়ে আর দাঁড়াতে পারেন না। এখন সারাক্ষণের সঙ্গী হুইল চেয়ার। কিন্তু এতে তিনি একটুও দমেননি। বিদেশ থেকে আনা হল বিশেষভাবে তৈরি গাড়ি। এখন শুধু পাহাড়ে যাওয়াটাই হয় না। কিন্তু পাহাড় নিয়ে যাবতীয় সম্মেলন, অনুষ্ঠান, বক্তৃতাসভা, সব জায়গাতেই তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য। এ ছাড়া আছে ছবি তোলা আর বই লেখা। জীবনকে খুব সহজভাবেই নিয়েছেন তিনি। যদিও চেয়ারেই তিনি বসে থাকেন, তবু বসে-থাকা বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ অলসভাবে সময় কাটানো, তা তার একেবারেই সয় না। হুইল চেয়ারে বসেই দিল্লির বিগত এশিয়াডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

বসে থাকতে মন চায় না জাপানি তরুণ নাওমি ইউমুরারও। পাহাড়, নদী, জঙ্গল এসবই তাঁর মনকে টানে। নিজের দেশের সবচাইতে উঁচু পাহাড় ফুজিতে চড়া হয়ে গেল ১৯৬০ সালে, আঠারো বছর বয়সেই। তারপর মন চাইল হিমালয়ে যেতে। আর হিমালয়ে যেতে হলে এভারেস্টের চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে! মাঝখানে দু-একটা দেশে ঘুরে দেহ ও মনের শক্তি বাড়িয়ে নিয়ে তিনি এলেন এভারেস্টে ১৯৭০-এ। দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরার প্রচলিত পথ দিয়েই তাঁদের অভিযান চলল। কিন্তু প্রাকৃতিক বাধা তাঁদের অভিযানকে পর্যুদস্ত করেছিল বারবার। তা হলেও ছিল তাঁর অদ্ভুত জেদ আর অফুরন্ত মনোবল। এভারেস্ট তিনি জয় করলেন ১১ মে। কিন্তু এভারেস্ট তাঁকে খুশি করতে পারল না। ইউমুরার জীবনে অ্যাডভেঞ্চার শেষ হবার নয়। তাই তিনি নতুন কিছু করার পরিকল্পনা নিলেন। ততদিনে দক্ষিণ-মেরু-অভিযান শুরু হয়ে গেছে। তাই তিনি বেছে নিলেন উত্তর-মেরু। তবে কারও সঙ্গে নয়। তিনি গেলেন একা। সমস্ত সাজসরঞ্জাম, এক বছরের মতো খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে শুরু হল তাঁর যাত্রা। ইউমুরার কাছে গ্লেশিয়ার বা হিমবাহের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। তীব্র শীত ও জমাট বরফের নীল রঙ তাঁকে মোহিত করে। গ্রিনল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূল এলাকায় ছ'মাস তিনি এস্কিমোদের দেশে কাটালেন। একের পর এক চড়তে থাকলেন গ্রিনল্যাণ্ডের সব আইসক্যাপ। কিন্তু তাতেও মন ভরল

ইউমুরা, বচেন্দ্রী, আলুওয়ালিয়া, লুট, নয়াং গম্বু, কোহলি.

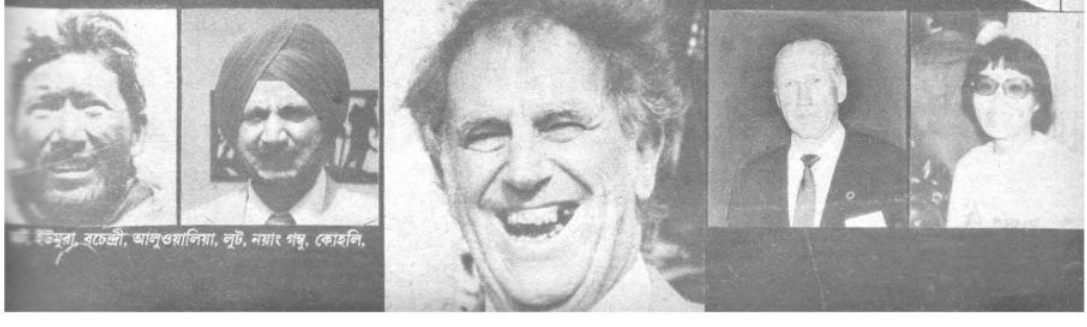

না। আরও বড় অ্যাডভেঞ্চারের জন্য ছটফট করলেন তিনি। এবার আড়াআড়িভাবে গ্রিনল্যান্ড পার হওয়ার পরিকল্পনা নিলেন। বরফ-সাদা সমুদ্রের মাঝখান থেকে উঁকি মারছে বিরাট-বিরাট পর্বতগাত্র। সেই দুর্গম ৩০০ কিলোমিটার পথ চলতে তাঁর লেগেছিল ১০৩ দিন। তার মধ্যে তিন দিন আটকে থাকতে হয়েছিল তুষারঝঞ্ঝায়। অবিরাম বরফের ঝড় তাঁকে মুখ তুলতে দেয়নি। সেই বাধা কাটিয়েও তিনি এগিয়ে গেলেন। সাথী বলতে কয়েকটা কুকুর। বরফের ওপর দিয়ে ওই কুকুরগুলোই তাঁর সমস্ত মাল টেনে নিয়ে গিয়েছিল স্লেজে।

অভিযান শেষে দেখা গেল তাঁর সমস্ত মুখ তুষারক্ষতে আক্রান্ত। কিন্তু অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে দুটি হাত। চিকিৎসা শেষে ইউমুরার অভিযাত্রী-মন আবার মাতল আরও বড় কোনও রোমাঞ্চের নেশায়। এবার তিনি ভেলা ভাসালেন আমাজন নদীর উৎস থেকে আর্কটিক সাগরে। ৬০০০ কিলোমিটার পথে, ভয়ঙ্কর স্রোতে বহুবার তিনি ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবু শেষ করেছিলেন তাঁর সেই দুঃসাহসিক অভিযান। আবার আরও বড় কোনও রোমাঞ্চের নেশায় ঘুরতে ঘুরতে ইউমুরা হারিয়ে গেছেন রহস্যঘেরা প্রকৃতির মাঝখানে। অনেকদিন তাঁর কোনও খবর নেই। অভিযাত্রী ইউমুরা হয়তো আজও খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোনও নতুন পথের সন্ধান।

এভারেস্টের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যাঁদের নাম ক্রিস বনিংটন তাঁদের অন্যতম। মাত্র কিছুদিন আগে, ৫২ বছর বয়সে, এভারেস্ট-শৃঙ্গে তাঁর আরোহণ আবার প্রমাণ করেছে, অভিযাত্রীর মনোবলের কাছে বয়সের ভার কোনও বাধাই নয়। এর আগেও ক্রিস এভারেস্ট-অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে প্রচলিত পথে না গিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন দক্ষিণ-পশ্চিমের দুর্গম পথ। যে-পথে বারবার সাফল্য এসে গেছে, সে-পথ বনিংটনের মনে কোনও রোমান্স আনতে পারে না। তাই ১৯৭৫-এ ম্যাপ দেখে, ছবি দেখে তিনি বেছে নিয়েছিলেন এই পথ। অন্নপূর্ণার পর আবার এক 'বিগ হিমালয়ান ফেস'-এর মুখোমুখি দুরন্ত বনিংটন। দক্ষিণ-পশ্চিমের সেই পথের ভয়াল রূপ কঠোর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে। কিন্তু তার চেয়েও কঠোর ছিল তাঁর সঙ্কল্প। সংগ্রামের মুখে প্রকৃতিও হার স্বীকার করে একদিন, জয় হয় মানুষের অদম্য ইচ্ছার। তবে এই সাফল্যের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল বনিংটনকে। বহু আরোহণের সঙ্গী দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রক-ক্লাইম্বার মাইক ব্রুককে হারাতে হয়েছে এই অভিযানেই।

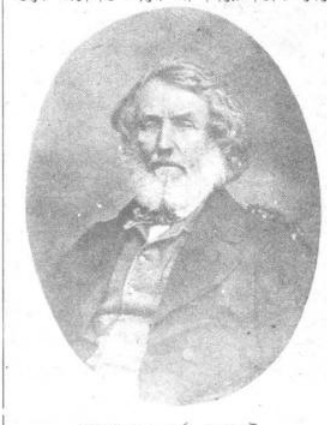

কর্নেল জন হাঁট এভারেস্ট

কোন্ পাহাড়ে ওঠা সব থেকে কঠিন

ভারতের হিমালয় ইউরোপের আল্পস, রাশিয়ার পামির, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, জাপানের ফুজিয়ামা। এর মধ্যে কোন্ পাহাড়ে ওঠা সব থেকে কঠিন।

ওপরের পাহাড়গুলো কোনওটাই বিচ্ছিন্ন একটি পাহাড় নয়। সবগুলোই পর্বতমালা। সুতরাং কোন্ পাহাড়ে ওঠা কঠিন এই প্রশ্ন অর্থহীন। সব ক'টি পর্বতমালায় অনেক অনেক পর্বতশৃঙ্গ আছে। এগুলি একক, এক-একটি পর্বত চূড়া। যেমন এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণা, নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি—এরকম অজস্র পর্বতশৃঙ্গ আছে হিমালয় পর্বতমালায়। আল্পস্ পর্বতমালায়, মঁ ব্লাঁ, ম্যাটার হর্ন উল্লেখ করার মতো। রকির মাউন্ট ম্যাকিন্‌লে, পামিরে লেনিন পিক্।

যে সব বাধা, বিপদ ও অসুবিধে পর্বতারোহীদের অতিক্রম করতে হয়, তা সব দেশের পাহাড়েই সমান। এইসব বাধা সৃষ্টি হয় এক-একটি পর্বতগাত্রের আকৃতি গঠনের তারতম্যের জন্য। একই পাহাড়ের ভিন্ন-ভিন্ন দিকের গাত্র সম্পূর্ণ আলাদা। এক দিকের সঙ্গে আর-একদিকের কোনও মিল নেই। যেমন এভারেস্টের উত্তর-গাত্র, দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা, পশ্চিম-গাত্র ও দক্ষিণ-পূর্ব গাত্রের গঠন ও আকৃতি, এমনকী আবহাওয়ার প্রকৃতিও বেশ আলাদা। আরোহণের বাধাবিপত্তিও ভিন্ন-ভিন্ন রকমের। তাই পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে একই পর্বতের এক-একটি দিককে অভিযাত্রীরা পৃথক পৃথক পাহাড় বলে মনে করেন। পর্বত-গাত্রের এই গঠনপ্রকৃতির বাধাগুলো সব দেশের পাহাড়েই অতিক্রম করতে হয়।

আল্পস, পামির, আন্দিজ, ফুজিয়ামা, প্রভৃতির সঙ্গে হিমালয়ের পার্থক্য হচ্ছে হিমালয়ের উচ্চতা। হিমালয়ের মতো এমন উঁচু উঁচু শৃঙ্গ পৃথিবীর আর কোনও পর্বতমালায় নেই। আমরা জানি, যত উঁচুতে যাওয়া যাবে বাতাসের চাপ ততই কমতে থাকে। সেই কারণে শরীরের ওপর তার প্রতিক্রিয়া তত বাড়তে থাকে।

অন্যান্য দেশে আর-একটি সুবিধে এই যে, পাহাড় প্রায় ঘরের মাথায় বলতে হয়। মূল পাহাড়ের পাদদেশেই জনবসতি। সেখান থেকেই আরোহণ শুরু করা যায়। আল্পসে তো রোগওয়েতে বসেই পর্বতশীর্ষে পৌঁছনো ব্যবহার না করে, আরোহণ চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু মেসনার অ্যালপাইন পদ্ধতিতে পাহাড় চড়ায় অভ্যস্ত। খুবই কম মালপত্র, অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই না-নেওয়া এবং নিজের রান্না নিজেই করা—এসবই তাঁর বিশেষত্ব।

পর্বতারোহীর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম

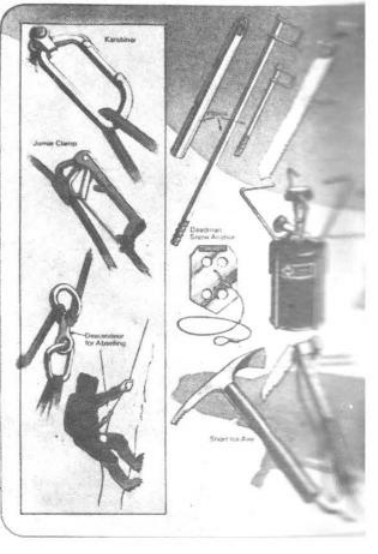

বনিংটনের পরেই যাঁর নাম মনে আসে, তিনি এক ইতালিয়ান ক্লাইম্বার—রেনোল্ড মেসনার। সাম্প্রতিক কালের পর্বতারোহণের জগতে তিনি এক উজ্জ্বল তারকা। ১৯৮০ সালের ২০ অগস্ট একক উদ্যোগে এভারেস্ট-শীর্ষে তাঁর আরোহণ সারা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। তার আগেও ১৯৭৮-এ তিনি আর-একবার এভারেস্টের চূড়া ছুঁয়ে এসেছেন। আর এই দু'বারই তিনি উঠেছেন বিনা অক্সিজেনে। ওই উচ্চতায় অক্সিজেন

এভারেস্ট শৃঙ্গ

যায়। হিমালয়ে কোনও পর্বতেই সেই সুবিধে নেই। মূল পর্বতের পাদদেশে পৌঁছতে গেলে জনবসতিবিহীন এলাকা দিয়ে বেশ কয়েক দিন হাঁটতে হবে। এটাও হিমালয়ের পর্বতশীর্ষ আরোহণের একটা বড় অসুবিধে।

হিমালয়ে স্থায়ী বরফ-রেখা শুরু হয়েছে চোদ্দ-পনেরো হাজার ফুট উচ্চতা থেকে। দিক বিশেষে এর দু-এক হাজার ফুটের তারতম্য হয় মাত্র। অন্যান্য দেশের পর্বতমালায় স্থায়ী বরফ-রেখা অনেক নিচ থেকেই শুরু হয়েছে। দু-তিন হাজার ফুট উচ্চতা থেকে। মাউন্ট ম্যাকিনলে অঞ্চলে তো শীতকালে সমুদ্র সীমানা বরাবর বরফ-রেখা নেমে আসে। এই অঞ্চলের পর্বতারোহীদের এইটা বড় সুবিধে।

হিমালয়ের আবহাওয়া অত্যন্ত অস্থির। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে পূর্ব ও মধ্য হিমালয়ের আবহাওয়া হঠাৎ হঠাৎ পালটে যায়। খুব খারাপ অবস্থা হয়ে ওঠে। পর্বতারোহণের পক্ষে মারাত্মক। তেমনি শীতকালে উত্তর দিকের সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে আসা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওড়া ও বরফপাতের জন্য শীতকালে হিমালয়ে পর্বতশীর্ষে আরোহণ প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। অবশ্য পামির অঞ্চলেও একই কারণে অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়ে।

এভারেস্টের চূড়ায় প্রথম যেদিন পুরুষের পায়ের ছাপ পড়ল, সেদিন থেকেই জানা ছিল, মেয়েরাও এভারেস্টকে রেহাই দেবে না। ১৯৭৫-এ প্রথম জাপানি মেয়ে জুনকো তাবেই এভারেস্টের গর্ব খর্ব করে মেয়েদের মান বাড়ালেন। এভারেস্টের আগে নিজের দেশের ফুজি, আল্পস-এর বিভিন্ন শৃঙ্গ ও হিমালয়ের অন্নপূর্ণা আরোহণের অভিজ্ঞতা জুনকোকে সাহসী করে তুলেছিল এভারেস্টের পথে পা বাড়াতে।

এভারেস্টের আর এক কন্যা ওয়াঙ্গা। পোল্যাণ্ডের মেয়ে **ওয়াঙ্গা** রুত্‌কিবিক এক আন্তর্জাতিক দলের সঙ্গে এসেছিলেন এভারেস্ট অভিযানে। অসীম ধৈর্য, অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর অফুরন্ত সাহস নিয়ে তিনি তাঁর অভীষ্টের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আগের রাত্রে একেবারেই ঘুম হয়নি। অবিরাম তুষার ধসের গর্জন, ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি আর কনকনে ঠাণ্ডার প্রকোপ ছোট তাঁবুর মধ্যে তাঁদের জেগে থাকতে বাধ্য করেছিল। ওয়াঙ্গা তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে পরে বলেছেন, 'আমার সামনে প্রতিরোধের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল এভারেস্ট।'

এভারেস্টের আর এক দুর্ধর্ষ নায়ক ডগলাস স্কট। ১৯৭৫-এ বনিংটনের ঐতিহাসিক অভিযানে দক্ষিণ-পশ্চিমের পথে তিনি এভারেস্ট জয় করেন। এভারেস্টে রুশ অভিযানের নেতা ডাম্ব ১৯৮২ সালের ৪ মে থেকে ৯ মে মোট এগারোজনকে এভারেস্টের চূড়ায় তুলেছেন। এই কৃতিত্ব তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্ব এবং উপযুক্ত সাংগঠনিক কৌশলের। তাঁর দলের সবাইকে হিমালয়ের আবহাওয়া একটু কাবু করেছিল। ভারতীয় দলের ন'জনের এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণের রেকর্ড ভেঙেছে এই রুশ দল।

১৯৮৪-র ২৩ মে সমস্ত ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন বচন্দ্রী পাল। গাড়োয়ালের এক ছোট্ট গ্রামের সাদাসিধে এই মেয়ে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টাতেই দুর্গম এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এভারেস্টের চূড়া যাঁরা জয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই বয়সে ছোট। কিন্তু এই বচন্দ্রী ২৫ হাজার ফুট উঁচুতে এক বিরাট তুষার ধসের কবলে পড়ে চারদিকে দেখেছেন শুধু মৃত্যুর শূন্যতা। কিন্তু তার সঙ্গীরা চটপট তাঁবু ফালা ফালা করে কেটে শীতল মৃত্যুর ফাঁদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতেই বচন্দ্রীর মনে হয়েছিল, মা দুর্গা তাঁকে এভারেস্ট জয়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখলেন।

বচন্দ্রীর ডায়েরিতে দেখেছিলাম ২৩-৫-৮৪'র পাতায় শুধু লেখা : 'সামিট্ ডে অন এভারেস্ট'—বাকি পাতাটা খালি। ওঁর এই উচ্ছ্বাসহীন অভিব্যক্তি আমাকে কিছুটা অবাক করেছিল। তাই ওঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, 'পৃথিবীর পঞ্চম মহিলা এবং ভারতের প্রথম পর্বতারোহিণী হিসেবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আপনার কী মনে হয়েছিল?' বচন্দ্রী বলেছিলেন, 'নিজে একজন ক্লাইম্বার হয়ে জানেনই তো, যে-কোনও চূড়ায় উঠতে পারলেই মনটা কী আনন্দে ভরে যায়। এক ঘণ্টা সাত মিনিট সামিটে ছিলাম। কিন্তু নামার ব্যাপারে সেদিন আমার প্রথম চিন্তা হয়েছিল। প্রায় মাসখানেক ধরে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে যে-পথে নিষ্ঠাভরে এগিয়েছি, সেই পথ এসে থেমেছে এই চূড়ায়। চলে তো এলাম। এবার নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে পারব তো? চোখের চশমা আমার খোলাই ছিল। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম অজস্র বরফচূড়া সাদা ধোঁয়ার মধ্যে যেন উঁকি মারছে। ছবি তুললাম কয়েকটা। তারপর আর দেরি না করে নামতে শুরু করলাম। নীচের ক্যাম্পে না পৌঁছনো পর্যন্ত ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

আজ পর্যন্ত এভারেস্টে সফল অভিযান হয়েছে ৭৫টিরও বেশি, আর ওই চূড়ায় আরোহণকারীর সংখ্যা পৌঁছেছে ১৮০এর ওপরে। তবু এভারেস্টের আকর্ষণ কমেনি একটুও। দূর-দূরান্ত থেকে অভিযাত্রীরা বারবার ছুটে আসছেন এভারেস্টের অমোঘ হাতছানিতে, নিত্য নতুন পথে, নিত্য নতুন পদ্ধতিতে তাঁদের অভিযান চালাতে। হয়তো এ খেলা চলবে যুগযুগান্ত ধরে।

রঙিন ফোটো : রবিন বিশ্বাস

তেনজিং

টাইগার অভ্ টাইগারস্

বিশ্বদেব বিশ্বাস

গাড়োয়ালের পাহাড়ি গ্রামে প্রবাদ আছে, কারও মাথায় সাপ উঠলে সে নাকি রাজা হয়! ১৯৫০ সালে তেনজিং গিবসনসাহেবের সঙ্গে বান্দরপুঞ্ছ জয় করে ফিরছিলেন। পথে ধৃতিয়াল লেকের ধারে বিশ্রাম নিতে নিতে সকলে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই সময় তেনজিং-এর মাথার টুপিতে একটা সাপ উঠে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে ছিল। সাপটাকে অবশ্য সকলে মিলে মেরে ফেলেছিল। কিন্তু তখনই দলের গাড়োয়াল মালবাহকরা তেনজিংকে বলেছিল, 'তুমি রাজা হবে'। এই প্রবাদ সত্যি হয়ে ফলে কি না তা কেউ জানে না, তবে তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় উঠে রাজকীয় মানসম্ভ্রম পেয়েছিলেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন, এভারেস্ট পর্বত পৃথিবীর সবচেয়ে নিচু সমুদ্রের তলা থেকে ধীরে ধীরে উঠে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বত হয়েছে। তেনজিংও তেমনি নেপালের খুব দরিদ্র পরিবার থেকে ক্রমে ক্রমে উঠতে উঠতে পৃথিবীর সবচেয়ে ওই উঁচু জায়গায় উঠেছিলেন। আজ তেনজিং এক ইতিহাস। একজন প্রবাদপুরুষ। তেনজিং এভারেস্টে ওঠার আগে ভারতবর্ষে পর্বত-আরোহণের কথা বিশেষ কেউ জানতই না। আর এখন ভারতে পর্বত-আরোহণের 'প্রতীক' বলতে তেনজিংকে বোঝায়। তেনজিং ও হিলারির পর আজ পর্যন্ত অনেকে, কয়েকজন দুবার-তিনবারও এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছে। মোট ১৭৮ জন। কিন্তু তাদের নাম বিশেষ কারও মনে নেই। কিন্তু তেনজিং ও হিলারির নাম কোনওদিন ভুলে যাবার নয়। এখন এমন কথাও চালু হয়ে গেছে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বড় বড় বাধাকে অনেকেই এভারেস্টের সঙ্গে তুলনা করে। আর সেই রকম বাধা কেউ কাটিয়ে উঠলে তাকে 'তেনজিং' বলে আখ্যা দেয়।

আমার সৌভাগ্য, তেনজিং ভারতবর্ষে প্রথম যখন পাহাড়ে ওঠার শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, আমি তখন তাঁর কাছে হাতে-কলমে সেই শিক্ষা নিয়েছি। সে আজ থেকে ত্রিশ বছরেরও বেশি আগেকার কথা। সেদিনের কথা মনে হলে আজও শরীরে নতুন করে শিহরন জাগে।

তেনজিং-এর সময় শক্তিশালী অনেক শেরপা ছিল। যেমন আজীবা, আংথারকে, আংশেরিং, গ্যালজেন, দা-তেম্বা, দা নামগিয়াল, কিংচক শেরিং, এরকম আরও কতজন। কিন্তু সেই সময় অভিযাত্রীদলে তেনজিং-এর চাহিদা ছিল সবথেকে আগে, বিশেষ করে এভারেস্ট-অভিযাত্রীদলে। কিন্তু কেন সব দল আগে তেনজিংকেই চাইত? কী তাঁর বিশেষত্ব ছিল? উপরের নামকরা শেরপাদের অনেককে আমি চিনতাম। তাদের সঙ্গে পাহাড়েও গেছি আমার পাহাড়ে ওঠা জীবনের প্রথম দিকে। পরে বুঝেছি কেন আমাদের শিক্ষাগুরু তেনজিং এদের চেয়ে অসাধারণ ছিলেন।

শক্তিশালী শেরপারা খুব ভারী ভারী বোঝা পাহাড়ের উপরে বইতে পারে। এদের স্বভাব খুব নম্র। দলের অভিযাত্রীদের এরা ভীষণ ভালবাসে। তাদের কথা শোনে, খুব যত্ন করে, তেমনি সকলকে খুব সম্মান করে। দলের সদস্যদের বিপদের মধ্যে বাঁচাতে গিয়ে নিজেরা স্বেচ্ছায় মরতেও কোনওরকম দ্বিধা করে না। এটা বোধহয় শেরপা জাতের ধর্ম। তেনজিং-এর মধ্যেও এসব গুণ গোড়া থেকেই ছিল। এছাড়াও তাঁর মধ্যে আরও কিছু বেশি গুণ ছিল। শিশুবয়স থেকেই বড় হওয়ার জন্য তাঁর স্বপ্ন ছিল আর বিদেশী অভিযাত্রীদের মতো নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য খুব চেষ্টা করতেন। যখনই পাহাড়ে যাবার সুযোগ পেতেন তখনই পিঠে বোঝা নিয়ে চলতে চলতেই অভিযাত্রীদের পাহাড়ে চলার কায়দা-কানুন, দড়িতে কী করে

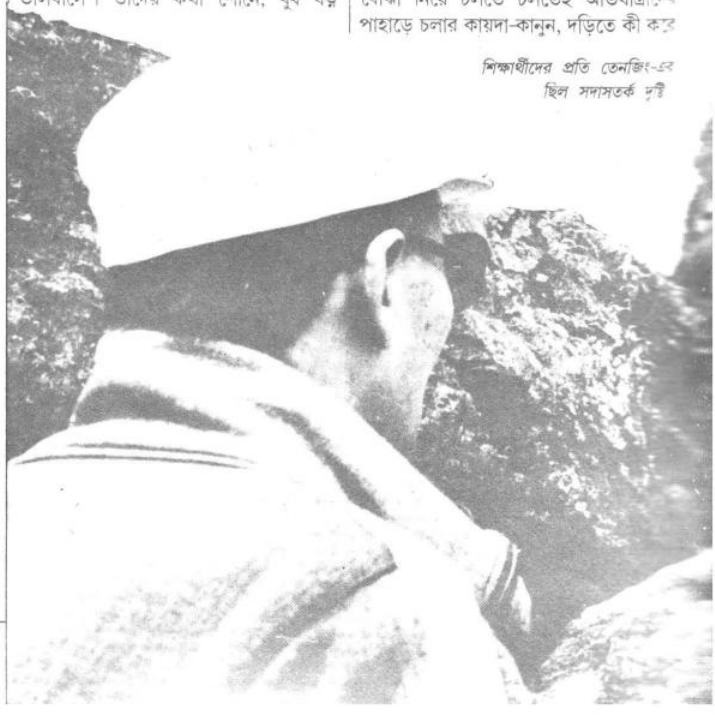

শিক্ষার্থীদের প্রতি তেনজিং-এর ছিল সদাসতর্ক দৃষ্টি

ফাঁস বাঁধতে হয় সেসব পদ্ধতি, পাহাড়ে ওঠার যন্ত্রপাতিগুলো কী করে ব্যবহার করতে হয় দেখে দেখে সেসব শিখে নিতেন। এইভাবেই নিজেকে উপযুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তেনজিং-এর আর-একটা গুণ ছিল, সেটা হচ্ছে মুখে যেন খোদাই-করা এক বিশেষ ধরনের হাসি।

তেনজিং আরও পাঁচজন শেরপার মতো একজন শেরপা। কিন্তু দেখা গেছে, যতবার তিনি পাহাড়ে গেছেন, প্রথম জীবনের কয়েকটি অভিযান ছাড়া বেশিরভাগ অভিযানেই দলে শেরপা-সর্দারের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। সর্দারকে দলনেতার দায়িত্বের অনেকখানি বইতে হয়। স্বাধীনভাবে নিজে থেকে অনেক-কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ভুল হলে বিপদ ঘটতে পারে, এমনকী অভিযান ব্যর্থ হতে পারে। সর্দার বা নেতা হওয়ার জন্য সাধারণের থেকে বিশেষ কিছু বাড়তি গুণ চরিত্রে থাকা দরকার। তেনজিং-এর চরিত্রে সেই বাড়তি গুণগুলো পুরোপুরি ছিল বলে তিনি ছিলেন উঁচু ধরনের শেরপা। পাহাড়ের উচ্চতায় চরম কষ্ট, পরিশ্রম, বিপদ, স্বাভাবিক খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কতরকম অসুবিধে। তেনজিং ছিলেন শত অসুবিধের মধ্যেও অত্যন্ত ধীর স্থির ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তাঁর পাহাড়ি দৃষ্টিও ছিল সুদূরপ্রসারী। আর ছিল অসমসাহস। তাঁর মুখে পারা যাবে না কথাটা ছিল না, সে যত বিপজ্জনক ঝুঁকির কাজই হোক না কেন। পর্বতারোহী হিসেবে তাঁর যেন দেবদত্ত একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল। পর্বতের সুদূর উচ্চতায় কোনও দুর্ঘটনার আগাম আন্দাজ কীভাবে করতে হবে, দুর্ঘটনা ঘটলে কীভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে, কোন পথে গেলে দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে, তা তেনজিং সঠিকভাবেই বুঝতে পারতেন। তেমনি বিপদে পড়ে কোনও সঙ্গীকে কখনও ফেলে রেখেও পালিয়ে আসেননি, বরং সেইসব সঙ্গীকে বাঁচাবার জন্য একরোখা হয়ে উঠেছেন, নিজের জীবনও বিপন্ন করেছেন। এইসব সহজাত গুণের জন্য তেনজিং একজন সাধারণ মালবাহক থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই শেরপা হয়ে উঠেছিলেন। তারপরই শেরপা-সর্দার। আপন বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার গুণে অভিযাত্রীদলে তাঁর সমান মর্যাদার সদস্য হবার যোগ্যতা ছিল। ১৯৫২ সালে সুইস দলের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে শেরপা দলের সর্দার ও অভিযাত্রীদলের সদস্য একসঙ্গে দুই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। একই বছরে দু'বার। বর্ষার আগে ও বর্ষার পরে। উঠেছিলেন ২৮,২৫০ ফুট পর্যন্ত। এভারেস্টের চূড়া প্রায় হাতের মুঠোয়, কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর খারাপ আবহাওয়া। চূড়ায় হয়তো ওঠা যাবে কিন্তু ফেরা যাবে কি না সন্দেহ। তেনজিং কিন্তু তখন নিজের জন্য বিশেষ চিন্তা করেননি। তাঁর চিন্তা বন্ধু ল্যাম্বার্টের জন্যে। সে-যাত্রায় নেমে এলেন।

তেনজিং পাহাড়ে চড়ার প্রথম সুযোগ পান ১৯৩৫ সালে, এভারেস্ট অভিযানে একজন সাধারণ মালবাহক হয়ে। আর তৃতীয়বার, ১৯৩৮ সালে টিলম্যানের সঙ্গে একজন শেরপা হিসাবে সঙ্গী হয়ে খেতাব পান 'টাইগার অভ দি স্নো'। ১৯৫৩ সালে আরও বড় খেতাব,এভারেস্টের চূড়ায় উঠে 'টাইগার অভ টাইগারস্'। জীবনে অনেক খেতাব তেনজিং পেয়েছেন, তার মধ্যে এই দুটো খেতাবকেই জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে মনে করতেন তিনি। জীবনে প্রথম পাওয়া 'টাইগার' শেরপাদের কাছে খুব মর্যাদার উপাধি। আর শেষের উপাধিটি দিয়েছেন নেপালের তৎকালীন রাজা। তেনজিং জন্মসূত্রে নেপালি। বলতেন, আমি নেপাল মাতৃভূমিতে জন্মেছি, আর ভারত-মায়ের কোলে মানুষ হয়েছি, তাই আমি একজন ভারতীয়ও।

১৯১৪ সালে উত্তর-পূর্ব নেপালের বারো হাজার ফুটের উপর উচ্চতায় শোলখম্বু জেলার থামি নামে এক অজানা গ্রামে খুব দরিদ্র পরিবারে তেনজিং-এর জন্ম। ১৮ বছর বয়সে জীবন গড়ার বাসনায় দার্জিলিঙে পালিয়ে আসেন। ১৯৩৫ সালে প্রথম পাহাড়ে যাওয়ার সুযোগ পান। সেই যাত্রার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ১৯৫৩ সালে। দীর্ঘ অভিযাত্রী-জীবনে তেনজিং বহু পাহাড়ে গেছেন। তার মধ্যে এভারেস্টেই সাতবার। বহুবার বিপদে পড়েছেন। চোখের সামনে পাহাড়ের উপর সঙ্গীসাথীদের মরতে দেখেছেন। অনেককে বাঁচিয়েছেন। সর্বত্রই এক-একটা কীর্তি রেখে এসেছেন। নিজে অসুস্থ হয়েছেন খুব কম। বলতেন, আমার একটা বাড়তি ফুসফুস আছে।

পর্বতারোহণের ইতিহাসে সবচেয়ে

ফোটো : তারাপদ ব্যানার্জি

গৌরবময় দিন ২৯ মে ১৯৫৩। এই দিনই ভারতের তেনজিং নোরগে ও নিউজিল্যান্ডের এডমন্ড হিলারি একই দড়িতে নিজেদের দু'জনকে বেঁধে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন একই সময়ে। এভারেস্ট আরোহণের কঠিন সাধনা আরম্ভ হয়েছিল ১৯২১ সালে। সেই সাধনায় অনেকগুলো প্রাণ বলি হওয়ার পর শেষে সিদ্ধিলাভ করলেন এই দু'জন। ১৯৫৩ সালের অভিযান ছিল ১১তম পূর্ণাঙ্গ এভারেস্ট অভিযান। যেন ৩৩ বছর ধরে একটা রিলে রেসের শেষ হল।

ছাত্রদের উপর তেনজিং-এর দৃষ্টি ছিল সজাগ, বিশেষ করে আমাদের ৭ জন তরুণ এন. সি. সি. ক্যাডেট-এর উপর। বাকি ছাত্ররা ছিলেন মিলিটারি অফিসার ও উত্তর প্রদেশের সীমান্ত পুলিশ অফিসার। একদিন জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছটফট করছিলাম। কেউ দেখতে পায়নি। আমার গ্রুপের শিক্ষকও নয়। কোথা থেকে তেনজিং হঠাৎ হাজির হয়ে আমাকে উদ্ধার করলেন। হাত ধরে নিয়ে গিয়ে দলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পাহাড়ে খানা ছোড়, লেকিন্ সাথী মত ছোড় না।'

আর একদিন, তালিম নেবার সময় নিজের দোষে দড়ি ভুল করে ধরায় পাথরের গায়ে আছাড় খেয়ে মরতে বসেছিলাম। অলক্ষ্যে তেনজিং ছুটে এসে আমায় বাঁচালেন। আমার ভুলের জন্যে ধমক দিলেন আমার ইনস্ট্রাকটরকে। তাঁরই নাকি হুঁশ করা উচিত ছিল। এই রকম প্রতিপদে, প্রতিক্ষেত্রে ছাত্রদের কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন তেনজিং আর নিজ হাতে কাজ করার নমুনা দেখাতেন।

আমাদের শিক্ষার শেষ দিনে চূড়ান্ত আরোহণের পরীক্ষা। পরীক্ষক ও আরোহণের নেতা তেনজিং নিজে। ১৮ হাজার ফুট উঁচু এক বরফের টিলায় আমরা উঠছি। একই দড়িতে সামনে তেনজিং, তার পর বন্ধু মদন মণ্ডল ও শেষে আমি বাঁধা আছি। উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। হঠাৎ খেয়াল পড়ল, তেনজিং বুটের তলায় কাঁটা লাগাননি। এ-বিষয়ে তাঁকে বলায় একটু হেসে বললেন, অভ্যাস হয়ে গেলে তোমরাও এইরকম জায়গায় কাঁটা না লাগিয়েও উঠতে পারবে।

অদূরে ১৯ হাজার ফুট উঁচু এক পাহাড়ের চূড়া। নাম 'ফ্রে' পিক্। সোজা যেন মাথা উঁচু করে আকাশ ফুটো করে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে মুখ গম্ভীর করে তেনজিং বললেন, "আজ তুমি আমাকে যে-কথা বললে, কয়েক বছর আগে ঠিক এই কথাই

পাহাড় কী করে হল

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড় কী করে হল, পাহাড় কেনই বা উঁচু, এ নিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গিয়ে এক পাহাড়ের সঙ্গে আর এক পাহাড়ের নানা পার্থক্য ধরা পড়েছে। পাহাড়ের উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করে, ভূবিজ্ঞানীরা মোট পাঁচ রকমের পাহাড়ের কথা বলেছেন।

প্রথম ধরনের পাহাড়ের মধ্যে আছে হিমালয়, আলপস, রকিজ কিংবা আন্দিজের মতো বড়-বড় পাহাড়। এ-ধরনের পাহাড়ের নাম ফোল্ড মাউন্টেন বা ভঙ্গিল পর্বত। নাম শুনে মনে হতে পারে, এসব পাহাড়ের মধ্যে নির্ঘাত ভাঙাভাঙির কোনও ব্যাপার আছে। সত্যিই আছে। সমুদ্রের নীচে পলি জমে ক্রমে যে পাললিক শিলাস্তর (সেডিমেন্টারি রকস) গড়ে ওঠে, দামাল প্রকৃতির নানা শক্তির চাপে সেই শিলাস্তর ভাঁজ পড়ে ক্রমেই উ পাহাড়ের চেহারা নেয়। ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করে বল

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু দশটি পর্বতশৃঙ্গ

নাম	কোথায় রয়েছে	কতটা উঁ
মাউন্ট এভারেস্ট	নেপাল/তিব্বত	৮,৮৪৮ মি
গডউইন অস্টেন (কে ২)	জম্মু-কাশ্মীর	৮,৬১১ মি
কাঞ্চনজঙ্ঘা	নেপাল/সিকিম	৮,৫৯৪ মি
লোটসে	নেপাল	৮,৫১১ মি
মাকালু	নেপাল/তিব্বত	৮,৪৮১ মি
ধৌলাগিরি	নেপাল	৮,১৭২ মি
মান্‌সলু	নেপাল	৮,১৫৬ মি
চো ওয়ু	নেপাল	৮,১৫৩ মি
নাঙ্গা পর্বত	নেপাল	৮,১২৬ মি
অন্নপূর্ণা	নেপাল	৮,০৭৮ মি

দরকার। একটা বড় কাগজ হাতে নিয়ে, সেটাকে কয়েকবার ভাঁজ করতে করতে দেখা যায়, পাতলা কাগজটাই বার কয়েক ভাঁজের পরে বেশ খানিকটা মোটা হয়ে উঠেছে। অনেকটা এভাবেই বেশ কয়েকবার ভাঁজ পড়ে পাথরের স্তর মোটা আর উঁচু হয়ে ওঠে। তবে কাগজের ভাঁজের সঙ্গে একটা ব্যাপারে অমিল আছে। কাগজটা ভাঁজ করতে যেখানে মাত্র দু-তিন মিনিট লাগছে, সেখানে একটা ভঙ্গিল পর্বত তৈরি হতে দু-তিন কোটি বছরও লেগে যেতে পারে।

দ্বিতীয় ধরনের পাহাড় চ্যাতি-পর্বত (ব্লক মাউন্টেন), যার জন্ম চ্যাতির ফলে। সমতলভূমি থেকে কোনও পাথুরে অংশ ফাটল বরাবর ঠেলে বেরিয়ে এসে কিংবা নীচে বসে গিয়ে তৈরি হতে পারে এ ধরনের পাহাড়। গুজরাতের আরাবল্লী পর্বত কিংবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিয়েরা-নেভাদা পর্বত এই জাতের।

তৃতীয় জাতের পাহাড় গম্বুজ পর্বত (ডোম মাউন্টেন)। নামের মতো চেহারাও জমকালো, গম্বুজের মতো। এই গম্বুজ আকারের পাহাড়ের ঢাল কেন্দ্রবিন্দু থেকে সব দিকে ছড়ানো। আসামের কিছু-কিছু পাহাড় আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওজার্ক পাহাড় এই ধরনের।

চতুর্থ ধরনের পাহাড়ের জন্ম আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে। গলন্ত লাভা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে এই পাহাড় তৈরি হয়। তাই এই পাহাড়ের নাম ভলকানিক মাউন্টেন বা আগ্নেয়পর্বত। পশ্চিমবঙ্গ-বিহারের রাজমহল পাহাড়, পশ্চিম ভারতের ডেকান মালভূমি, ইতালির ভিসুভিয়াস কিংবা জাপানের ফুজিয়ামা পাহাড় এই জাতের।

এবার পাঁচ নম্বর পাহাড়ের কথা। উঁচু মালভূমি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানারকম প্রাকৃতিক শক্তি জল-হাওয়া-রোদ ইত্যাদির একটানা পিটুনিতে ক্ষয়ে যায়। এভাবেই হয় ক্ষয়জাত পাহাড়ের (রেসিডুয়াল মাউন্টেন) জন্ম। ছোটনাগপুর অঞ্চলের ছোট বড় নানারি বেশ কিছু পাহাড় কিংবা মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যপর্বত এই ক্ষয়জাত পর্বতের দলেই, সেকথা বলা চলে। কেন কীভাবে তৈরি হল পৃথিবীর পর্বতমালা, বিশেষত ভঙ্গিল পর্বতমালা, তা বোঝানোর জন্য ভূবিজ্ঞানীরা আমাদের উপহার দিয়েছেন বেশ কয়েকটি তত্ত্ব।

এরকমই এক-একটা তত্ত্বের নাম সংকোচন তত্ত্ব (কনট্রাকশন থিওরি)। এই তত্ত্বের সারকথা হল, জন্মের সময় পৃথিবী ছিল ফুটন্ত তরল গোল বলের মতো। ক্রমে সেই উত্তপ্ত গোলাকার তরল পিণ্ডটি ঠাণ্ডা হতে-হতে তার ওপরে তৈরি হল ফলের খোসার মতো ভূত্বক। ভূত্বক তৈরি হলেও, ভূত্বকের নীচে তরল শিলারাশির ঠাণ্ডা-হওয়া থামেনি। সেগুলি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ক্রমেই আকারে ছোট হয়ে আসছিল। এই সংকোচন বা ছোট হওয়ার ফলে বাইরের ভূত্বকে কুঁচকে গিয়ে ভাঁজ তৈরি হয়েছে।

আর-একটা তত্ত্ব ভূবিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনারের। ওই জার্মান ভদ্রলোকের নেশা ছিল মানচিত্র দেখা। রাতদিন মানচিত্র দেখতে দেখতে একদিন মনে হল, পৃথিবীর মহাদেশগুলি বোধহয় আগে একসঙ্গে জোড়া ছিল। পরে ছিঁড়েখুঁড়ে খণ্ড খণ্ড অংশগুলি অর্থাৎ মহাদেশগুলি উলটোদিকে চলতে চলতে আজকের চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে। মানচিত্র খুলে একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, আফ্রিকার পশ্চিম তটের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব তট কিংবা উত্তর আমেরিকার পূর্ব তট ও ইউরোপের পশ্চিম তটের কী আশ্চর্য মিল। সে যাই হোক, ওয়েগনারের মতে, পৃথিবীর সব মহাদেশই আগে একটি একক অখণ্ড মহাদেশ ছিল। সেই প্রাচীন মহাদেশের নাম ছিল প্যানজিয়া। ১৯১২ সালে আলফ্রেড ওয়েগনার বললেন, খুব সম্ভবত, আজ থেকে ১৭-১৮ কোটি বছর আগে মেসোজয়িক যুগের গোড়ার দিকে প্যানজিয়া মহাদেশ ভেঙে গিয়ে চলতে শুরু করে। তবে চলার গতি খুবই কম। বছরে কয়েক ইঞ্চির বেশি নয়। সেই সময় প্যানজিয়া মহাদেশের ভেতরে টেথিস নামে একটা লম্বা চেহারার সমুদ্র ছিল। ওদিকে যেমন আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ছিঁড়ে দূরে চলে যাচ্ছিল, এদিকে তেমনি টেথিস সমুদ্রের দু'পাশের দুটি মহাদেশের বিপরীতমুখী গতি ছিল পরস্পরের দিকে। দু'পাশ থেকে দুটি বিপরীত দিকে চলমান মহাদেশের চাপের ফলে টেথিস সাগরের পলি থেকেই তৈরি হয়েছে দীর্ঘ আল্পস ও হিমালয়ের মতো ভঙ্গিল পর্বতমালা। এই পাহাড়গুলি যে একদিন সমুদ্রের নীচে ছিল, তার মোক্ষম প্রমাণ, এই পাহাড়গুলির মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে। আর আজকের ভূমধ্যসাগর বোধহয় সেই অতীতের টেথিস সাগরের স্মৃতি বহন করছে।

আর-একটা কথা, পাহাড় কিন্তু শুধু মহাদেশের ওপরেই নেই, রয়েছে নীল সমুদ্রের জলের নীচেও। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সমুদ্রতলদেশের মানচিত্র তৈরি করে দেখা গেছে, নীল সাগরের ঢেউয়ের তলায় লুকিয়ে আছে আর-একটা পাহাড়ের দেশ, যার কথা বহুদিন ছিল আমাদের অগোচরে।

আমি বলেছিলাম ওই 'ফ্রে'-সাহেবকে। বলে সামনের চূড়াটার দিকে হাত দেখালেন। আমি অবাক, ওটা তো পাহাড়, সাহেব কোথায়? তখন তেনজিং-এর মুখে ঘটনা জানা গেল।

"ফ্রে একজন খুব ওস্তাদ সুইসসাহেব ছিলেন। কয়েক বছর আগে ১৯৫১ সালে একদিন ফ্রে-সাহেব, আমি ও শেরপা আংদাওয়া ওই চূড়াটায় উঠেছিলাম। ফ্রে ছিলেন সবার সামনে, উঁচুতে। বরফ শক্ত ছিল বলে আমি জুতোর তলায় কাঁটা লাগিয়ে নিলাম। সাহেবকে বললাম। সাহেব বললেন, লাগবে না।

"উঠছিলাম ভাল। তবে চড়াই খুব খাড়া, হঠাৎ সাহেব পড়ে গেলেন। কেমন করে জানি না। দেখলাম, সাহেব গড়াতে গড়াতে পড়ছেন আমারই ঘাড়ের ওপর যেন। কাছাকাছি আসতেই দম দেওয়া যন্ত্রের মতো আমি লাফিয়ে সাহেবকে ধরতে গেলাম। পারলাম না। সবেগে আমার একটা আঙুল ভেঙে বেরিয়ে গেল। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে প্রায় দু'হাজার ফুট নীচে আছড়ে গিয়ে পড়লেন। আমি শুধু অবাক হয়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখলাম। তাড়াতাড়ি নেমে এসে সাহেবকে তুললাম। কিন্তু সাহেব তখন তালগোল-পাকানো প্রাণহীন এক মাংসপিণ্ড।

"সাহেবকে ওই পাহাড়ের গোড়ায় পুঁতে রেখেছি, আজও সেখানে শুয়ে আছেন। আর সাহেবের নামেই চূড়াটার নাম হয়েছে ফ্রে পিক। আগে নাম ছিল 'কাঙ চূড়া'।"

কাহিনী শেষ করে তেনজিং জুতোর তলায় কাঁটা বেঁধে নিলেন।

১৯৬০-এর নন্দাঘুন্টি অভিযান থেকে ১৯৮৪-র কামেট অভিযান পর্যন্ত বেশ কয়েকটা বড় অভিযানের সুবাদে তেনজিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। ১৯৬৬ সালে আমাদের মানা অভিযানে বিরাট এক দুর্ঘটনায় চারজন শেরপা ভীষণভাবে জখম হয়েছিল। এতে বিচলিত হয়ে তিনি ছুটে এসেছিলেন আনন্দবাজার অফিসে আমাদের সভাপতি অশোককুমার সরকারের সঙ্গে দেখা করতে। শেরপাদের ভালমন্দ নিয়ে অনেক আলোচনা হল দুজনের মধ্যে। তখন তেনজিং-এর আর-এক মহত্ত্ব দেখলাম। নিজে বড় হয়েও দরিদ্র শেরপাদের কথা ভোলেননি।

নেপালিতে একটা কথা আছে "সানো সানুমারোহৎ।" মানে এক পর্বতচূড়া থেকে আর-এক পর্বতচূড়ায় আরোহণ। মর্ত্যের পাহাড়-চূড়া শেষ করে গত ৯ মে ১৯৮৬ তারিখে তেনজিং বুঝি স্বর্গলোকের পর্বতে আরোহণ করতে চলে গেলেন।

প্রেরণা-জাগানো আর ঘুম-কেড়ে-নেওয়া গল্পের বই

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের

প্রেরণা-জাগানো কিশোর-গ্রন্থ

দুঃসাহসিক অভিযান

দাম ১৫·০০

শুরু সেই আলেকজান্ডার দি গ্রেটের অভিযানেরও আগে, আদ্যিকালের অভিযান থেকে। আর শেষ এই সেদিনের এভারেস্ট অভিযানের কাহিনী দিয়ে। মধ্যে রয়েছে এই পৃথিবীর বুকের যাবতীয় স্মরণীয় অভিযানের গল্পপ্রতিম বিবরণ। বাংলা ভাষাতেই নতুন স্বাদের বই, 'দুঃসাহসিক অভিযান'। মানুষের অভিযানের নেশা আজও অব্যাহত। একটা সময় ছিল, যখন মানুষ একা-একা নিজের সীমানা ছেড়ে বেরুতে শুরু করেছিল। সেই দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর অভিযান গোটা মানবসভ্যতাকেই করেছে উপকৃত। সেইসব অভিযানের বর্ণনা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সেইসব গল্পই এই বইতে উপহার দিয়েছেন কবি-প্রাবন্ধিক সাধনা মুখোপাধ্যায়। তথ্যসংগ্রহে কার্পণ্য করেননি তিনি, লিখেছেনও সুন্দর, ঝকঝকে ভাষায়। 'জানা-অজানা' সিরিজের মতই এ-বইও একাধারে স্বাদু এবং শিক্ষাপ্রদ।

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য কিশোর-গ্রন্থ : জানা-অজানা (১) ৮·০০ জানা-অজানা (২) ১৫·০০

ননীগোপাল চক্রবর্তীর

ছোট্টদের মন-কেড়ে-নেওয়া ঘুম-কেড়ে-নেওয়া গল্পের বই

ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি

দাম ১০·০০

ফুড়ুৎ গুড়গুড়িকে কে না চেনে ? সেই ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি, ছোটদের ভোলাবার জন্য যে-কিনা তৈরি করেছিল এক আজব গল্প, যে-গল্পের শেষ নেই।

সেই যে, ধানক্ষেতে জালের মধ্যে আটকে পড়েছিল পাখির ঝাঁক। বন্ধু ইঁদুর দাঁত দিয়ে কেটে দিল জাল। ফুটো জাল দিয়ে একটার পর একটা পাখি কেবলই উড়ে যায় ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে। পাখির ফুড়ুৎ ওড়া শেষ হয় না। গল্পও ফুরোয় না।

সেই থেকেই তো গল্প-বলিয়ের নাম হল ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি। সেই ফুড়ুৎ গুড়গুড়ির ঝুলিতেই দারুণ দারুণ সব গল্প জুড়ে দিয়ে এই বই। নানান দেশের গল্প। নানান স্বাদের গল্প। ছোটদের ঘুম কেড়ে নেবে। মন কেড়ে নেবে। কেড়ে নেবে চোখও। কেননা, প্রতি গল্পের সঙ্গে দেবাশিস দেবের ছবি এবং তাক-লাগানো মলাট।

ননীগোপাল চক্রবর্তীর অন্যান্য বই : চরকাবুড়ি ৬·০০ যাদুঘরে চলো যাই ৬·০০ পীর ফকিরের আস্তানায় ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

জোকার

তারাপদ রায়

যে-বছর বড় বন্যা হয়েছিল, সে-বছরেই শীতের সময় আমাদের শহরে একটা সার্কাস-পার্টি এসেছিল। সেই সার্কাসের যে জোকার সে নানারকম মজার কাণ্ড করে আর মজার খেলা দেখিয়ে সমস্ত শহরবাসীর হৃদয় জয় করেছিল।

সেই শীতকালেই আমাদের পিছনের বাড়ির লোকেরা বদলি হয়ে কোথায় চলে যায়। তখন তাদের পোষা হুলো বেড়ালটা আমাদের বাসায় চলে আসে। হুলো বেড়ালটার চেহারা, চালচলনে কোথায় যেন একটা সার্কাসের ওই জোকারের আদল ছিল। আসলে তার মুখটা ছিল জোকারটার মতো সাদা-কালো, সিঁড়ির উপরে বসে বেড়ালটা যখন ইতিউতি চোখ মটকিয়ে তাকাত, একেবারে হুবহু সেই জোকার। ফলে এই হুলোটার 'জোকার' নামকরণ করতে আমাদের খুব ভাবনাচিন্তা করতে হয়নি।

বেড়াল হিসেবে জোকারের স্বভাবচরিত্র মোটামুটি ভালই ছিল। হুলোরা সাধারণত যেরকম হিংস্র হয়, সে তা ছিল না। সে ছিল নির্বিকার, নির্বিরোধ স্বভাবের।

চুরি-জোচ্চুরির ধাত ছিল না। এঁটোকাঁটা যা জুটত তাই খেয়ে থাকত।

জোকার অনেক সময় এসে আমাদের পায়ে মাথা ঘষত। আমার ঠাকুমার তাতে খুব আপত্তি ছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল, ওইভাবে বেড়ালেরা নাকি মানুষের আয়ু চুরি করে নিজের আয়ু বাড়িয়ে নেয়। আমরা সে-কথা খুব গ্রাহ্য করিনি। জোকার পায়ে মাথা ঘষলে আমাদের বেশ ভালই লাগত। আমরা কখনও কখনও তাকে কোলেও তুলে নিতাম। সে আহ্লাদে ঘড়-ঘড় করত। রেডিও খুললে, স্টেশন না ধরতে পারলে যে রকম ঘড়-ঘড় আওয়াজ বেরোয় ঠিক সেইরকম শব্দ বেরোত আহ্লাদি জোকারের ভেতর থেকে।

এই জোকার একবার আমার ছোট ভাই বিজনকে কামড়ে দেয়। সে এক আশ্চর্য ঘটনা। বিজন চিরদিনই সাদাসিধে, সরল মানুষ। ইস্কুলে তাকে বেড়ালের উপর রচনা লিখতে দিয়েছিল। বিজন কি ভেবেছিল কে জানে। বেড়ালের উপর রচনা সুতরাং বেড়ালের গায়ের উপরেই লিখতে হবে, এই রকম ধরে নিয়েছিল বোধহয়।

নিরীহ জোকারকে ধরে তাকে উপুড় করে তার লোমহীন পেটের উপরে বিজন পেনসিল দিয়ে রচনা লিখছিল : 'বিড়াল খুব ভাল। আমি বিড়াল খুব ভালবাসি। বিড়ালও আমাকে খুব ভাল...'

এই পর্যন্ত লেখার পর হঠাৎ জোকার খেপে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বিজনের হাতে কামড়ে দেয়। বিজনের ডান হাতের কবজিতে এখনও সেই কামড়ের চিহ্ন আছে।

জানা-অজানা

তিরিশ হাজার রকমের মাকড়সা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

মাকড়সাকে অনেক সময় কীট বা পতঙ্গ বলে মনে করা হলেও, আসলে কিন্তু মাকড়সা কীট বা পতঙ্গ কোনওটাই নয়। তবে কীট-পতঙ্গের সঙ্গে মাকড়সার কিছু মিল আছে। মাকড়সার আটটা পা, কিন্তু কীট-পতঙ্গের পায়ের সংখ্যা ছ'টি।

কোনও-কোনও মাকড়সার আবার চোখের সংখ্যাও আটটি।

এখনও পর্যন্ত ৩০,০০০ রকমের মাকড়সা দেখা গেছে এবং মাকড়সার প্রজাতির সংখ্যা সম্ভবত তার চেয়েও অনেক বেশি। যেখানেই শিকার পাওয়া যায়, মাকড়সা সেইখানেই বাসা বাঁধে। পেটের মধ্যে যে রেশম-গ্রন্থি আছে তারই সাহায্যে মাকড়সা জ্যামিতিক প্যাটার্নের জাল বোনে। কোনও-কোনও মাকড়সার জাল অনুপাতে সমান মোটা একটা স্টিলের তারের চেয়েও শক্ত এবং অনেক দূর পর্যন্ত তা টেনে লম্বা করা যায়।

বোলাস মাকড়সা আবার জ্যামিতিক প্যাটার্নের জাল না বুনে, রেশম-গ্রন্থি দিয়ে একটা লম্বা সুতো তৈরি করে ঝুলিয়ে রাখে। এই সুতোয় এক বিন্দু খুব চটচটে আঠা লাগানো থাকে। এগিয়ে আসা শিকারের দিকে এই সুতো ছুঁড়ে দিয়ে মাকড়সা শিকারকে আটকে ফেলে।

পুরুষ মাকড়সা মেয়ে মাকড়সার চেয়ে আকারে অনেক ছোট। পুরুষ মাকড়সা জালে এলেই মেয়ে মাকড়সা অনেক সময় তাকে

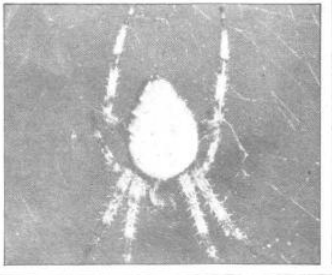

শিকার ভেবে খেয়ে ফেলে। এই জন্যে পুরুষ মাকড়সা অনেক সময় জালে বিশেষ ধরনের একটা কম্পন ফেলে জানিয়ে দেয় যে, সে শিকার নয়। অনেক সময় সে আবার মেয়ে মাকড়সাকে খাদ্য হিসেবে কোনও কীট-পতঙ্গ উপহার দিয়ে জালে প্রবেশ করে।

সব মাকড়সা অবশ্য জাল তৈরি করে না। কাঁকড়া-মাকড়সা রঙবদল করতে পারে। ফুলের মধ্যে ঢুকে বসে, ফুলের মতো রঙ ধরে, সামনের পা দিয়ে মৌমাছি আর প্রজাপতিকে ধরে ফেলে। তারপর বিষদাঁত দিয়ে শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেয়। শিকার অসাড় হয়ে পড়লে মাকড়সা শিকারের শরীরের সমস্ত তরল পদার্থ চুষে নেয়।

নেকড়ে-মাকড়সা আবার ঘাপটি মেরে বসে থেকে শিকারের গতিবিধি লক্ষ করে। অতর্কিতে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড়ে বিষদাঁত ফুটিয়ে দেয়। এইভাবে শিকারকে অসাড় করে মেরে ফেলে।

কী খাব, কী খাব না

কখন কী খাব এটা একটা ভাববার কথা। আমরা তো সকালে ব্রেকফাস্ট করি, দুপুরবেলায় লাঞ্চ। বিকেলবেলায় চা আর রাত্তিরবেলায় ডিনার। এই তো! কেউ মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি আমিষ খাবার খান, কেউ আবার নিরামিষ। এই ধরনের খাওয়াই তো ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি।

খাওয়া-দাওয়ার রীতিনীতি নিয়ে নানারকম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। সবচেয়ে মজার তথ্য পাওয়া গেছে বিখ্যাত রাশিয়ান খাদ্যবিশারদ ডাঃ সালগানিকের সমীক্ষায়। তিনি সারা পৃথিবীর যত আদিবাসী আছে, তাদের খাদ্যপ্রণালী বিচার করে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আদিবাসীরা সূর্য ওঠবার আগে এবং সূর্যাস্তের পরে পেট ভরে প্রধান খাদ্য খায়। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের চাষিরা

ভোরবেলায় স্নান করে বেয়ানে-ভাত বা ফ্যান-ভাত একটু তেল-লঙ্কা দিয়ে খেয়ে মাঠে চলে যায় গোরু নিয়ে, সারাদিন সেখানে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। দুপুরবেলায় খায় মুড়ি, দু'টুকরো হাতে-করা রুটি অথবা একটু ভাত। সন্ধের পর বাড়িতে যা জোটে পেট ভরে খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

দক্ষিণভারতের আদিবাসী ভোরবেলায় ফ্যান-ভাতের বদলে খায় পান্তা ভাত। তার নাম কাঞ্জি। খানিকটা তেল, তেঁতুল, লঙ্কা দিয়ে মেখে একথালা পান্তা ভাত খেয়ে চাষি মাঠে চলে যায়। দুপুরের ও রাতে ওই একই রকমের খাবার পেট ভরে খেয়ে শুয়েপড়ে। ভারতের বাইরেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আদিবাসীদের খাওয়া ওই এক সময়ে। খাওয়া হয়তো আলাদা। কোথাও রুটি খায়, কোথাও ঝলসানো মাংস।

একটা জিনিস লক্ষ করলে অবাক হতে হয়। আদিবাসীরা তো পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে কিছুই খায় না, কিন্তু তাদের শারীরিক শক্তি, আমরা যারা শহরে বাস করি তাদের চেয়ে অনেক বেশি। কেন বলতে পারো? সালগানিক বলেছেন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের তাপ যত বাড়ে, হজমের গোলমালও তত বাড়ে। সেইজন্য দুপুরবেলায় খুব পেট ভরে খেলে খাবার হজম হতে চায় না। আর শরীরে একটা অস্বস্তি হয়। সেইজন্য সূর্য ওঠার আগে আর সূর্য ডোবার পরে পেট ভরে খেলে শরীর ঝরঝরে তরতরে থাকে।

টিফিনের সময় পেট ভরে না খেতে বলার কারণ হল, পেট ভরে খেলে, খাদ্যের হজমের জন্য অন্ত্রে রক্তসঞ্চালন বাড়ে। যখন অন্ত্রে বেশি রক্ত এসে যায়, তখন মস্তিষ্কে কম রক্ত যায়। মস্তিষ্কে কম রক্ত থাকার জন্য টেম্পোরারি অ্যানিমিয়া অভ ব্রেন হয়, সেইজন্য ঘুম এসে যায়। আর মস্তিষ্কের কোষ তখন কোনও কথা মনে রাখতে পারে না। আবার দেখবে রাত্রিবেলায় যদি তোমার খুব খিদে পায়, তা হলে ঘুম হবে না। ঘুম না আসার জন্য ছটফট করবে অথবা পায়চারি করবে। তার কারণ তখন মস্তিষ্কেও প্রবলভাবে রক্ত-চলাচল করছে। এই সময় হালকা কিছু খেয়ে নিলে দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনা থেকে ঘুম এসে গেছে।

কী খাব আর কী খাব না, এ বিষয়ে আমাদের দ্বন্দ্ব লেগে যায়। আমরা তো প্রায়

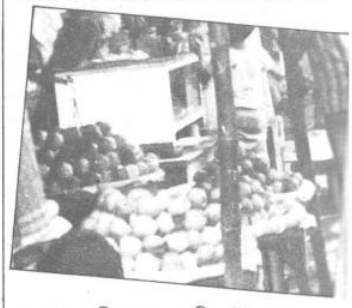

সব সময়ে বিজ্ঞাপন দেখছি, এটা সবচেয়ে ভাল খাবার, ওটা সবচেয়ে পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু সবাই কি কিনে খেতে পারে?

আমাদের দেশে যেসব উদ্ভিদ হয়, তার মধ্যে যা ভিটামিন এবং পুষ্টিকর পদার্থ আছে, তার অল্প অংশই হয়তো এইসব রঙিন টিনে পাওয়া যায়। আমরা ভাত খাব, ডাল খাব, যে সময়ে যে তরকারি হবে তা খাব। মাছ, মাংস, ডিম যেটা পাব, সেটা খাব। যারা এসব খায় না, সয়াবিনের তরকারি খাবে, ছোলার ডালের ধোঁকার-তরকারি খাবে, ডুমুর খাবে, কাঁচকলা খাবে, করলা-উচ্ছে নিমপাতা-ভাজা খাবে, ছানার তরকারি খাবে, আর ইচ্ছে হলে বাড়িতে তৈরি মিষ্টি খাবে।

সালগানিক বলেছেন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের চর্বি খাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। এ-বিষয়ে আমাদের সাবধান হতে হবে। অযথা বেশি স্নেহপদার্থ খাব না।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

রোদবৃষ্টির সাথী

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন

সাধারণ কাটাছড়ায় অসাধারণ কাজ দেয়

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস

বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপটিক গুণ ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

এটি প্রসাধন সামগ্রী নয়

Response

জীবজগতের প্রগতি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

শেষ অবধি ম্যামথদের দিনও শেষ হল। অন্যান্য অধিকাংশ প্রজাতির মতোই এই ম্যামথরাও হল ক্রমবিবর্তনের আর-একটি কানাগলি, জীবজগতের আর-একটি লুপ্ত ধারা। ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে :

যেহেতু, এক বিশেষ পরিপার্শ্বে
করে এসেছে বাস সে,
কেবলমাত্র বিশেষ একটি ধাঁচে
যেহেতু সে বাঁচে—
বদলে গেল যেই সে পরিস্থিতি
ঘটল সেই প্রজাতিরও ইতি।
কেননা, তার সন্তানদের মাঝে
স্বভাবের সেই বদল ঘটল না যে—
নতুন রকম অবস্থায় পড়ে
টিকে থাকতে পারত যার জোরে।

এইভাবে অধিকাংশ প্রাণী, এমনকী জীবজগতের রাজা বলতে প্রায় সবাই এই রকমের এক-একটি বিলুপ্ত প্রজাতি।

যেমন, ডাইনোসরের দল। একসময়ে তারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে আর অন্যান্য প্রাণীদের ভয়ে তটস্থ করে সারা দুনিয়ায় রাজ্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু গরম স্যাঁতসেঁতে জঙ্গলের প্রাচুর্যে ভরা অনায়াস জীবনযাত্রারই তারা উপযুক্ত ছিল। বরফের ঢল নেমে এলে আর খাল-বিল শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করলে ডাইনোসরদের হল সমূহ বিপদ। স্বভাবের গুণে যে বিশেষ ধাঁচের জীবনযাত্রায় তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, সেটা বদলে যেতে বেজায় আতান্তরে পড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জীবপ্রকৃতির কানাগলিতে তাদের দফারফা হল। জীবজগতের যারা রাজা, তাদের মধ্যে সব সময়ই থাকত ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় কয়েকটি প্রজাতি। তারা জীবজগতের নতুন রাজা হওয়ার উপযোগী প্রাণীর জন্ম দিত।

এইভাবে এসেছে কিছু খোলওয়ালা প্রাণী থেকে কাঁটাওয়ালা মাছ ; কিছু কাঁটাওয়ালা মাছ থেকে কানকো-পাখনাওয়ালা মাছ ; কিছু কানকো-পাখনাওয়ালা মাছ থেকে উভচর ; কিছু উভচর থেকে সরীসৃপ ; কিছু সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণী ; কিছু স্তন্যপায়ী থেকে বানর ; কিছু বানর থেকে মানুষ।

এইভাবে ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে জীবের দল ধাপে-ধাপে ওপরে উঠেছে। যেসব প্রাণী একটা বিশেষ ধরনের অবস্থায় ছাড়া বাঁচতে পারে না, ক্রমবিবর্তনের কানাগলিতে তারা শেষ হল। কিন্তু ক্রমবিবর্তনের সিঁড়িভাঙা রাস্তায় এমন সব প্রাণী দেখা দিল, যাদের সর্বাঙ্গীণ যোগ্যতা থাকায় প্রকৃতির ফেরে পড়েও নিজেদের তারা টিকিয়ে রাখতে পারল।

প্রকৃতির হাত মুচড়ে জীবজগৎ ধাপে-ধাপে কীভাবে এই স্বাধীনতা আদায় করেছে, নীচে তার কিছু বিশিষ্ট নমুনা দেওয়া হল :

(১) **অমেরুদণ্ডী** প্রাণীরা ছিল একেবারেই জলের হাত ধরা। জলের তাপ আর রাসায়নিক যখন যেমন এইসব প্রাণীর টিসু বা কলা সেইমতো বদলাত। এই পরিবর্তনের মাত্রা যখন খুব বেড়ে গেল, তখন আর এরা টিকে থাকতে পারল না।

(২) **কাঁটাওয়ালা মাছের** একটা সুবিধে ছিল এই যে, জলের রাসায়নিকের বদল হলেও এদের টিসুর রাসায়নিক যেমন তেমনটি থাকত। কিন্তু এ-সত্ত্বেও তাপমাত্রার হেরফের হলে কিংবা জল ছেড়ে বাইরে এলে এরা আর বাঁচত না।

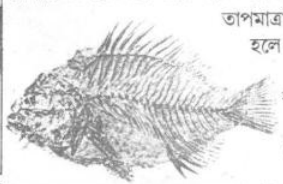

(৩) **উভচর** প্রাণীরা জল ছেড়ে ডাঙায় এসে বহুক্ষণ থাকতে পারত ; এদের আছে ফুসফুস আর ঠ্যাং। কিন্তু শীত-গ্রীষ্মের আধিক্য এরাও সইতে পারে না। তা ছাড়া ডিম পাড়তে এদের জলে যেতে হয়।

(৪) **সরীসৃপের** দল জলের বাঁধন থেকে ছিল আরও বেশি মুক্ত। সারাক্ষণ ডাঙাতেই তারা থাকতে পারত ; ডাঙাতেই তারা ডিম পাড়ত। তবু তাদের অনুকূলে জলবায়ু আর তাপমানের দরকার হত।

(৫) **স্তন্যপায়ী** প্রাণীদের সুবিধে এই যে, আবহাওয়া যেমনই হোক, তাদের দেহের তাপমাত্রা সমান থাকে ; মাতৃদেহের ভেতরেই তাদের বাচ্চা ফোটে। কিন্তু তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির একমাত্র ভরসা প্রকৃতির দয়ার দান। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর তাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করে। কাজেই স্তন্যপায়ীরা পুরোপুরি স্বাধীন নয়।

(৬) **মানুষ** হল একমাত্র জীব, পারিপার্শ্বিক থেকে যে স্বাধীন। তার ওপর, নিজের মতো করে সে তার পারিপার্শ্বিককে ইচ্ছেমতো বদলে নিতে পারে। প্রকৃতির বন্ধন থেকে মানুষ এইভাবে নিজেকে ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায় মুক্ত করে নেয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কৃত্রিম মণিরত্ন

এ পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা গেছে অনেক মণিরত্ন। যেমন, হিরে, চুনি, পান্না, নীলকান্তমণি ইত্যাদি। বাকি ছিল শুধু একটিই, জেড পাথর বা জেডাইট। সম্প্রতি রসায়নাগারে এই মূল্যবান মণিটিকে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন নিউইয়র্ক-এর 'জেনারেল ইলেকট্রিক রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার'-এর দুই বিজ্ঞানী। প্রথমজন অজৈব রসায়নবিদ রবার্ট সি· দভ্রিস, আর দ্বিতীয়জন উচ্চচাপ গবেষণা বিশেষজ্ঞ জেমস্ এফ· ফ্লাইশার। এর আগে কৃত্রিম উপায়ে জেডাইট যে একেবারে তৈরি করা যায়নি তা নয়। কিন্তু তার সর্বোচ্চ মাপ ছিল বালির কণার মতো। দভ্রিস ও ফ্লাইশারই প্রথম উন্নত মানের এবং বড় মাপের জেডাইট তৈরি করতে পেরেছেন। তাঁদের তৈরি পাথর কেটে, পালিশ করে, দিব্যি আসল মণির মতো ঝকঝকে চেহারা দেওয়া যায়।

কৃত্রিম জেডাইট তৈরি করতে তাঁরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা সংক্ষেপে হল এই রকম : সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকন অক্সাইডের গুঁড়োর মিশ্রণকে একটি চুল্লিতে রেখে প্রায় ১৪৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপে গলিত তরলকে ঠাণ্ডা করলে স্বচ্ছ একটি কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়। এই পদার্থকে গুঁড়ো করে, বুড়ো আঙুলের

মাপের একটি ছোট ফার্নেসে ১৪৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রাতেই বিশুদ্ধ করা হয়। একই সঙ্গে হিরে তৈরির একটি চাপযন্ত্র দিয়ে ওই পদার্থের ওপরে বায়ুমণ্ডলের চাপের ৩০,০০০ গুণ চাপ দেওয়া হয়। তাতেই তৈরি হয় কৃত্রিম সাদা জেডাইট। মাপ : সিকি ইঞ্চি পুরু, আধ ইঞ্চি লম্বা। আর আকার চোঙের মতো। অন্যান্য রঙের জেডাইট পেতে গেলে প্রথম বারের মিশ্রণের সঙ্গে বিভিন্ন খনিজ মেশাতে হয়। যেমন সবুজ পাথর পেতে হলে মেশাতে হবে ক্রোমিয়াম। ছবিতে দুই বিজ্ঞানীকে কৃত্রিম জেডাইট তৈরি করতে দেখা যাচ্ছে।

সবচেয়ে তেতো জিনিস

এতদিন জানা ছিল কুইনিন হল সবচেয়ে তেতো। ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে যাঁরা ওই বস্তুটি সেবন করেছেন, তাঁরা অন্তত এ-বিষয়ে একমত হবেন আশা করি। কিন্তু ভাবা যায়, ডিনেটোনিয়াম স্যাকারাইড নামের একটি পদার্থ কুইনিনের চেয়েও তিন হাজার গুণ তেতো ! দশ কোটি ভাগ জলে এক ভাগ ডিনেটোনিয়াম স্যাকারাইড মিশিয়ে লঘু দ্রবণ তৈরি করলেও তার তেতো স্বাদ টের পাওয়া যায়।

রাসায়নিকটির এই তেতো গুণকে কাজে লাগিয়ে বিষাক্ত কীটনাশক থেকে ছোট-ছোট বাচ্চাদের রক্ষা করার কথা ভাবা হচ্ছে। কীটনাশকের সঙ্গে ডিনেটোনিয়াম স্যাকারাইড সামান্য পরিমাণে মিশিয়ে দিলে বাড়িতে ছড়ানো কীটনাশক বাচ্চারা আর বেশি মুখে দিতে পারবে না। ওই তেতো স্বাদই তাদের দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবে। এই বস্তুটি আবিষ্কার করেছেন নিউ ইয়র্কের প্লেইনভিউ-এর 'এটমার্জিক কেমিটাল্স কপোরেশন'-এর রসায়নবিদরা।

পর্দা ছুঁলেই চিনে ভাষা

পরিভাষায় এই যন্ত্রগুলোকে বলা হয় 'টাচ স্ক্রিন ওয়ার্ড প্রসেসর'। 'টাচ স্ক্রিন', অর্থাৎ, টিভি-পর্দার বিশেষ অংশে আঙুল ছোঁয়ালেই পর্দায় অক্ষর ফুটে উঠবে। প্রথাগত বোতাম টেপাটিপির বদলেই এই আধুনিক ব্যবস্থা। ইংরেজি ওয়ার্ড প্রসেসরে মাত্র ছাব্বিশটি বর্ণ প্রয়োজন। কিন্তু চিনে ভাষায় তো বর্ণমালা নেই। বরং রয়েছে প্রতি শব্দের বা বাক্যাংশের উপযুক্ত 'ছবি'। অনেক রেখাকে বিশেষভাবে সাজিয়ে তবেই তৈরি করা যায় এক-একটি লিপি-চিহ্ন। চিনে ভাষায় এরকম অর্থবহ লিপিচিহ্ন রয়েছে দশ হাজারেরও বেশি। সুতরাং চিনে ভাষার ওয়ার্ড প্রসেসর বা কম্পিউটারচালিত লিপিকার তৈরির সমস্যাও ছিল প্রচুর। সম্প্রতি আমেরিকার 'ইনটেক সিস্টেমস্' সমস্ত সমস্যার সমাধা করে একটি 'চাইনিজ ওয়ার্ড প্রসেসর' তৈরি করেছেন। এই যন্ত্রে তেরো হাজার পর্যন্ত চিনা লিপি তৈরি করা যাবে, তাদের মধ্যে খুশিমতো হেরফের ঘটানো যাবে, আর পছন্দমতো বিভিন্ন মাপে ছাপানোও যাবে সেই লেখা। যন্ত্রটির দাম ধার্য হয়েছে পাঁচ হাজার ডলার।

মহাকাশে খুশিমতো ভ্রমণ

হ্যাঁ, এইরকম ভ্রমণ সম্ভব হয়েছে 'ম্যানড্ ম্যানোভারিং ইউনিট' নামে একটি আধুনিক যান আবিষ্কারের ফলে। একজন মহাকাশচারীর উপযোগী এই মহাকাশযানকে বিদ্যুৎ-শক্তি জোগায় একজোড়া ১৬·৮ ভোল্টের জিঙ্ক-সিলভার অক্সাইড ব্যাটারি। এক-একটি ব্যাটারি ৭৫২ ওয়াট-ঘণ্টা পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। তবে যানটিকে চলার শক্তি দেয় নাইট্রোজেন গ্যাস, অনেকটা রকেটের মতো। দুটি ব্যাটারির বিদ্যুৎ-শক্তি মোট ছ' ঘণ্টা মহাকাশ-ভ্রমণের রসদ জোগাতে পারে। ১৯৮৪ সালের 'চ্যালেঞ্জার' মহাকাশ-ফেরি অভিযানের সময় যানটিকে প্রথম পরীক্ষা করে দেখা হয়। পরীক্ষা করেন মহাকাশচারী রবার্ট স্টুয়ার্ট। সব শেষে ম্যানড্ ম্যানোভারিং ইউনিটের সবচেয়ে চমক লাগানো দিকটির কথা বলা যাক : এটা কিন্তু মোটেই গতানুগতিক মহাকাশযানের মতো দেখতে নয়। এর চেহারা অনেকটা পিঠে বাঁধা রুকস্যাকের মতো, তবে মাপে কিছুটা বড়। দু'পাশে রয়েছে চেয়ারের মতো হাতল আর গতি ও দিক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি। ছবিতে রবার্ট স্টুয়ার্টকেই দেখা যাচ্ছে, মহাকাশ-ভ্রমণে ব্যস্ত।

অনুসন্ধানী

হাঁসজারুর মতোই 'জোড়াতালি জন্তু'

অস্ট্রেলিয়ার প্লাটিপাস

সুব্রত ঘোষ

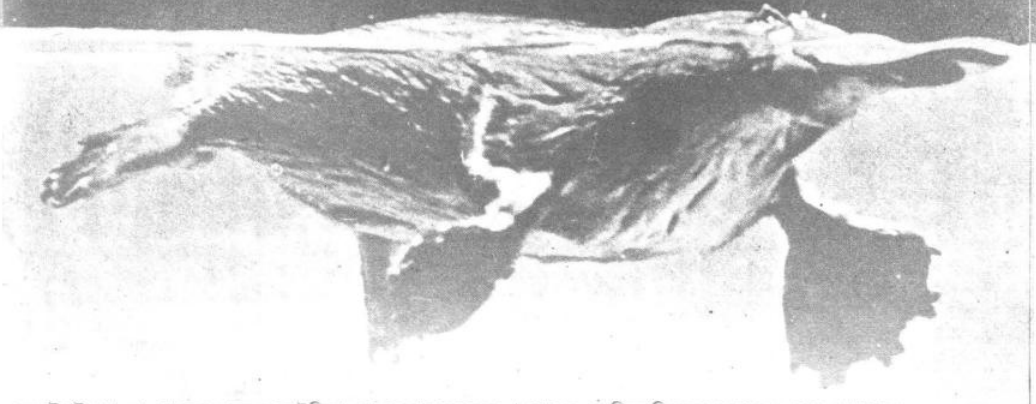

ঘটনাটা ১৯০২ সালের। সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে জাহাজে করে এসে পৌঁছল একটি বড় কাঠের বাক্স। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা দিল দারুণ উত্তেজনা। প্রাণিবিজ্ঞানীদের মধ্যে তো একেবারে হুলুস্থুলু পড়ে গেল। নিউ সাউথ ওয়েলসের গভর্নর জেমস হান্টার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জন্য মশলা-মাখানো, কোহলে-ডোবানো যে দুটি মৃত প্রাণী পাঠিয়েছেন তা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বাইরে কেউ কখনও দেখেইনি। প্রাণী দুটির আকার, আকৃতি, চেহারা প্রাণিবিজ্ঞানীদের যেন একটা কুইজ প্রতিযোগিতায় শামিল করে দিল। নানান প্রশ্ন, নানান সংশয় দেখা দিল প্রাণী দুটিকে নিয়ে।

এই ঘটনার কয়েক বছর আগে অবশ্য এই প্রাণীদেরই চামড়া পাঠানো হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া থেকে। তারও কিছুদিন আগে, ১৭৯৭ সালে, সামরিক বাহিনীর ডেভিড কলিন্স নামে এক অফিসার সর্বপ্রথম এদের সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখে পাঠান। কলিন্স নিউ সাউথ ওয়েলসের হকসবেরি নদীর কাছে এদের দেখেছিলেন। তাঁর সেই বর্ণনা প্রাণিবিজ্ঞানী মহলে নানান ধন্দের সৃষ্টি করেছিল। এবার একেবারে আস্ত দুটি প্রাণী চোখে দেখে সংশয়ের সঙ্গে মিশে গেল বিস্ময়।

'অস্বাভাবিক', 'দুষ্ট দনুজ', 'অবাস্তব অতিদানব', 'কিম্ভূতকিমাকার জোড়াতালি জন্তু'—এই ধরনের নানান মন্তব্য প্রকাশ পেতে থাকল। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের এবং উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে প্রাণীটি এত আলোড়ন তুলেছিল, আজও তা জীবজগতের বিস্ময়কর জীবদের অন্যতম। হংসচঞ্চু বা প্লাটিপাস আজও প্রাণিতত্ত্ববিদদের চমৎকৃত করে রেখেছে।

ডঃ জর্জ শ নামের এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ১৭৯৮ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে তাঁর কোনও এক পরিচিত ব্যক্তির পাঠানো হংসচঞ্চুর একটি চামড়া উপঢৌকন পেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম এদের নাম দেন 'প্লাটিপাস', যদিও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এদের 'মাল্লানগং' নামে ডাকে। গ্রিক ভাষায় প্লাটিপাস শব্দের অর্থ 'চ্যাপ্টা পা'। হংসচঞ্চুর পা'গুলি চ্যাপ্টা হলেও পরবর্তী কালের সমালোচকরা বলে থাকেন, এদের আকৃতিগত এমন সব বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে, সেগুলির কথা মনে রাখলে নামকরণ আরও জুতসই হত। বাংলায় হংসচঞ্চু ইংরেজি প্লাটিপাস থেকে অনেক বেশি ব্যঞ্জনাময়।

হান্টারের পাঠানো মৃত হংসচঞ্চু দুটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ তুলে দিলেন শল্যচিকিৎসক ইভারার্ড হিউমের হাতে। হিউম একটি স্ত্রী-প্রাণীকে কাটাকাটি করে মন্তব্য করলেন যে, এই ধরনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্য কোনও চতুষ্পদ প্রাণীতে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। সুতরাং এদের স্তন্যপায়ী পক্ষী এবং উভচর শ্রেণীর মধ্যবর্তী কোনও নতুন শ্রেণীতে বিন্যাস করা হোক। এই সময়েই ফরাসি প্রকৃতিবিদ সেন্ট হিল্যার আর-একটি স্ত্রী-প্রাণীর শরীর পরীক্ষা করে একটি রোমাঞ্চকর মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন যে, এই প্রাণী ডিম পাড়ে। বিবর্তনবাদের অন্যতম আদিপুরুষ ল্যামার্ক বললেন, স্তন্যপায়ীর অনেক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এদের নিশ্চিতভাবে স্তন্যপায়ী বলা সম্ভব নয়। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে এক জার্মান বিজ্ঞানী মেকেল আবিষ্কার করলেন যে, স্ত্রী-প্রাণীগুলির উদরে ছোট-ছোট ছিদ্র থেকে দুধ নিঃসৃত হয়। সুতরাং এই প্রাণী নিঃসন্দেহে

স্তন্যপায়ী, যদিও এই বক্তব্য বিজ্ঞানী-মহলে স্বীকৃত হলেও প্রত্যয়ের অভাব থেকে গেল। নিঃসংশয় হতে সময় লাগল আরও প্রায় একশো বছর।

যে প্রশ্নটা সবচাইতে বেশি সকলকে ভাবিয়ে তুলল, তা হল, প্রাণীটি যদি স্তন্যপায়ীই হবে, তা হলে তা ডিম পাড়বে কেন? অনেকে আবার কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে নানান কথা রটাতে লাগল। এমন কথাও রটে গেল যে, সমুদ্রপথে যখন জাহাজ ভারতের উপকূল দিয়ে আসছিল, প্রাচ্যের কোনও জাদুকর তখন ভোজবাজি করে নাবিকদের ঠকিয়েছে। এরই সূত্র ধরে দেখা দিল আরও নানা প্রশ্ন, যার জবাব পাওয়ার জন্য আরও ষাট বছর অপেক্ষা করতে হল। ১৮৮৪ সালে, সব সংশয়ের অবসান করতে, কেমব্রিজের তরুণ প্রাণিবিজ্ঞানী ডঃ কল্ডওয়েল অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হলেন হংসচঞ্চুর ডিম খুঁজে বার করার জন্য। ডঃ কল্ডওয়েল প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করে অবশেষে দুটি ডিম খুঁজে পেলেন। প্রায় চার সেন্টিমিটার লম্বা এবং প্রায় দু' সেন্টিমিটার চওড়া এই ডিম দেখতে হুবহু টিকটিকি বা গিরগিটিদের ডিমের মতন। তাঁর এই আবিষ্কারের ঠিক পরের দিনই উইলিয়াম হাকে নামে আর এক অনুসন্ধানী আবিষ্কার করলেন যে, কাঁটাওয়ালা পিপীলিকাভুক্ বা একিডনারাও স্তন্যপায়ী বটে, তবে তারাও ডিম পাড়ে। হংসচঞ্চু এবং একিডনা মোনোট্রিমাটা নামের এক স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অভ্ সায়েন্সের নামে ডঃ কল্ডওয়েল একটি তারবার্তা পাঠালেন। সেই বিখ্যাত তারবার্তায় লেখা ছিল চারটি শব্দ: 'মোনোট্রিমরা অণ্ডজ, ডিমগুলি মেরোব্লাসটিক'। অর্থাৎ মোনোট্রিমরা ডিম পাড়ে, এবং তাদের ডিমের ধরনটাও জানিয়ে দেওয়া হল।

চঞ্চু দিয়ে জলের তলার খাদ্যের সন্ধানে

স্তন্যপায়ী হয়েও হংসচঞ্চুরা যে অণ্ডজ, এ-ব্যাপারে নিঃসংশয় হওয়া গেল বটে, তবে তাদের অন্যান্য আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যর বৈচিত্র্য কিন্তু তখনও নানান জিজ্ঞাসার হেতু হয়ে রয়ে গেল। আকৃতিগত এই সব বৈসাদৃশ্য বস্তুত বিজ্ঞানীদের এই প্রাণীটির বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। একে-একে যদি এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়, তবে মনে হতে পারে যে, এই প্রাণীটি যেন অনেকগুলি প্রাণীর সমষ্টিগত একক। ব্যাপারটা চিন্তা করলে মজার লাগলেও প্রাণিতত্ত্ববিদদের কাছে আজ অবধি এই ব্যাপারটাই প্রধান বিস্ময়ের কারণ হিসেবে থেকে গেছে। বিবর্তনের ইতিহাসে হংসচঞ্চুর স্থান নির্ণয় করা তাই আজও প্রাণিতত্ত্ববিদদের পক্ষে অন্যতম প্রধান ও জটিলতম সমস্যা হয়ে থেকে গেছে।

প্রাপ্তবয়স্ক হংসচঞ্চুর দেহের ওজন সাধারণত এক থেকে দেড় কেজির মতন হয়, এবং লম্বায় হয় এরা প্রায় একান্ন সেন্টিমিটার। দেহটি এদের ভৌদড়ের মতন, কিন্তু লেজটি পেশিবহুল এবং বিবর বা বিভারের লেজের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। হাঁসের মতন চঞ্চু হলেও অনেক বেশি নমনীয়। বানরের যেমন ফোলা-ফোলা গাল হয়, এদের গাল দুটিও তেমন ফোলা। অন্য সকল স্তন্যপায়ীর যে কানের পাতা বা বহিঃকর্ণ থাকে, এদের কিন্তু তা থাকে না। অগ্রপদ দুটির সঙ্গে ভৌদড়ের অগ্রপদের মিল থাকলেও শক্ত চামড়ার আবরণ দিয়ে আঙুলগুলি আবৃত থাকায় সাঁতারের উপযোগী হিসেবে লিপ্তপদ তৈরি করে। মাটি খোঁড়ার সময়ে কিন্তু এই চামড়া সরে যায়, আর নখরগুলি

প্রাণীজগতের 'জীবন্ত জীবাশ্ম' প্লাটিপাস

বেরিয়ে আসে। পুরুষদের ক্ষেত্রে পেছনের পায়ের গোড়ালি অঞ্চলে থাকে সাপের বিষদাঁতের আকৃতির একটি করে বিষধর আঁকশি। চেহারায় এরা 'হাঁসজারু'র থেকেও বিচিত্র নিঃসন্দেহে। সুতরাং উনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীরা এই ধরনের একটি প্রাণীর বর্ণনা শুনে যে স্বভাবতই বিচলিত হয়ে উঠবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী!

হংসচঞ্চুর খাদ্য তালিকায় খুব একটা বৈচিত্র্য না থাকলেও এরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করে। এদের খাদ্য কেঁচো, ছোট-ছোট চিংড়ি জাতীয় কিছু প্রাণী, আর কিছু শামুক ও গুগলি। কিন্তু এরা সূর্যোদয়ের আগে আর সূর্যাস্তের পরে ছাড়া খাদ্য গ্রহণ করে না। খাদ্য গ্রহণের জন্য এরা যখন জলে ডুব মারে, তখন একই সঙ্গে এরা চোখ দুটি আর কানের ফুটো বন্ধ করে নেয়, এবং সংবেদনশীল চঞ্চু দিয়ে নিজের খাদ্য নদীর তলায় মাটি থেকে খুঁজে নেয়। এক গ্রাস খাদ্য, তার সঙ্গে বালি ও পাথরকুচি নিয়ে এরা জল থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর শুরু হয় খাদ্য চর্বণ ও ভক্ষণ। দাঁত না থাকায় খাদ্য চূর্ণ করতে সাহায্য করে বালি আর পাথরকুচি। এদের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হলেও দৃষ্টি কখনওই সামনের দিকে হয় না। চোখ দুটির অবস্থান এমনই যে, দৃষ্টি ওপর দিকে এবং পাশের দিকে হয়। নিজেদের দেহ এরা অত্যন্ত পরিষ্কার রাখে। পেছনের পায়ের নখর দিয়ে সারা শরীরের রোম আঁচড়ে নেয়, যখনই জল থেকে উঠে

আসে। এই ব্যাপারে কোমরের হাড়ের গঠন তাদের খুবই সাহায্য করে। বস্তুত এই গঠনের জন্যই পেছনের পা দুটি শরীরের সব জায়গায় পৌঁছতে পারে। কাঁধের হাড়ের গঠন সরীসৃপদের মতন হওয়ায় এদের সামনের পায়ের পদক্ষেপ অনেটা কুমিরের মতন। হংসচঞ্চুর আয়ু কম-বেশি ১৭ বছর হয়। বাচ্ছা ডিম ফুটে বের হবার পর মায়ের উদরের ছিদ্র থেকে নিঃসৃত দুধ এরা মায়ের উদরের রোম থেকে লেহন করে নেয়। কালো ধেড়ে ইঁদুর এবং কয়েক ধরনের মাছ এদের শত্রু। নদীর পাড়ের জমিতে সুড়ঙ্গ করে হংসচঞ্চু বাসা বাঁধে। মানুষ ও খরগোশ এই জায়গাগুলি নষ্ট করে ফেলছে বলে তারাও ইদানীং হংসচঞ্চুর শত্রু বলে পরিগণিত হচ্ছে।

আমাদের প্রাণিজগতের বেশ কিছু প্রাণী আছে, যাদের অস্তিত্ব কয়েক কোটি বছর আগে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু 'জীবিত জীবাশ্ম' হিসেবে কয়েকটি প্রাণী একইভাবে বেঁচে আছে কোটি-কোটি বছর ধরে। প্রকৃতি না পেরেছে এদের পরিবর্তন করতে, না পেরেছে লুপ্ত করতে।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রাণিজগৎ প্রাণিতত্ত্ববিদদের কাছে এক স্বর্গরাজ্য, কারণ দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার ফলে ওই মহাদেশের প্রাণিকুল বেশ কিছু প্রাচীন বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে ধরে রাখতে পেরেছে। প্রাণিতত্ত্ববিদরা তাই অস্ট্রেলিয়া মহাদেশকে বলেন 'বিবর্তনের হিমঘর'। এই হিমঘরে তাই আজও পাওয়া যায় সেই সব প্রাণী, যারা অন্যান্য জায়গা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হংসচঞ্চু পাঁচ কোটি বছর ধরে একই ভাবে ওই মহাদেশে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। তাদের হাবভাব চালচলন একই ভাবে চলেছে পাঁচ কোটি বছর ধরে, এবং পরবর্তী কয়েক লক্ষ বছর ধরে যে একইভাবে বেঁচে থাকবে, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হংসচঞ্চুর মধ্যে খুবই স্পষ্ট।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

পরের পৃষ্ঠায় শুরু হল টিনটিনের নতুন অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী

তিব্বতে টিন টিন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ক্রিকেট শিখতে বোম্বাইয়ে কি যেতেই হবে?

কৃশানু ভট্টাচার্য

বর্ষায় ক্রিকেট ? কথাটা অদ্ভুত শোনালেও সত্যি। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বোম্বাইয়ে বছরে এগারো মাস ক্রিকেট খেলা হয়। যদিও এখন ক্রিকেটে দিল্লি খুব উন্নতি করেছে, বিভিন্ন ট্রফিও জিতছে, তা হলেও বোম্বাইয়ের গুরুত্ব কমেনি। ক্রিকেট শিখতে হলে বোম্বাইয়েই যেতে হবে—এই ধারণাই এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

বোম্বাইয়ে অসংখ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বছরে এগারো মাস ধরে চলে। ফলে বোম্বাইয়ের ক্রিকেটাররা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি সংখ্যক প্রতিযোগিতায়

সব খেলার বড় কথা · শরীরটাকে সুস্থ রাখা চাই

জোর নেট প্র্যাকটিস : বোম্বাইয়ে প্রায় সারা বছরই ক্রিকেটের তোড়জোড়

তাদের দক্ষতা দেখাবার সুযোগ পায়। এর ফলে ক্রিকেটার হিসেবে তারা বেশ পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে।

ক্রিকেট যেন বোম্বাইয়ের ছেলেদের রক্তে। মা-বাবারা তাঁদের ছেলেদের হাত ধরে নিয়ে যান বিভিন্ন ক্লাবের কোচদের কাছে। সূর্য ওখানে অনেক দেরিতে অস্ত যাওয়ার ফলে ছেলেরা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পরেও, অন্তত তিনটি ঘণ্টা প্র্যাকটিসের সুযোগ পায়। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে-সঙ্গে ডাঃ এইচ· ডি· কাঙ্গা লিগ-এর খেলা দিয়ে বোম্বাইয়ের ক্রিকেট মরসুম শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতায় ঊনপঞ্চাশটি দল অংশগ্রহণ করে। সাঁইত্রিশ বছর ধরে এই প্রতিযোগিতা চলে আসছে। প্রতি বছর সর্বনিম্ন ডিভিশন 'জি' থেকে চারটি দল নক আউট পদ্ধতিতে বিজয়ী হয়। তাদের কাঙ্গা লিগে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়।

কাঙ্গা লিগের পর কিছুদিন বোম্বাইয়ে ক্রিকেট খেলা বন্ধ থাকে। ডিসেম্বর থেকে টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া চ্যালেঞ্জ শিল্ডের নীচের দিকের কোয়ালিফাইং রাউণ্ডের খেলাগুলি শুরু হয়। এটাই বোম্বাইয়ের সব থেকে বড় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এ ছাড়াও কমরেড শিল্ড, তালিম শিল্ড ও পুরুষোত্তম শিল্ড প্রতিযোগিতাও খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষোত্তম শিল্ড প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন বোম্বাই পি· জি· হিন্দু জিমখানা। এই প্রতিযোগিতাগুলি চলে এপ্রিল মাস অবধি।

বোম্বাইয়ের বিভিন্ন অফিস লিগ ও অন্যান্য প্রতিযোগিতাও খুবই জমজমাট। মাহীন্দ্র শিল্ডের খেলাগুলিতে বিভিন্ন অফিস ও ব্যাঙ্ক অংশগ্রহণ করে। টাইমস্ শিল্ড প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের সব নামী অফিস-দলগুলি অংশগ্রহণ করে থাকে। মোটা টাকা মাইনে দিয়ে অফিসগুলি ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের নামী ক্রিকেটারদের চাকরি দেয়, যাতে তাঁরা অফিসের হয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন। নিরলন কোম্পানির হয়ে টাইমস্ শিল্ডে অংশগ্রহণ করেন সুনীল গাওস্কর, সন্দীপ পাতিল ও কারসন ঘাবড়ি। মফতলালের হয়ে খেলেন রাজু কুলকার্নি ও লালচাঁদ রাজপুতের মতো ক্রিকেটাররা। টাইমস্ শিল্ডের সব দলকে আটটি ডিভিশনে ভাগ করিয়ে খেলানো হয়। ফাইনাল ডিভিশনে ওঠে পাঁচটি দল। এদের মধ্যে রাউণ্ড রবিন পদ্ধতিতে খেলে যে-দলের পয়েন্ট সব থেকে বেশি হয় সেই দলকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

বোম্বাইয়ের স্কুল ও কলেজ প্রতিযোগিতাগুলিও খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। কোচেরা এই প্রতিযোগিতাগুলিতে নতুন প্রতিভা আবিষ্কারের আশায় বিশেষভাবে নজর রাখেন।

বোম্বাইয়ের কোচদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বসন্ত আমলাদি। এর পর যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন বি· ডি· দেশাই ও ভি· এস· পাতিল। আমলাদি বোম্বাইয়ের হয়ে এক সময় রঞ্জি ট্রফিতেও খেলেছেন। ক্রিকেট কোচিং দেবার জন্য তাঁর একটি স্কুলও আছে। টাটা ও দাদার ইউনিয়নের হয়ে বি· ডি দেশাই প্রচুর ক্রিকেট খেলেছেন। তিনি সাধারণত স্কুলের ছাত্রদেরই ক্রিকেট কোচিং দিয়ে থাকেন। ভি· এস· পাতিলের কোচিংয়ে উপকৃত হয়েছেন বহু কলেজ ছাত্র। পাতিলের প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য, তিনি কোনও শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক স্টাইল পালটাতে বাধ্য করেন না। তাঁর ট্রেনিংয়ের মূল কথা, "প্র্যাকটিস, আরও প্র্যাকটিস, শুধু প্র্যাকটিস।" আমলাদি ট্রেনিং দেওয়া ছাড়াও কী ধরনের বোলারের বল খেললে শিক্ষার্থীর উন্নতি হবে তাও তিনি নির্ধারণ করে দেন।

ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

প্র্যাকটিসের ঢালাও সুযোগ বাংলায় কজন পায় ?

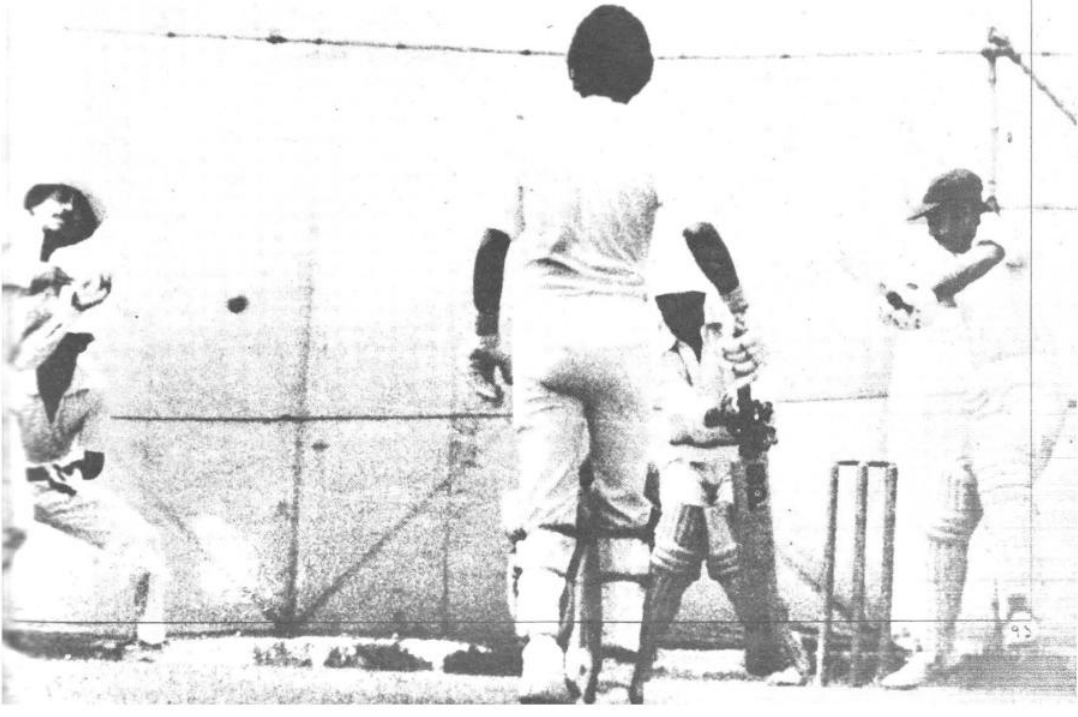

এখানে সুযোগ-সুবিধে কেমন

রাজু মুখোপাধ্যায়

ভারতে এখন ক্রিকেট খেলার বিশাল আয়োজন। স্কুল-কলেজে ক্রিকেট তো আছেই, এমনকী ক্লাব পর্যায়েও খেলবার ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্র। এই অবস্থায় কলকাতায় খেলার ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা কেমন তা একবার ভেবে দেখলে হয়।

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশন মিলিয়ে প্রায় একশোটি ক্লাব আছে। খুব বাড়িয়ে বললেও মাঠের সংখ্যা পঁচিশের বেশি নয়। অতএব আমরা গল্পের খাতিরে ভেবে নিতে পারি যে, প্রতিটি মাঠ কম করে চারটি ক্লাব নিজেরা ভাগ করে নেয়। যদি ধরি, প্রতিটি ক্লাব সপ্তাহে নিজেদের মাঠে একটা করে ম্যাচ খেলে, তা হলে দেখা যাচ্ছে সপ্তাহে চারদিন করে অন্য ক্লাবগুলোর প্র্যাকটিস বন্ধ। এর ওপর আবার সোমবার কলকাতায় খেলা হয় না। কারণ পিচ ও মাঠে জল দেওয়া হয়, ঘাস কাটা হয় ইত্যাদি। তা হলে প্র্যাকটিস করার জন্য বাকি রইল সপ্তাহে দু'দিন।

এখানে ক্রিকেট মরসুম বলতে বোঝায়, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ মাত্র তিন মাস, অবশ্য ইডেনে ক্রিকেট খেলা হয় মে পর্যন্ত। কিন্তু তাতে অংশগ্রহণ করে যারা চ্যাম্পিয়ানশিপ লড়ছে অথবা অবনমনের খেলায় জড়িত শুধুমাত্র তারাই। মানে এই যে, আমাদের কলকাতার একজন সাধারণ ক্লাব খেলোয়াড় বছরে তিন মাসের মধ্যে বড়জোর চব্বিশটি ম্যাচ খেলেন আর সপ্তাহে গড়ে দু'দিন হলে অনুশীলন করেন চব্বিশ দিন! এটা অবশ্য ছোট ক্লাবের খেলোয়াড়দের কথা। আবার এই চব্বিশটি ম্যাচ বা চব্বিশ দিন প্র্যাকটিসও খুব কম ক্লাবই করে উঠতে পারে।

বড় ক্লাবগুলোর কথা অবশ্য আলাদা। তাদের নিজেদের মাঠ আছে, 'শেয়ার' করতে হয় বড়জোর দু-একটা ক্লাবের সঙ্গে। অতএব তাদের প্র্যাকটিস অনেক নিয়মিত, যদিও ম্যাচের সংখ্যা খুব বেশি হলেও সেই চব্বিশ। ক্রিকেট মরসুম তিন মাসেরই হোক আর ছ' মাসেরই হোক, ম্যাচের সংখ্যা বাড়ে না।

আরও দুঃখের কথা। কলকাতায় অল্পবয়স্ক খেলোয়াড়দের অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে। আন্তঃস্কুল ও কলেজ ক্রিকেট কোনওরকমে শেষ করা হয়। পিচের অবস্থা এতই খারাপ থাকে যে, ওই অবস্থায় কোনও উঠতি খেলোয়াড়ই খেলায় উন্নতি করতে পারে না। ক্লাব ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করাও এদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বড় ক্লাব, ছোট ক্লাব কেউই নতুন খেলোয়াড় নিয়ে তালিম দেবার মতো কাঠামো এখনও তৈরি করতে পারেনি।

সি. এ. বি. অবশ্য মাঝেমধ্যে অল্পবয়স্ক খেলোয়াড়দের কোচিং-এর ব্যবস্থা করে। সংবাদপত্রে এসব নিয়ে ভীষণ মাতামাতিও হয়। কিন্তু আসলে কাজের কাজ কিছুই হয় না। বাচ্চাদের ইডেনে যাতায়াত করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্কুলের পরে একটা প্রায়-বন্ধ ঘরে ওদের দমবন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। তার ওপর আবার, নামতা পড়ানোর মতো টেকনিক শেখানোর প্রবণতা! খেলা যেন মুখস্থ করে শেখা যায়! কে বোঝাবে খেলা একটা আর্ট আর তা শুধু আনন্দের মধ্যে

বথাম এখন

ক্রিকেটার ইয়ান বথাম এখন কী করছেন? প্রশ্নটা অনেকের মনেই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। কারণ মাত্র কিছুদিন আগে বথাম সাময়িকভাবে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে বরখাস্ত হন। তবে বথাম বসে থাকার লোক নন। নানা কল্যাণমূলক কাজের কথা ভাবতে শুরু করেছেন তিনি। ইংল্যাণ্ডের স্কুলগ্রোব ফুটবল থেকে বথামকে দলের সহ-সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অল্প বয়সে একসময় বথাম এই ক্লাবেই ফুটবল খেলতেন। বর্তমান ক্লাবের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ। কর্মকর্তারা স্থির করেছেন, ক্লাবের এখনকার মাঠটি বিক্রি করে দিয়ে ধার শোধ করবেন। পরে সুযোগ বুঝে টাকা তুলে নতুন কোনও স্টেডিয়াম কিনবেন। এতসব ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই দলের সহ-সভাপতি হওয়ার সম্মতি জানান বথাম। বথামকে পেয়ে দলের সবাই খুশি। কারণ কয়েক মাস আগেই বথাম ক্যান্সার রিসার্চ সোসাইটির সাহায্যের জন্য পদযাত্রা করে কয়েক লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন। কর্মকর্তাদের ধারণা, প্রয়োজনে টাকা তোলার ব্যাপারে বথামের আন্তরিক সাহায্য পাওয়া যাবে। ক্লাবের ম্যানেজার বথামকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, 'বথাম তাঁর বন্ধুদের পাশে সবসময়ই দাঁড়ান। এই ক্লাবেরও তিনি একজন বড় বন্ধু।'

প্রিন্স ফিলিপের অফ ব্রেক

ইংল্যাণ্ডের রানি এলিজাবেথের স্বামী প্রিন্স ফিলিপ (ডিউক অফ এডিনবার্গ) যে একজন ভাল অব ব্রেক বোলার ছিলেন তা আমরা অনেকেই জানি না। ক্রিকেটের প্রবাদপুরুষ স্বয়ং ডন ব্রাডম্যান তাঁর বোলিং-এর খুব প্রশংসা করেছিলেন একসময়। ক্রিকেট খেলার নেশাটা অবশ্য তিনি ধরে রাখতে পারেননি। বড় ক্রিকেটার হওয়ার ইচ্ছেটা তাঁর অপূর্ণই থেকে গেছে। ৬৫ বছর বয়সী প্রিন্স ফিলিপ সম্প্রতি তাঁর আত্মজীবনীতে কথাটা অকপটে স্বীকার করেছেন।

স্মিথ মনে রাখবেন

গত ৩১ মে নর্দামটনশায়ারের বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্রিকেট দল আটটি বল খেলে সাত রান করার পর বৃষ্টি নামে, খেলাও বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাটি হয়তো এরপর অনেকেই মনে রাখবেন না। কিন্তু মনে রাখবেন ১৯ বছরের এক ইংরেজ যুবক, নাম গ্যারেথ স্মিথ। তরুণ স্মিথ কম্পিউটার নিয়ে পড়াশুনো করেন। এবছরই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার সুযোগ পেয়েছেন। সৌভাগ্য তাঁর, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলতে এসে ভারতের সুনীল গাওস্করের বিরুদ্ধেই তাঁকে প্রথম বল করতে হয়।

প্রথম ওভারের প্রথম বলটিই গাওস্করকে বিব্রত করে। বলের লাইনে না গিয়েই গাওস্কর বলটিকে সীমানার বাইরে পাঠান। স্মিথ ব্যাপারটা লক্ষ করে পরের বলটি কোনাকুনি পাঠান। গাওস্করের ব্যাটে লেগে বল যায় উইকেট কিপারের হাতে। গাওস্কর আউট। জীবনের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচের প্রথম ওভারেই গাওস্করকে আউট করার এই দুর্লভ সম্মান হয়তো ক্রিকেটের রেকর্ড বুকে লেখা থাকবে না। কিন্তু একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা হয়ে বেঁচে থাকবে স্মিথের জীবনে।

সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

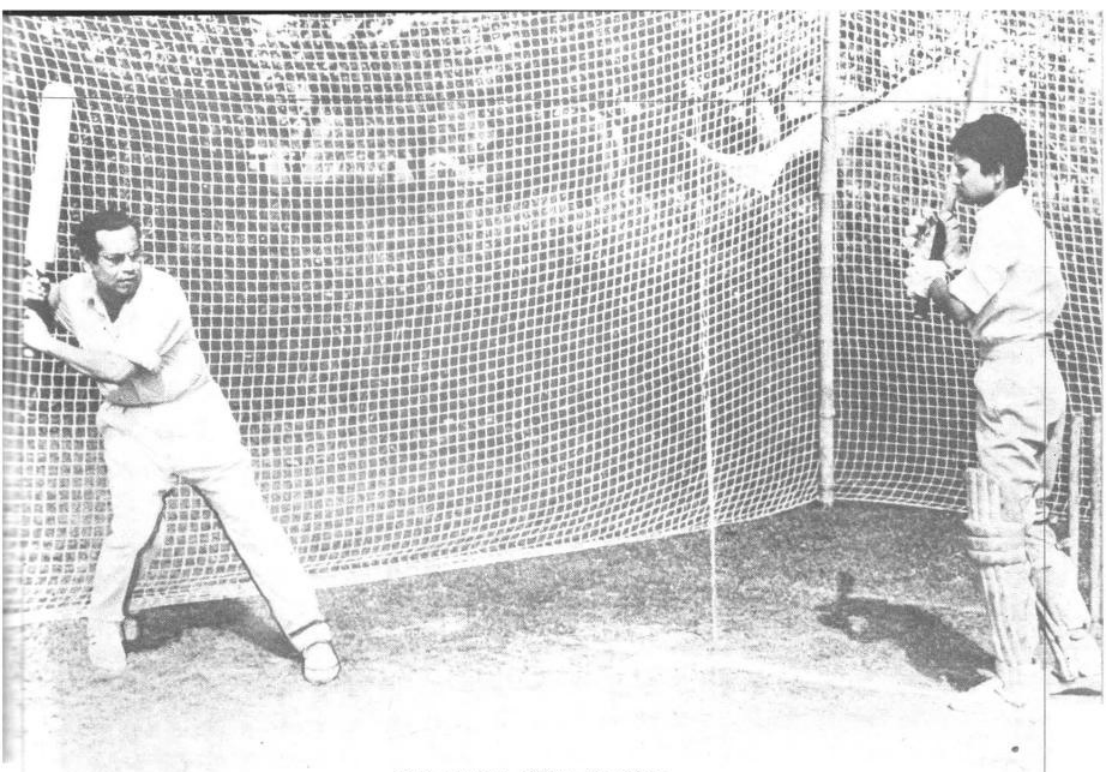

পঙ্কজ রায় খেলা শেখাচ্ছেন পুত্র প্রণবকে

দিয়েই ফুটে ওঠে।

এই অন্ধকারের মধ্যেও অবশ্য কিছু আলো দেখা যায় কখনওসখনও। এক সময় কার্তিক বোস ক্রিকেট খেলার জন্য নিজের জীবন ও বাড়ি দান করেছিলেন। আজ হয়তো এই ধরনের দানধ্যান আশা করা অন্যায়। কিন্তু তাও সুখের খবর, কিছু-কিছু জায়গায় এখনও ছোট-ছোট ছেলেদের খেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্যামবাজারে দেশবন্ধু পার্ক, সালকিয়ার চামেরিয়া পার্ক, শিবপুরের ইউনাইটেড ক্লাবের মাঠে, ভবানীপুরের নর্দান পার্ক, বালিগঞ্জের দেশপ্রিয় পার্ক এবং টালিগঞ্জের অগ্রগামীর মাঠে এক সময় নিয়মিত ক্রিকেট কোচিং হত। সুনীল দাশগুপ্ত, গোপাল ভট্টাচার্য, টুন্টু মিত্তির, সুহৃদ মিত্তির, প্রদ্যোত মিত্র, ও মন্টু সেনের মতো ক্রিকেটপ্রেমীরা খেলোয়াড় তৈরির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁরা বাংলার ছোট-ছোট খেলোয়াড়দের দেখিয়ে দিতেন ক্রিকেটের কলাকৌশল। এখনও ওঁরা আছেন। ওঁদের সঙ্গে এসেছেন আরও অনেক যোগ্য কোচ, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, বাংলার ক্রিকেট এতটুকু এগোনো দূরের কথা, বরং অনেক পিছিয়ে গেছে।

কেন এই অবস্থা ? সত্যি বলতে গেলে, আমরা বড়রা এখন শুধু ছোটদের ক্রিকেট-জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছি। অযথা ওদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছি সঙ্কোচ, ভীতি ও উদ্বেগ। হাসতে হাসতে খেলা যায়

গাওস্কর খেলা শেখাচ্ছেন পুত্র রোহনকে

সে ধারণা এখন প্রায় মৃত। উঠতে বসতে টেকনিকের কাঠগড়ায় বাচ্চাদের দাঁড় করানো হয়। এমন সুন্দর একটা খেলাকে আমরা করে দিয়েছি নীরস। ছোটদের না শেখাচ্ছি নিয়ম-কানুন, তাদের না বোঝাতে পারছি খেলা মানেই গতি। এই গতির ভেতর থেকেই আসে খেলার প্রতি টান বা আনন্দ।

আজ কলকাতায় ছোট-ছোট ছেলেদের ক্রিকেট অনুশীলনের আয়োজন মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে। তবে ব্যবস্থা যে খুব ভাল, তা ঠিক বলা যাবে না। ব্যাট-বলের অবস্থা খারাপ, পিচের যত্ন নেই। এরকম মর্মান্তিক দৃশ্যই প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। তবে এরই মধ্যে রবীন্দ্র সরোবরের হোয়াইট বর্ডার ক্লাব যেন ব্যতিক্রম। বাংলা ক্রিকেটকে এরা যা দিতে পেরেছে তা থেকে বোঝা যায়, এরা কেমন কাজ করছে। গত দু' দশকে বাংলার অন্তত দশজন ক্রিকেটার ও দু'জন অধিনায়কের হাতেখড়ি হয়েছে এই ক্লাবেই।

আগের মতো এখনও ছোট-ছোট ছেলেরা দৌড়ে আসে। সকলেরই আছে বড় হবার স্বপ্ন। চেষ্টারও ত্রুটি নেই। কিন্তু সেই একই প্রশ্ন থেকে গেছে, অ্যাসোসিয়েশন বা ক্লাব-কর্তারা কি খেলাধুলোর উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা শিশুদের দিতে পারছেন ?

বড় ক্লাবের জার্সি, বড় ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল

রত্না শূর

একেবারে সোনায় সোহাগা। বড় ক্লাবের জার্সি পরে প্রথম মরসুমেই বড় দলের বিরুদ্ধে গোল এবং শুধু গোলই নয়, দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দুটি গোল। বড় দলে নবাগত কোনও ফুটবলারের এমন কৃতিত্ব শুধু ইস্টবেঙ্গলে নয়, তিন প্রধান ক্লাবের ইতিহাসেও খুব কম পাওয়া যায়। ইস্টবেঙ্গলের নবাগত উইঙ্গার রঞ্জিত কর্মকার এবার এই কৃতিত্বই স্থাপন করেছেন। কলকাতার ফুটবলে গত কয়েকটি মরসুমে ভিনদেশী ফরোয়ার্ডরা বিভিন্ন সময়ে সফল হয়ে স্থানীয় ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতাকে যখন প্রকট করে তুলেছিলেন, সেই সময়ে রঞ্জিতের এই সাফল্য সেই ব্যর্থতার কালিও কিছুটা মুছে দিল। বড় দলের জার্সি পরে, লিগে মহমেডানের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করে রঞ্জিতের কেমন লেগেছিল ? ২১ বছর বয়সী রঞ্জিত লাজুকভাবে বলেন, 'টিম থেকে বাদ পড়ার চিন্তাটা কিছুটা দূর হয়েছিল।' মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করে ম্যাচের নায়ক হওয়ার পরও রঞ্জিতের নাকি একই রকম মনে হয়েছিল। সে বলেছিল, 'মনে হল, দলে নিজের জায়গাটা হয়তো পাকা করতে পেরেছি।'

আসলে নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে রঞ্জিত এখনও তেমন সচেতন হয়ে ওঠেননি। বড় দলের সঙ্গে নিজেকে যতটা মানিয়ে নিয়েছেন, বড় মাপের ইমেজের সঙ্গে এখনও ততটা মানিয়ে নিতে পারেননি। বড় দলের জার্সি পরে, বড় দুই দলের বিরুদ্ধে গোল করেও রঞ্জিত নবাগতদের মতোই বিনয়ী ও অতৃপ্ত। গোল করার জন্য রঞ্জিত যতটা খুশি হন, গোল মিস করার জন্য তার চেয়েও অনেক বেশি লজ্জিত বোধ করেন। পরবর্তী খেলাগুলিতে সমর্থকদের প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি বলে ওঁর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। নিজের ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চতার ৫৪ কেজি ওজনের চেহারাটার দিকে আঙুল তুলে রঞ্জিত বলেন, 'শরীরটাকে আরও ভাল করা দরকার। বডিওয়েট না থাকলে বর্ষার মাঠে রেগুলার খেলাই মুশকিল। গোল করা তো দূরের কথা, আসলে ছোটবেলা থেকেই স্বাস্থ্য ভাল করার কোনও সুযোগ পাইনি তো।'

রঞ্জিতের বাবা পঞ্চানন কর্মকার যেখানে চাকরি করতেন, এক সময় তা প্রতি বছরই মাসের পর মাস লকআউট থাকত। রঞ্জিতরা ছ' ভাই ও এক বোন, ছোটবেলায় প্রায়ই পেট-ভরা খাবার পেতেন না। রঞ্জিতের মা সেসব দিনের কথা বলতে গিয়ে এখনও বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন। রঞ্জিতকে বলেন, 'আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য ছাড়া তোরা বাঁচতিস না। ওঁদের সাহায্যের কথা কোনওদিন ভুলিস না।' ভাইদের মধ্যে পঞ্চম রঞ্জিত। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন। মাসতুতো দাদা রবিন কর্মকার ও নেতাজিনগর কলেজের অধ্যাপক দিলীপ রায়ের সাহায্য ছাড়া রঞ্জিতের যেমন পড়াশোনা হত না, তেমনি খেলার দিক থেকেও রঞ্জিত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সাহায্য পেয়েছেন। রঞ্জিত কোনও সাহায্যের কথাই ভোলেননি।

মাত্র ছ' বছর বয়সে ফুটবল খেলা শুরু করার পর, আণ্ডার-হাইট টুর্নামেন্টে খেলার সুবাদে রঞ্জিত ওঁর জীবনের প্রথম বুট পেয়েছিলেন কালীঘাট ত্রিশক্তির নানুদার কাছ থেকে। আণ্ডার-হাইটের গণ্ডি পার হবার পর বড় মাপের দ্বিতীয় বুট পেয়েছিলেন ক্যালকাটা সাণ্টোস ক্লাব থেকে। ওই ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলেন রঞ্জিতের পাড়ার দুই নামী ফুটবলার প্রবীর ঘোষ ও শ্যামল ভট্টাচার্য। ১৯৮৩ সালে রঞ্জিতের জীবনে এসেছিলেন টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কোচ প্রদীপ দত্ত, এক প্রদর্শনী খেলায় রঞ্জিতকে দেখে, তিনি সেবারই ওঁকে টালিগঞ্জে সই করিয়ে ময়দানের সঙ্গে প্রথম পরিচিত করিয়েছিলেন। দু বছর টালিগঞ্জে ও এক বছর খিদিরপুরে খেলে মাত্র তিন বছরের মধ্যেই রঞ্জিত নিজেকে বড় দলের জার্সির উপযুক্ত হিসেবে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে গত বছর শিল্ডের চূড়ান্ত পর্বে খিদিরপুরের হয়ে শাখতারের বিরুদ্ধে রঞ্জিতের গোল তাঁকে কলকাতা ময়দানের প্রথম সারির ফরোয়ার্ডদের পাশে জায়গা করে দিয়েছিল। ময়দানে তিন বছর ধারাবাহিক সাফল্য সত্ত্বেও, রঞ্জিতের হাতখরচের টাকা আসত ওঁর পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে। রঞ্জিত বলেন, 'বাইরে কোথাও খেলতে গেলে ছানুদারা পকেটে টাকা গুঁজে দিতেন।' এ-বছর ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারাও রঞ্জিতকে সই করানোর সময়, ওঁর জীবনের সবচেয়ে সমস্যাসঙ্কুল জায়গাটি চিনতে ভুল করেননি। ওঁরা বলেছিলেন, 'তুই আমাদের জন্য খেলবি, আমরা তোর বাড়ির কথা ভাবব।' সেই শর্তপালনে রঞ্জিত নিজেকে পুরোপুরিই উজাড় করে দিচ্ছেন। শুধু বড় ম্যাচে গোল করেই রঞ্জিত সন্তুষ্ট নন। প্রতি ম্যাচেই গোল করতে চান। সেজন্য প্রতিদিন সকাল-বিকেলে মোট তিন ঘণ্টা প্র্যাকটিস করেন। শ্যুটিং দুর্বলতা কাটাবার জন্য শ্যুটিং প্র্যাকটিস করেন সবচেয়ে বেশি। অবসর সময়ে পড়াশোনার দিকেই বেশি মন দেন। পরিবারের অন্তত একটা ছেলের গ্র্যাজুয়েট হওয়া এবং ভাল চাকরি পাওয়া বড় জরুরি।

লিগ জমে উঠছে। ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

লিগে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রঞ্জিতের গোল
ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

কেমন ছেলে বেকার

সুভাষ সরকার

কেরলের পায়োলি গ্রামের নাম আগে অনেকেই জানতেন না। কিন্তু পি. টি. উষা খেলাধুলার জগতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাবার পরই, রাতারাতি এই ছোট্ট জনপদের নাম মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এরকমই আর-একটি গ্রাম লাইমন। পশ্চিম জার্মানির হাইডেলবার্গের কাছে এই গ্রামের ছেলে বরিস বেকার। টেনিসের বিস্ময়-বালক বেকার দু-দু'বার উইম্বলডন জেতার সূত্রে এই গ্রামটিও আজ রীতিমত বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

বেকারকে অবশ্য ক্রীড়া-সাংবাদিকরা শুধু 'বিস্ময়-বালক' আখ্যা দিয়েই থেমে থাকেননি। কেউ তাঁকে বলেন 'টিন এজ টর্নেডো', কেউ বা বলছেন 'ব্যাং ব্যাং বরিস'। আবার হালে আর-একটি কথাও কানে আসছে—'বরিস দি বম্বার'। বম্বার কথাটি অবশ্য বরিসের পছন্দ নয়। আঠারো বছরের এই তরুণ সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমি লড়াই করি না, আমি টেনিস খেলি।'

বরিসের বাবা কার্ল হাইনজ পেশায় স্থপতি। অবসর সময়ে তিনি টেনিস খেলতেন। বরিসের যখন বয়স মাত্র তিন, তখনই তিনি প্রথম বাবার টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়েছিলেন। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। টেনিস র‍্যাকেটের স্পর্শের অনুভূতি তিনি কখনও ভুলতে পারেননি। ন'বছর বয়সে তিনি প্রথম খেলেন স্থানীয় একটি ক্লাবে। তবে একজন খেলোয়াড় অসুস্থ হওয়ায় তাঁর জায়গায় বরিস খেলতে নেমেছিলেন। এটা নিছক আকস্মিক ঘটনা

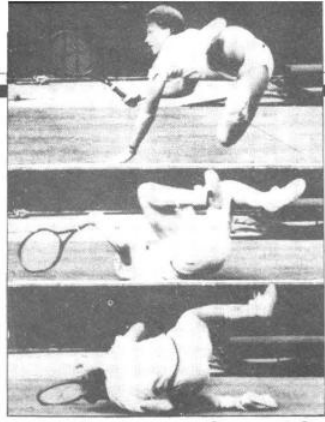

হলেও, বরিসের ধ্যান-জ্ঞান ছিল শুধু টেনিস আর টেনিস। টেনিস ছিল তাঁর নেশা। এমনকী, স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষায় বসার আগেই তিনি পুরোদস্তুর টেনিসের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। অবশ্য ছেলেবেলায় তাঁর প্রথম নেশা ছিল ফুটবল। তবে তার থেকেও বড় কথা, তিনি ছিলেন টেনিসের প্রবাদপুরুষ বিয়র্ন বর্গের ফ্যান। চার-চারবার বর্গের অটোগ্রাফ নিয়েছিলেন বেকার। একটি অটোগ্রাফ রেখে দিয়ে, বাকি তিনটি অটোগ্রাফ তিনি বন্ধুদের কাছে বিক্রিও করে দিয়েছিলেন! বর্গ যেবার ম্যাকেনরোর কাছে উইম্বলডন ফাইনালে হেরে যান, সেবার বেকার হতাশ হয়ে বলেছিল, 'আমার জীবনেও টেনিস শেষ হয়ে গেল।' তখন ওর বয়স ছিল তেরো। আর ওই বয়সেই তিনি ছিলেন সম্ভাবনাময় উঠতি খেলোয়াড়। সরকারের টাকায় ট্রেনিংও পাচ্ছিলেন। কিন্তু খুব খামখেয়ালি ছিলেন বলে ট্রেনিং থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। তাতে অবশ্য তাঁর কিছু যায়-আসেনি। দু' বছর বাদেই পশ্চিম জার্মানির জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ান হয়ে তিনি তাঁর প্রতিভা ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। জাতীয় কোচ গুন্টার বস্‌ক ইস্তফা দিয়ে বেকারকে নিজেই প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। আর আজ দু'বার উইম্বলডন জিতে বেকার বুঝিয়ে দিয়েছেন, টেনিসে তাঁর যুগই আসছে। বর্গ, ম্যাকেনরোর বিদায়ের পর টেনিস-বিশ্বে কিছুটা সংশয় ছিল। কে বর্গ বা ম্যাকেনরোর জায়গা নেবেন? তাঁরা ভেবেছিলেন সুইডেনের স্টিফেন এডবার্গ ওই শূন্যস্থান হয়তো পূরণ করবেন। কিন্তু যে-বেকার ১৯৮৪ সালে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উইম্বলডনের কোর্ট ছেড়েছিলেন, সেই বেকারই পরের বছর ফিরে এলেন বিজয়ী হয়ে। সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে উইম্বলডনের পুরুষ বিভাগে তো তিনি জিতেছেনই, সেই সঙ্গে পশ্চিম জার্মানিরও নাম উজ্জ্বল করেছেন। কারণ তাঁর আগে এমন কৃতিত্ব পশ্চিম জার্মানির কেউ দেখাতে পারেননি।

কেমন ছেলে বেকার? তাঁর তো টাকাপয়সা এখন অঢেল। কিন্তু এখনও হাত খরচার টাকা তিনি তাঁর ম্যানেজার ইয়ান টিরিয়াকের কাছ থেকে চেয়ে নেন। এই তো সেদিন সিনেমা দেখার টাকাও তাঁকে ম্যানেজারের কাছ থেকে নিতে হল। টিরিয়াকের কাছে তিনি এখনও ছোট্ট শিশু। বেশি পয়সা নিয়ে যদি নষ্ট করে ফেলে! টিরিয়াক যখন এই চিন্তায় আকুল, তখন বেকার কিন্তু ভবিষ্যতের এক নম্বর খেলোয়াড় হওয়ার দিকে ধাপে-ধাপে এগিয়ে যাচ্ছেন।

ব্রাভো ব্রাদার!' উইম্বলডন-বিজেতা বেকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন বিজিত লেন্ডল।

রোভার্সের রয়

এমন সমস্যায় রয় এর আগে আর কখনও পড়েনি

রোভার্সের জীবনে দেখা দিয়েছে দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যাবার আশঙ্কা। তা ছাড়া, সামনেই এফ. এ. কাপের খেলা। ফলে কড়া ট্রেনিং নিয়ে রয় ব্যতিব্যস্ত। রয়ের স্ত্রী পেনি তাই ভীষণ ক্ষুব্ধ। এই অবস্থায় মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে রয় দেখল....

ব্যাপার কী ?

গ্যারাজে পেনির গাড়ি নেই কেন ?...ওটা আবার কী ? পেনির চিঠি ?

তা-ই বটে !

সংসারের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছ না, শুধু ক্লাব নিয়েই তুমি মেতে আছ। রয়, এটা আমি সহ্য করতে রাজি নই, তাই মায়ের কাছে চললুম। তোমার খাবার রান্নাঘরে ঢাকা দেওয়া আছে। —পেনি

কী !

পেনি চলে গেল ? এই অবস্থায় ? ওর মেজাজ দেখছি ভিক গাথরির চেয়েও খারাপ !

মেজাজ ঠাণ্ডা হলেই ফিরে আসবে। তত দিন শান্ত হয়ে থাকি।

যাক, আমি এখন স্বাধীন !

পরদিন সকালে...

এখন কী করব ? আজ তো ট্রেনিং নেই। তা হলে গল্‌ফ খেলব। ব্ল্যাকিকে ডাকা যাক।

কিন্তু...

না, রয়, বউ আমাকে বাথরুম রং করার কাজে লাগিয়েছে। যেতে পারব না।

ঠিক আছে ব্ল্যাকি...

যা করছ, করো।

দিনের পর দিন কাটছে...

ধুত, কত আর স্নুকার খেলা যায় !

আগামী সংখ্যায় চাঞ্চল্যকর একটি গোল দেখবে

বহরমপুর মহারানি কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বহরমপুর শহর এমন জমজমাট ছিল না। শহরের লোকসংখ্যাই বা কত ছিল তখন! কুড়ি-বাইশ হাজারের বেশি হবে না। ইস্কুল-কলেজের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। স্ত্রীশিক্ষা, মানে মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে এখনকার মতো তখন এত উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল না। অভিভাবকরাও অনেকে ছিলেন নিতান্ত নিস্পৃহ। বাড়ির মেয়েরা লেখাপড়া শিখল কি শিখল না সে-ব্যাপারে তাঁদের অনেকের কোনও উৎসাহই ছিল না। সেটা ১৯২৮ সালের কথা। দেশে ঘোর ইংরেজ রাজত্ব। বহরমপুরে স্থানীয় মহিলা সমিতির কয়েকজন সদস্যা উৎসাহভরে এগিয়ে এলেন। তাঁরা বললেন, অভিভাবকরা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না? ঠিক আছে। আমাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা আমরাই করে নেব। হারি হারব, চেষ্টা করতে দোষ কী। যেমন কথা, তেমন কাজ।

সুষমা সিংহ, প্রথম প্রধানশিক্ষিকা

কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক সত্যশরণ সিংহের স্ত্রী সুষমা সিংহ, লেখিকা নিরুপমা দেবী আর বেলা দেবী—অদম্য মনোবল এই তিন মহিলার। ছাত্রী জোগাড়ের আশায় বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে লাগলেন তাঁরা! অভিভাবকদের বোঝাতে লাগলেন নানাভাবে। সহযোগিতা যতটা না পেলেন, তার চেয়ে বেশি পেলেন বিদ্রূপ আর অবহেলা। কিন্তু এঁরা ভেঙে পড়বার পাত্রী নন। সঙ্কল্পে এঁরা অটল। বহরমপুর শহরে মেয়েদের জন্য একটা সুন্দর ইস্কুল গড়ে তুলতেই হবে। যতই বাধা-বিপত্তি আসুক, পিছিয়ে পড়লে চলবে না।

উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তার জয় না হয়ে পারে না। এই মহিলারা সেটাই দেখিয়ে দিলেন। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর চেষ্টায় ১৯২৮ সালে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের (তখন পাগলা গারদ নামে পরিচিত ছিল) একটি ব্লকে মেয়েদের জন্য গড়ে উঠল একটি হাইস্কুল। স্কুলের বাড়ি নেই, কুড়িয়েবাড়িয়ে ছাত্রী পাওয়া গেছে জনাসাতেক, তার উপর প্রচণ্ড আর্থিক কষ্ট! গড়ে যখন উঠেছে একটি প্রতিষ্ঠান, তাকে যেভাবে হোক বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। মহিলা সমিতির সদস্যারা দেখা করলেন কাশিমবাজারের দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে। স্কুলটি

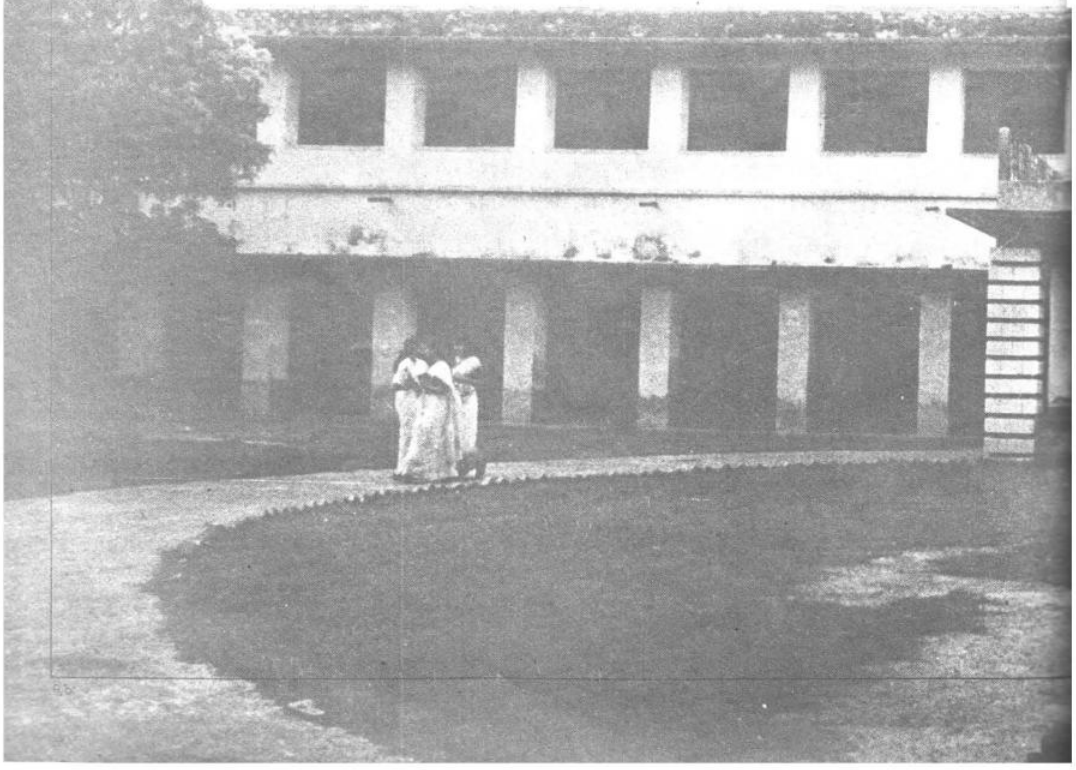

যাতে ভালভাবে চলতে পারে, সেজন্য তিনি একটি বাড়ি ছেড়ে দিলেন। স্কুলের সভাপতি পদেও আসীন হলেন তিনি। সুষমা সিংহ ও রমণীমোহন সেন হলেন প্রথম যুগ্মসম্পাদক। ঠিক হল, সুষমা সিংহই প্রধানাশিক্ষিকার কাজ চালাবেন। যাঁরা এই স্কুলে পড়াবেন, তাঁরা কোনও মাইনে নেবেন না। ১৯৪৩ সালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পুত্র মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ১১ বিঘা জমি সমেত বাড়িটি স্কুলকে দান করেন এবং মণীন্দ্রচন্দ্রের স্ত্রী'র নামে স্কুলের নাম রাখা হয়, মহারানি কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়। বহরমপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র কৃষ্ণনাথ রোডের উপর অবস্থিত এই স্কুলটি এখন শুধু শহর বহরমপুর নয়, সারা মুর্শিদাবাদ জেলার গর্ব।

বহরমপুর কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রী-সংখ্যা প্রায় ৯০০। স্কুলের পরীক্ষার ফলাফলও ভাল। ১৯৮৫ সালে এই

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৯৭ জন। প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল ২৭ জন। দ্বিতীয় বিভাগে ৪৫ জন। তৃতীয় বিভাগে ২২ জন। ১৯৮৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯৭। প্রথম বিভাগ ১০। দ্বিতীয় বিভাগ ৩১। তৃতীয় বিভাগ ১৮। এই স্কুলের বহু ছাত্রী ভবিষ্যৎ-জীবনে নানা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মঞ্জু গুপ্ত, মুক্তি সান্যাল (মৈত্র), মাধুরী বসু (ঘোষ), ডাঃ উর্মিলা দাশগুপ্ত, ডাঃ তোষিণী ঘোষ, ডাঃ সুনন্দা রায়, অভিনেত্রী মঞ্জু দে, ডঃ স্বস্তি সান্যাল, ডঃ চৈতালি সাহা, ডঃ মিনতি সেন, কমলা মাহাতো, নিয়তি সিংহ এবং কমল বসু (মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সহধর্মিণী) কৃতী ছাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম।

স্বাধীনতা আন্দোলনে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও উল্লেখ করবার মতো। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত স্কুলের ছাত্রীরা সবরকম জাতীয়তাবাদী সভা-সমিতি মিছিলে যোগ দিয়ে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে ছাত্রীরা সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে নোয়াখালির দাঙ্গাপীড়িতদের জন্যে অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলেন। পরে ওই সংগৃহীত জিনিসপত্র নিয়ে স্কুলের তৎকালীন প্রধানাশিক্ষিকা পুষ্পময়ী বসু গান্ধীজির সঙ্গে নোয়াখালি গিয়েছিলেন।

বহরমপুর মহারানি কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানাশিক্ষিকা শ্রীমতী গায়ত্রী নাগ (ঘোষ)। ১৯৪৯ সালে এই স্কুলে তিনি সহ-শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮২ সাল থেকে তিনি প্রধানাশিক্ষিকা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. শ্রীমতী নাগ ক্লাসে বাংলা ও ভূগোল পড়ান।

আলোচনার শুরুতেই প্রধানাশিক্ষিকা শ্রীমতী নাগ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রাক্তন প্রধানাশিক্ষিকা পুষ্পময়ী বসুর কথা উল্লেখ করলেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এই স্কুলের প্রধানাশিক্ষিকা ছিলেন পুষ্পময়ী। বলতে গেলে, তিনি এই স্কুলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি শুধু প্রধানাশিক্ষিকাই

শ্রীমতী গায়ত্রী নাগ, প্রধানাশিক্ষিকা

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

বহরমপুর মহারানি কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল সুতৃষ্ণা মিত্র। ফাইভ থেকে এই স্কুলে পড়ছে সুতৃষ্ণা, ফাইভ ও সিক্সে সেকেণ্ড হয়েছিল, তারপর থেকে প্রতিটি ক্লাসেই ফার্স্ট হচ্ছে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় ৯০০ নম্বরের মধ্যে ৭৫৪ পেয়েছিল সুতৃষ্ণা। সেকেণ্ড গার্ল দেবারতি দাশগুপ্ত ও থার্ড গার্ল সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পড়াশোনার ব্যাপারে সুতৃষ্ণার বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

সুতৃষ্ণার বাবা শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র পূর্ব রেলের পদস্থ অফিসার, মা শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র অধ্যাপিকা। সুতৃষ্ণার প্রাইভেট টিউটর তিনজন। ওর মা ওকে নানা বিষয়ে সাহায্য করেন। সুতৃষ্ণা জানাল, "লাইফ সায়েন্স বিষয়টিকে আগে বেশ খটোমটো মনে হত। কিন্তু এখন মা এত সাহায্য করেন যে, এই বিষয়টিকে আর তত গোলমেলে মনে হয় না।" ওর প্রিয় বিষয়, অঙ্ক। অঙ্ক ওর কাছে মাথা খাটাবার বিষয়, বুদ্ধির বিষয়, যুক্তির বিষয়। এই বিষয়টিকে ও শুধু ভালই বাসে না, সমীহও করে। সারাদিনে পাঁচ-ছ' ঘণ্টা পড়ে সুতৃষ্ণা। ছুটির দিনে আরও ঘণ্টাখানেক সময় বেশি পড়ে।

সুতৃষ্ণা খুব গুণী মেয়ে। ও নাচ জানে। বিজ্ঞানসংক্রান্ত মডেল তৈরি করে পুরস্কার পেয়েছে। জেলা বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে প্রথম হয়েছে। ও আবৃত্তিও করে। এত গুণ ওর, অথচ একটুও অহঙ্কার নেই। গল্পের বই পড়তেও ও খুব ভালবাসে। কিছুদিন আগে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী উপহার পেয়েছে ও। এই বইটি এখন সুতৃষ্ণার সব সময়ের সঙ্গী। সত্যজিৎ রায় ওর প্রিয় লেখক।

সুতৃষ্ণা খেলাধুলো করতে যত না ভালবাসে, তার চেয়ে বেশি ভালবাসে খেলা দেখতে। গাওস্কর ওর প্রিয় খেলোয়াড়।

সুতৃষ্ণার ইচ্ছে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। ওর বড়মামা মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর মতো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সুতৃষ্ণা পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরতে চায়। সেইজন্য সুতৃষ্ণা প্রযুক্তিবিদ্যার নানা খবর এখন থেকে সংগ্রহ করছে।

মাধ্যমিকে কী রকম রেজাল্ট করবে সুতৃষ্ণা?

শান্ত, লাজুক স্বভাবের মেয়েটির চটপট উত্তর, "চেষ্টা তো করছি, কিন্তু কতদূর কী করতে পারব, জানি না। পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে এক্ষুনি কিছু ভাবছি না। ফাঁকি না দিয়ে পড়াশুনো করছি, যা হয় হবে।"

বাংলা ও ভূগোল ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে, পঠনপাঠনের বিভিন্ন দিক ও পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে প্রধানাশিক্ষিকা সুদীর্ঘ আলোচনা করলেন। তাঁর মতে, প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যবই বারবার পড়তে হবে। একটি বই নয়, একাধিক বই। চার পাতা পড়ার পর অন্তত আট পাতা লিখতে হবে। এতে লেখার অভ্যাস বাড়বে। পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্নই আসুক, লিখতে অসুবিধে হবে না। লেখার পর সেই খাতা মাস্টারমশাই বা বড়দের কাউকে দেখিয়ে নিলে বানান-ভুল, গুরুচণ্ডালী দোষ ইত্যাদি এড়ানো সম্ভবপর হবে। **হাতের লেখাও যথাসম্ভব ভাল করতে হবে। বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই হাতের লেখার যত্ন নেয় না। হাতের লেখা ভাল করার জন্যও একটু পরিশ্রম দরকার। ভাল হাতের লেখা পরীক্ষককে প্রসন্ন করে, এবং সেই প্রসন্নতার প্রতিফলন ঘটে উত্তরপত্রে।** নিয়মিত সংবাদপত্র ও দেশ-বিদেশের নামী লেখকদের বই পড়া উচিত। এই ধরনের পড়াশোনা আমাদের ভাবনার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও চিন্তাকে প্রসারিত করে।

ইংরেজি, বাংলা, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস যে বিষয়ই হোক, সেই বিষয়ের বইটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে হবে। **একটি বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছি বলে কিংবা একটি বিষয় পড়তে ভাল লাগে বলে অন্য বিষয়কে অবহেলা করা চলবে না। তার ফল বিষম হয়। যে বিষয়টিকে সহজ মনে হয়, সে বিষয়টি কিন্তু আদৌ সহজ না।** একটি সহজ বিষয় ভালভাবে পড়া না থাকার ফলে পরীক্ষার সময় আমাদের যে কী ভয়ানক অসুবিধেয় ফেলে দেয় তা তো আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখছি। কাজেই অতি সহজ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পড়া উচিত। বাংলা ইংরেজির জন্য গ্রামার বা ব্যাকরণ অংশটিকেও পড়তে হবে মন দিয়ে। **শক্ত-শক্ত বানানগুলি অনেক সময় খুব সমস্যায় ফেলে। এদিকে সতর্ক থাকতে হবে।** অঙ্কে অনুশীলনই শেষ কথা। ভূগোলে ম্যাপের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাপ আঁকার কাজটি ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে। ইতিহাসে গুলতাপ্পির কোনও সুযোগ নেই। ইতিহাসের মতো এমন চমৎকার জীবন্ত বিষয় আর দুটি নেই। এই বিষয়ে বেশি লেখার দিকে অনেকের প্রবণতা আছে। এটা মোটেই ঠিক নয়। উত্তর হবে প্রাঞ্জল, তথ্যানুগ এবং সংক্ষিপ্ত।

শ্যামলকান্তি দাশ

ফোটো : রাজীব বসু

ছিলেন না, সমাজসেবিকা এবং লেখিকা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' ও ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' অনুবাদ করে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। কথায়-কথায় শ্রীমতী নাগ জানালেন, "এই স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রীই সম্পন্ন পরিবারের। অনেকেই পড়তে চায় এই স্কুলে। কিন্তু কী করব বলুন, সাধ আছে সাধ্য নেই। জায়গার ভয়ানক অনটন। শুধু জায়গার অভাবে আমরা কত মেয়েকে যে ফিরিয়ে দিই তার হিসেব নেই।" প্রধানাশিক্ষিকা আরও বললেন, "আমাদের স্কুলে ছাত্রীদের টিফিন দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা মুর্শিদাবাদ জেলার অন্য কোনও স্কুলে নেই।"

স্টার ওয়ারস

লেখা : আর্চি গুডউইন □ ছবি : আল উইলিয়ামসন

স্টার ওয়ার্স

লেখা : আর্চ গুডউইন □ ছবি : আল উইলিয়ামসন

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

তোমরা নিশ্চয়ই গিটার কথাটির ইংরেজি বানানটি জানো ? যদি না জানো, তা হলে ইংরেজি অভিধানে দেখে নাও । যে অভিধানই নাও না কেন, দেখবে তাতে বানান দেওয়া আছে GUITAR, আসলে এটি আরবি শব্দ । এটি গ্রিক ভাষায় হয়েছে KITHARA, এটিই আবার অস্ট্রিয়ায় জিথার এবং ভারতে এসে সম্ভবত এটাই হয়েছে সিতার ! যাই হোক, ভাষার মধ্যে না গিয়ে কেবল বানান নিয়েই কথা বলি । কলকাতার দূরদর্শন কিন্তু GUITAR কথাটি লেখেন না, লেখেন GUITER ! এঁদের আরও একটি মুশকিল হয় দেখি, এঁরা পরমাণুকে অনেক সময়ে অণু বলেই কাজ সারেন । অণু এবং পরমাণু দুটি আলাদা ব্যাপার । অ্যাটমিক এনার্জির বাংলা হবে পরমাণু শক্তি, আণবিক শক্তি একেবারেই নয় । কিন্তু অনেক সময়েই দূরদর্শনের সংবাদে এই ভুল কথাটিই বলা হয় । খুব আশ্চর্য নয় কি ? তোমরা কিন্তু এই ভুলটি কখনওই করবে না ! এবারে আমার নিজের একটি ভুল স্বীকার করি । টেলিভিশন উদ্ভাবকদের মধ্যে আমি কতকগুলি নাম দিয়েছিলাম । কিন্তু বেয়ার্ড-এর নামটি উল্লেখ করিনি । বেয়ার্ডের পুরো নাম জন লোগি বেয়ার্ড । জন্ম স্কটল্যাণ্ডে ১৮৮৮ সালে, মৃত্যু ১৯৪৬ সালে । ১৯২৬ সালে ইনি যে ধরনের টেলিভিশন উদ্ভাবন করেন, সেটাই আধুনিক টেলিভিশনের আদি সংস্করণ । মাত্র একজন আমার এই ভুলটির

এয়ার হোস্টেস

চমৎকার অনুষ্ঠান 'দি কোয়েস্ট'

ছোটী বড়ী বাতেঁ

কথা চিঠিতে লিখে জানিয়েছেন, বিধাননগর থেকে সুদর্শন মাইতি । প্রাপ্তি স্বীকার একটু দেরি হয়ে গেল ।

শিবপুর থেকে বাপ্পাদিত্য হালদার লিখেছেন, 'বিক্রম আউর বেতাল -এর মতো রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি শিক্ষামূলক ছবি দেখানো হলে খুবই আনন্দিত হই ।' কলকাতা থেকে মধুমিতা মুখার্জি সত্যজিৎ রে প্রেজেন্টস্-এর 'দি স্টুডিও' সম্পর্কে বলেছেন, 'মূল গল্পে আর টিভির ছবিতে গল্পের কিছু বিভিন্নতা আছে ।' সেটা তাঁর ভাল লাগেনি । ভাল লাগা না লাগা নিয়ে কিছু বলার নেই, তবে এটাও ঠিক লেখা গল্প আর ছবির গল্পের মধ্যে অনেক পার্থক্য থেকে যেতে পারে, সেটা কিন্তু পরিচালকের দোষ বলে মনে হয় না । আবার যদি পরিচিত গল্পের সঙ্গে ছবির মূল বক্তব্যের পার্থক্য বিরাট হয়, সেটাও মনে হয় ঠিক নয় । তাতে দর্শকের একটা আশাভঙ্গ ঘটে । তবে কেউ-কেউ বলেন, যেহেতু দুটি আলাদা শিল্পমাধ্যম, সেজন্য পরিচালকের স্বাধীনতা অনেকটাই । এ-নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে এবং তার সমাধান কিন্তু হয়নি । বোধহয় এর সমাধান না হওয়াই ভাল !

এবারে একটা চমৎকার অনুষ্ঠানের কথা বলি । সেদিন হঠাৎ দেখে ফেললাম কলকাতা দূরদর্শন আয়োজিত 'দি কোয়েস্ট' নামের একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক অনুষ্ঠান । আমার টিভিসেট সাদা-কালো হলেও, বুঝতে পারছিলাম যাঁদের রঙিন টিভি আছে, তাঁদের এই ধরনের বিজ্ঞান-কর্মসূচি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি বোধহয় আরও ভাল লাগবে । তবে কেবল সাদা-কালো টিভিও চমৎকার হতে পারে । কোনও-কোনও অনুষ্ঠান আবার অনেকের সাদা-কালোতেই দেখতে বেশি ভাল লাগে ।

'দি কোয়েস্ট'-এ দুটি দল, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে এই দুটি দল চিহ্নিত । এটি বৈজ্ঞানিক ধাঁধার ক্লাস বলা যায় । দুটি দলে সব সমেত বারোজন থাকেন, এঁরা ১১-১২ ক্লাসে পড়েন । কিন্তু পড়লে কী হবে, ওঁরা যা জানেন, তা তাক লাগিয়ে দেয় । কোনও একটি ব্যাপার এই অনুষ্ঠানে দেখানো হয়, প্রত্যেকেই সেটা দেখতে পান, এমনকী টিভির দর্শকদের জন্য আরও কাছ থেকে দেখানো হয় । যেমন, যদি হাওয়ার বা অন্য কোনও বাধা না থাকে, তা হলে একটা হাল্কা জিনিস এবং একটা ভারী জিনিস একই উচ্চতা থেকে ফেললে মাটিতে পড়তে একই সময় নেবে, এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য । কিন্তু এটি কেমন করে প্রমাণ করা যাবে ? একটা মুদ্রা, একটা কাঁচি এবং একটা কাগজ দেওয়া হল । এগুলির সাহায্যেই প্রমাণ করতে হবে । ছাত্রদের এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে বলা হল । এই ব্যাপারটি আমার মোটামুটি জানা ছিল । কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠিকমতো ভেবে উঠতে পারিনি । ব্যাপারটি খুবই সহজ (বলে দিলে যা হয় আর কী !), কাগজটিকে মুদ্রার চেয়ে সামান্য ছোট করে কাটতে হবে, তারপর মুদ্রাটির উপর কাগজটিকে আলতোভাবে রেখে দিতে হবে । এবং দু-তিন ফুট উচ্চতা থেকে মুদ্রাটিকে ফেললে দেখা যাবে, দুটি একই সঙ্গে নেমে এল মাটির দিকে । যদিও হাওয়া বাধার সৃষ্টি করেছিল, তবু এই নিয়ে একটি বিশ্ববিখ্যাত পরীক্ষা করা হয়েছিল ইতালির পিসার হেলানো টাওয়ার থেকে অনেক বছর আগে । এটি পরিচালনা করেন বিড়লা মিউজিয়ামের পরিচালক সমর বাগচি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের বিজ্ঞান সংক্রান্ত অফিসার পার্থ ঘোষ । একজন জানালেন, এই অনুষ্ঠানটি বিদেশেও আগ্রহের সঞ্চার করেছে । কলকাতা থেকে এই ধরনের আরও বেশি অনুষ্ঠান—ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে করা দরকার । বিশেষ করে দরকার বাংলা শেখানোর ব্যবস্থা । সপ্তাহে কুড়ি মিনিটের দুটো ক্লাস কি করা যায় না ? কিংবা অন্তত একটি ?

দিগ্‌দর্শক

"ঠেকে শিখবেন কেন? দেখেই শিখুন না!"

সস্তা পাউডারগুলো ন্যাটের মত পরিস্কার তো করেই না, ভালো জামাকাপড় নষ্ট করে

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হাল্কা অথচ ময়লা ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অ্যাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। ফলে জামাকাপড় নষ্ট হয় না কাপড়কাচা হাতও যত্নে থাকে। সাধে কি বলি–

এতটুকু ন্যাটের ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

A Kusum Product | আস্থার সঙ্গে কিনুন

GK&E.C85.43

শশঙ্গাসন

জ্ঞাতব্য নির্দেশ ও সতর্কতা : শিরদাঁড়ার নমনীয়তা কম থাকলে, অনেক সময় গোড়ালি ধরে কপালে হাঁটু ঠেকানো সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় জোর করে কপাল ঠেকাতে গেলে ঘাড়ে বা কোমরে চোট পেতে পারেন। তাই প্রথমে জানু ধরে সতর্কতার সঙ্গে ধীরে-ধীরে সামনে ঝোঁকার চেষ্টা করবেন। রেটিনাইটিস্ বা সারভাইক্যাল স্পণ্ডিলাইটিস্ থাকলে শশঙ্গাসন করবেন না।

উপকার : স্মরণশক্তিহীনতা, টনসিলের দোষ, মস্তিষ্কের অবসাদ রোগে এ আসনটি খুব উপকারী। এই আসন নিয়মিতভাবে করার ফলে মেরুদণ্ডের বত্রিশটি সংযোগস্থল ও মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত সুষুম্না নাড়ী সুস্থ ও সাবলীল থাকে। তাতে অটুট যৌবন ও দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। এবং মেরুদণ্ডের সংযোগস্থলগুলিতে যে এক ধরনের কচকচে পদার্থ আছে, যাকে ইংরেজিতে

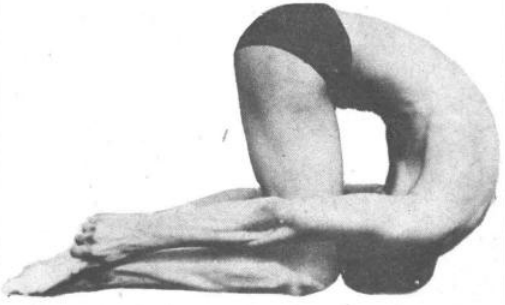

কার্টিলেজ বলে, সেগুলির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় না। ফলে শরীরের সমস্ত স্নায়ু, যা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে গিয়েছে, সেগুলি ভালভাবে সক্রিয় থাকে। দেখা গেছে, মেরুদণ্ড বাঁকা থাকলে অথবা কোনও রোগ বা আঘাতে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত কার্টিলেজগুলির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে গেলে, সেই স্থান দিয়ে যেসব স্নায়ু শরীরের পেশি ও যন্ত্রাদিতে গিয়েছে, সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ওই পেশি ও যন্ত্রাদি অকেজো, এমনকী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। যোগ-ব্যায়াম দ্বারা মেরুদণ্ডকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুললে, স্নায়ুগুলি আবার উজ্জীবিত হয়ে পেশি ও অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদিকে সুস্থ ও কর্মতৎপর করে তোলে। তা ছাড়া মেরুদণ্ডে লম্বালম্বি টান পড়ার ফলে, মেরুদণ্ড নিজের দৈর্ঘ্যের দেড়গুণ বড় হয়ে যায়। সেই জন্য আসনটি প্রত্যহ অভ্যাস করলে কিছু লম্বা হওয়া যায়। এই আসন পরিপাকশক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে সাহায্য করে। এতে থাইরয়েড গ্রন্থি সুস্থ থাকে। ফলে অস্বাভাবিক স্থূলতা অথবা অত্যধিক শীর্ণতা আসতে পারে না। মাথার ব্যথা ও ক্লান্তি দূর করতে এ আসনটি সহায়ক।

বিশ্বনাথ ঘোষ
প্রেমসুন্দর দাস

ফোটো : দিব্যসুন্দর দাস

ম্যাজিক

তাসের রঙ-বদল

দু' রঙের দুটো রঙিন কাগজ, ধরো গোলাপি আর বেগুনি, আর আধ ডজন পুরনো পোস্টকার্ড জোগাড় করো। পোস্টকার্ডগুলো তাসের মাপে কেটে নাও, মোট বারোটা কাটবে। এই কাটা টুকরোগুলোর একদিকে লাগাও বেগুনি কাগজ। এবার এর থেকে ছ'টা নিয়ে উলটো পিঠে লাগাও ফের বেগুনি রঙের কাগজ, এবং বাকি ছ'টার উলটো পিঠে সাঁটো গোলাপি রঙের কাগজ। এবার তা হলে তৈরি হল মোট বারোটা তাস। এর মধ্যে ছ'টার দু' দিকেই বেগুনি রঙ, আর বাকি ছ'টা তাসের এক পিঠে গোলাপি ও অন্য পিঠে বেগুনি রঙ। যে ছ'টা তাসের দু'দিকে দু' রঙ, তার গোলাপি দিকটা ওপরে নিয়ে পরপর সাজিয়ে নাও। এই ছ'টা তাসের ওপরে রাখো ছ'টা দু'দিক

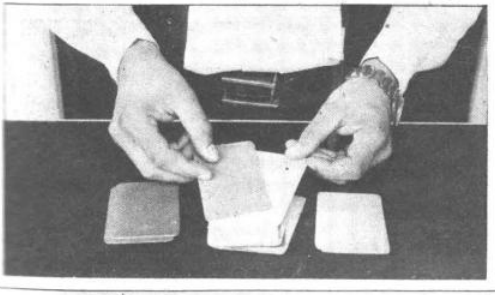

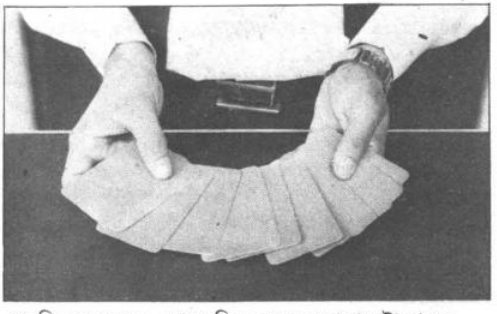

বেগুনি রঙের তাস। এবার তুমি দর্শকের সামনে টেবিলের ওপর একদিকে রাখো ওপরের ছ'টা তাস, অন্য দিকে পরের ছ'টা। এই দুই থাক থেকে তুমি এক-একটা করে তাস নিয়ে একটা স্তূপ তৈরি করো। প্রথমে একটি বেগুনি তাস রাখবে, পরে একটি গোলাপি (যার উলটো দিকে বেগুনি)। এইভাবে পরপর রেখে যাও। এবার পুরো স্তূপটা হাতে তুলে নাও। নেবার সময় পুরো বারোটা তাসের স্তূপটাকেই, দর্শকের অজান্তে হাতের মধ্যে উলটে নাও। এবার সেই ওলটানো স্তূপ থেকে টেবিলের ওপর এক-এক করে সব ক'টা ফেলে যাও। বন্ধুরা অবাক হয়ে দেখবে, গোলাপি তাস বলে আর কিছু নেই। সব ক'টা তাসই ম্যাজিকে কীভাবে যেন বেগুনি তাস হয়ে গেছে!

(জাদুকর) তাপস বসু

হঠাৎ অন্ধকার

কথাবার্তার মাঝখানে দপ করে আলো নিবে গেল । খোঁজ, খোঁজ, কোথায় টর্চ,

কোথায় কেরাসিন-বাতি, কোথায় দেশলাই ।

Neighbour Mr Narayan's uncle Mr Mangalmurti asked, "Is it a power-cut, or is there a fuse blown somewhere?"

"Must be a power-cut," said Mr Ray. "We have one quite often."

Chambal said, "Last summer we had power-cuts daily."

Mrs Roy said, "Yes, we're much better off this year. Do you have power-cuts in Madras, Mr Mangalmurti?"

"Most certainly we do, Mrs Roy," said Mr Mangalmurti. "But our main headache is water-supply."

Mr Roy said, "Yes, I do seem to recall that you had something like a water-famine last year."

Mr Mangalmurti said, "It was terrible. Of course, in many parts of the country they have water-famines yearly. But in a city they should organize these things better. Here in Calcutta you manage the task well."

"Not nearly as well as we ought to," said Mr Roy. "And you mustn't forget that we have a big river flowing by. We simply lift the water and purify it. In Madras you must also bring it from some distance."

"Yes, we have to do that, too," Mr Mangalmurti agreed.

এবারেও লক্ষ করো বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াবিশেষণ কোথায় বসছে ।

Position of adverbs

Last year we had power-cuts *daily*.
They have water-famines *yearly*.

কত সময় অন্তর-অন্তর একটি

ঘটনা ঘটে, সেটা নির্দিষ্ট করে যে ক্রিয়াবিশেষণের সাহায্যে বোঝানো হয়, সেই ক্রিয়াবিশেষণ সাধারণত বাক্যের শেষে বসে । ওপরে তার উদাহরণ দেখলে । আবার, যে ক্রিয়াবিশেষণে কোনও কাজ-করার গুণাগুণ বোঝায়, সেটিও বসে সাধারণত বাক্যের শেষে । যেমন,

They should organize these things *better*.
You manage the task *well*.

কিন্তু যে সব ক্রিয়াবিশেষণ বাক্যাংশের মধ্যেকার কোনও একটি অংশের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেগুলি শেষে বসে না, মাঝখানে বসে । যেমন,

We *simply* lift the water.
You *also* have to bring it.

কিন্তু এই তিনটি ক্রিয়াবিশেষণের বেলায় এ রীতি খাটে না :

too, either, as well.
We have to do that, *too*.

প্রসাদ

অর্থ জানো

খিলাত...তরিবত

কত দূর-দেশী পাখি কত পথ পার হয়ে এই বাংলার শ্যামলিমায় এসে নীড় বাঁধে । তেমনই দূর-দেশী কত শব্দও এ-দেশে এসেছে, কিন্তু আর ফিরে যায়নি । বাংলার টানে তারা বাঁধা পড়ে গেছে চিরকালের মতো । নীচের ওই বিদেশী শব্দগুলির প্রতিটির পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে । যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে । সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে । শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে ।

১ । **খিলাত**—(ক) রাজার দেওয়া সম্মানসূচক উপাধি, (খ) রাজার দেওয়া সম্মানসূচক উচ্চপদ, (গ) রাজার দেওয়া সম্মানসূচক পোশাক, (ঘ) রাজার দেওয়া সম্মানসূচক রত্নমালা ।

২ । **ইনাম**—(ক) সম্মান, (খ) দান, (গ) পুরস্কার, (ঘ) গৌরব ।

৩ । **নাজুক**—(ক) লজ্জাবতী, (খ) কোমল, (গ) ক্ষুদ্র, (ঘ) দুর্বল ।

৪ । **তরিবত**—(ক) আরাম, (খ) আয়োজন, (গ) চেষ্টা, (ঘ) শিক্ষা ।

৫ । **খোয়াব**—(ক) কল্পনা, (খ) স্বপ্ন, (গ) সৌভাগ্য, (ঘ) ধনদৌলত ।

উত্তর : ১ । খিলাত—(গ) রাজার দেওয়া সম্মানসূচক পোশাক । খিলাত আরবি শব্দ । যেমন, 'আমি নাই বা গেলেম বিলাত, নাই বা পেলেম রাজার খিলাত ।' (রবীন্দ্রনাথ) । ২ । ইনাম—(গ) পুরস্কার । আরবি শব্দ । যেমন, 'বললে, যে ঠিক বলবে তারে পাঁচটি টাকা ইনাম দেব ।' (সুনির্মল বসু) । ৩ । নাজুক—(খ) কোমল । ফারসি শব্দ । যেমন, 'আমার চাইতে তাঁর গলা ঢের বেশি নাজুক ও সুরেলা ।' (প্রমথ চৌধুরী) । ৪ । তরিবত—(ঘ) শিক্ষা বা তালিম । এটিও আরবি শব্দ । যেমন, 'ভদ্রলোকের খাওয়ার তরিবতটা দেখবার মতো, যেন পাকা সার্জনের অপারেশন ।' (মুজতবা আলী) । ৫ । খোয়াব—(খ) স্বপ্ন । এর মূলে আছে ফারসি শব্দ খ্‌বাব । যেমন, 'আয় বাঁদি তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখেছি ।' (ক্ষীরোদপ্রসাদ) । বাঁদি শব্দটিও ফারসি ।

দেব-সেনাপতি

গাবলু
গাবলু,- আমি কাতলাকাকা বলছি, তোমাকে একটা কাজ দেব।
বাইরে যাচ্ছি। 'মোটুস' ও 'ছোটুস' আমার এই কুকুর দুটোকে শুধু খাওয়াতে হবে।
১ টাকা
খাবার ও বাসন গ্যারাজে থাকল।
মোটুস
ছোটুস

গাবলু
আইসক্রিম
আইসক্রিম
আইসক্রিম
মিনিটখানেকের মধ্যেই খেতে দিচ্ছি

আমি সানন্দা

বাঙালি ঐতিহ্যের মধ্যেই আনি নতুনের ছোঁয়া

বাঙালি সাবেকিয়ানা আমার খুব
মন টানে। আটপৌরে শাড়ি, সিঁদুরের টিপ, সন্ধ্যেবেলা
শাঁখের আওয়াজ, ধূপ-ধুনোর গন্ধ আমার খুব ভাল লা
ভাল লাগে কালিঘাটের পট আর রবীন্দ্রসঙ্গীত।
মাঝে মধ্যে, কোন সুন্দর প্রাচীন প্রথাকে আরও সুন্দর
করার জন্যে জুড়ে দিই আমার নিজের স্টাইলের ছোঁয়া

অবশ্য একালের জগৎ
নিয়েও আমার কৌতূহল অসীম।
বাড়ির গিন্নিদের মাইনে দাবির
আন্দোলন, রাজনীতিতে
মেয়েদের শক্তি, মুনমুন সে
সৌন্দর্যের রহস্য, ক্রস-স্টিচ্
সেলাই রপ্ত করার উপায়,
চাউমিন রাঁধার নিয়ম, শংকরে
গল্প, দেশ-বিদেশের খবর, চাকু
গিন্নির সাত ঝামেলার কথা, যন্ত্রণ
ছাড়া প্রসব সম্পর্কে ডাক্তারি মতা
....এই সবেতেই আমার আগ্রহ আছে

এবার শুধু বাকি আপনার সঙ্গে আলা

সানন্দা

একালের মেয়েদের একমাত্র বাংলা ম্যাগাজিন

সম্পাদক অপর্ণা সেন

আনন্দবাজারের নতুন নিবেদন

টিউলিপের দেশে

পৃথিবীতে যত রকম রঙ হতে পারে, সেই সব রঙের টিউলিপ ও ওই ফুলের মতোই সুন্দর দেশ হল্যাণ্ড। আছে উইণ্ডমিল, ফুলের বাজার ও রঙিন নানা শহর। দেশটি সদ্য ঘুরে এসে তারই বিবরণ দিয়েছেন লেখিকা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

মাঠ জুড়ে টিউলিপের চাষ
ফোটো : বিশ্বরঞ্জন সরকার

একটা চলতি কথা আছে, 'ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ডাচরা সৃষ্টি করেছে হল্যাণ্ড।' কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। হাজার বছর আগে যদি বিমানে চেপে হল্যাণ্ডে যাওয়া যেত, তা হলে সেখানে আকাশ থেকে দেখা যেত উত্তর সাগরের তীরে মাত্র একটা লম্বা বালিয়াড়ির সারি। তার পেছনে দেখা যেত জলাভূমি আর হ্রদ। তারও পেছনে দেশের মাঝখানে দেখা যেত জঙ্গল আর জলাঘাস। কিন্তু আজ যদি বিমানে চেপে কেউ হল্যাণ্ডে যায়, দেখবে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে সেই দৃশ্যের। জলাভূমি আর হ্রদের বদলে সমস্ত দেশটা ভরে আছে সবুজ চাষ করা খেতে, মধ্যে-মধ্যে খাল, বর্ধিষ্ণু গ্রাম আর শহর। এ-সবই মানুষ তৈরি করেছে নিজের হাতে, গায়েগতরে খেটে, সমুদ্রের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে। জলাভূমি বা হ্রদের চারপাশে ডাইক বা উঁচু বাঁধ বেঁধে উইণ্ডমিলের সাহায্যে শুরু হল জলের সঙ্গে যুদ্ধ। তখন তো বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয়নি। তাই হাওয়ার গতিবেগ দিয়ে উইণ্ডমিলের সাহায্যে জল পাম্প করে বার করে দেওয়া হত। এই রকম জল বার করে নেওয়া অঞ্চলকে বলা হয় পোল্ডার। এই সব পোল্ডার খুব উর্বর। খাল কেটে, সেই খালের মধ্যে দিয়ে চালিত করা হয় হ্রদ থেকে বার করা জল।

এরকম একটা সুন্দর দেশের প্রধান শহর আমস্টারডামের এয়ারপোর্ট স্কিপোলে এসে নামলাম মে মাসের এক সকালবেলা। এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দেখলাম বেশ গরম। ওভারকোট খুলে ফেলতে হল। আমস্টারডামের ঠিক মাঝখানে ড্যাম স্কোয়ারে হোটেল কারসনোপলস্কি পৌঁছে খোঁজ নিয়ে জানলাম আমস্টারডামের বিখ্যাত টিউলিপ-গার্ডেনে একটা হাফ-ডে ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। কাছেই ট্যুরিস্ট অফিস। তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে উঠে বসলাম বাসে। পরিচ্ছন্ন রাস্তা বেয়ে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাস এগিয়ে চলল কেউকেনহফ্ টিউলিপ বাগানের দিকে। পথে অনেক সাইকেল চোখে পড়ল। আমস্টারডাম শহরে সাইকেল চালানোর জন্যে আছে আলাদা রাস্তা। মাথা পিছু প্রতি দু'জনের জন্যে একটি করে সাইকেল। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সকলেই দলে-দলে সাইকেল চালাচ্ছে, সে এক সুন্দর দৃশ্য!

গরমকালই টিউলিপের মরসুম। বাগানে পৌঁছে দেখলাম, সে যেন এক খুনখারাপি ব্যাপার— রঙে-রঙে ছয়লাপ। গ্রিন হাউসে কাচের ঘরের মধ্যে সাদা থেকে আরম্ভ করে লাল, বেগুনি, হলুদ, নীল, মেরুন,

হল্যাণ্ডের বিখ্যাত উইণ্ডমিল

কালচে-লাল বা ব্ল্যাক প্রিন্স—পৃথিবীতে যত রকম রঙ হতে পারে সেই রঙের টিউলিপ। এ ছাড়াও আছে নানা রকমের, নানা রঙের বড়-বড় লিলিজাতীয় ফুল। কাচের ঘরের বাইরেও মাঠ জুড়ে টিউলিপের চাষ। কেউ যেন সারা মাঠে আবির ঢেলে রেখেছে। একরের পর একর জুড়ে লালে-লাল, হলুদে-হলুদ।

অপেক্ষাকৃত ছোট চারাগাছগুলো ঢাকা দেওয়া হয়েছে একরকম পলিথিন বা প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে। দূর থেকে দেখলে রোদে যেন চকচকে রুপোলি বিছানার মতো মনে হয়। প্রতিটি ফুলের বীজ বিক্রি হচ্ছে ফুলের ছবি আঁকা খামে, বিক্রি হচ্ছে লিলিফুলের পেঁয়াজের মতো শিকড় বা বাল্ব। বাগান সংলগ্ন দোকানে নানান জিনিসপত্র ও স্যুভেনিয়ারের মধ্যে একরকম কাঠের তৈরি জুতোও দেখলাম, যা হল্যাণ্ডবাসীরা লোকনৃত্যের সময় পরেন।

এরপরে গেলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সেখানে খোলা আকাশের নীচে নানান ফুল-পাতার সমারোহ। দুটি বিশাল কাচের ঘরে বা গ্রিন হাউসে আছে কেউকেনহফ্ গার্ডেনের চেয়েও চোখ-ধাঁধানো টিউলিপের সম্ভার। ফেরার পথে লক্ষ করলাম চারিদিকেই গ্রিন হাউস। সব গ্রিন হাউসেই টিউলিপের চাষ। মাঠে-মাঠে যতদূর চোখ যায় প্লাস্টিক বা পলিথিনের চাদরের নীচে টিউলিপের চারা। এই চাদর ঢাকা দেওয়া হয় যাতে রোদে, বৃষ্টিতে বা ঠাণ্ডায় চারাগুলো নষ্ট না হয়ে যায়।

পরদিন আর একটা ট্যুরে গেলাম, গ্র্যাণ্ড হল্যাণ্ড ট্যুর। সকালবেলা থেকেই আকাশের মুখ ভার। ঝোড়ো হাওয়া, টিপটিপ বৃষ্টি। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে আবার। এই ঠাণ্ডা এই রোদ্দুর, আবহাওয়ার কোনও ঠিকঠিকানা নেই।

প্রথমেই পৌঁছলাম অ্যালস্মির ফ্লাওয়ার অকশানের বিরাট বাড়িতে। এইটিই পৃথিবীর বৃহত্তম ফুলের নিলাম-ঘর। কত বড় যে বাড়ি আর সেখানে কত রকমের যে ফুল, না দেখলে ধারণা করা যাবে না। একতলায় ট্রলি করে সাজানো এক-এক ধরনের ফুল বিভিন্ন নিলাম-ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সিঁড়ির মতো ধাপ-ধাপ করা নিলাম-ঘর এবং তাতে বসবার সিট, প্রতি সিটে মাইক লাগানো। ক্রেতারা ট্রলির ফুল দেখে দর জানাচ্ছেন। নিলাম-ঘরে বিশেষ ধরনের ঘড়ির কাঁটা দেখে দর বুঝে নিচ্ছেন তাঁরা। তারপর ট্রলি বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দোতলার নিলাম-ঘরের বাইরে

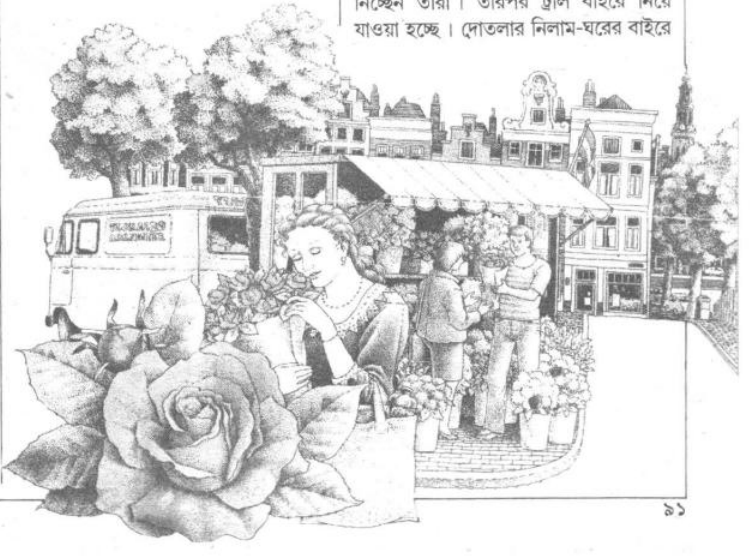

এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কাঠের সেতু। তার ওপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গোলাপ, ড্যাফোডিল, টিউলিপ এমনকী পাতাবাহারও দেখা গেল।

গ্র্যাণ্ড হল্যাণ্ড ট্রিপের এক ফাঁকে বলে নেওয়া যাক আমস্টারডাম শহর সম্বন্ধে দু-চার কথা। আমস্টারডাম হল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় শহর। হল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড়-বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, দোকানপাট সবই এখানে। আমস্টারডামকে হল্যাণ্ডের রাজধানী বলে গণ্য করা হলেও সরকারি দফতরগুলো অবশ্য আছে 'দি হেগ' শহরে।

আমস্টারডাম শহরে আছে বাঁধানো সুন্দর সুন্দর খাল আর এক হাজার সেতু। আমস্টেল নদী শহরটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। নর্থ সি ক্যানাল এই শহরকে উত্তর সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। নেদারল্যাণ্ডের সবচেয়ে ব্যস্ত বন্দর রটারডাম। আমস্টারডামের স্থান ঠিক তার পরেই। আমস্টারডামের এয়ারপোর্ট স্কিপোলের উল্লেখ আগেই করেছি। বিশাল এই এয়ারপোর্টে কুড়িটিরও বেশি আন্তর্জাতিক বিমান কোম্পানির বিমান যাতায়াত করে।

হিরে কাটা ও পালিশ করা আমস্টারডামের একটি প্রাচীন শিল্প। আমস্টারডাম শহরটি গড়ে উঠেছে একটি পাখার আকারে। তিনটি প্রধান খাল অর্ধচন্দ্রের আকারে বাণিজ্যপ্রধান শহরটিকে ঘিরে রেখেছে। দু'ধারে গাছের সারি দেওয়া খালপথ এবং পথের পাশে ১৬০০ এবং ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের ধনী ব্যবসায়ীদের তৈরি বাড়িগুলো আমস্টারডামের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে।

আমস্টারডামের সেন্ট্রাল স্কোয়ারে 'ড্যাম'-এর ওপর আছে রাজপ্রাসাদ। এখানেই আছে নিউ চার্চ। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিটি ডাচ সম্রাটকে এইখানেই রাজমুকুট পরানো হয়েছিল। আমস্টারডামের সবচেয়ে সুন্দর চার্চ অবশ্য ওল্ড চার্চ। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি এইটিই শহরের প্রাচীনতম সৌধ।

শহরের পুরনো অংশ, যেখানে ইহুদিরা থাকতেন, সেখানেই স্পিনোজা জন্মেছিলেন এবং সেখানেই থাকতেন শিল্পী রেমব্রাণ্ট। এখানকার এক গুদামে আনা ফ্র্যাঙ্ক তার বাবা-মায়ের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। এখানেই আছে সেই ঘর, যেখানে তারা নাৎসিদের হাতে ধরা পড়ার আগে দু'বছর লুকিয়ে ছিল।

গর্ব করবার মতো অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়িঘরও অনেক তৈরি হয়েছে আমস্টারডামে। তার অন্যতম নিদর্শন হল আমস্টারডামের স্টক এক্সচেঞ্জ। খুব সুন্দর এখানকার স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামে ৬০০০০ জন লোক বসে খেলা দেখতে পারে। এটি তৈরি হয়েছিল ১৯২৮ সালের ওলিম্পিকের জন্যে।

আমস্টারডামের রিজিক্স মিউজিয়ামে সবচেয়ে নামী ডাচ শিল্পীদের আঁকা ছবি আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্রটি হল রেমব্রান্টের 'নাইট ওয়াচ'। মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ামে আছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিল্পীদের আঁকা ছবি। এখানে ভ্যান গগের আঁকা অনেক বিখ্যাত চিত্র আছে।

আমস্টারডামের প্রাচীন ইতিহাসের নথিপত্র ঘেঁটে দেখলে জানা যায়, ১২০০ খ্রিস্টাব্দে এটি ছিল একটি মাছ-ধরা বন্দর। আমস্টেল নদীর একটি বাঁধের ওপর তৈরি হয়েছিল বলে এর নামকরণ করা হয় আমস্টারডাম। দি ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে আমস্টারডাম হয়ে উঠেছিল সমস্ত ইউরোপের সবচেয়ে ধনী শহর। তারপর ফ্রান্সের আক্রমণ। জুইডার জি, যা ছিল আমস্টারডামের সমুদ্র-দ্বার, তাতে ক্রমশ পলি পড়তে থাকায় আমস্টারডাম তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে শুরু করল।

নেপোলিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ অবরোধ আমস্টারডামের ব্যবসাবাণিজ্য সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলল।

নর্থ হল্যাণ্ড ক্যানাল তৈরি হল ১৮২৫ সালে, ১৯৭৬ সালে তৈরি হল নর্থ সি ক্যানাল। এরপর থেকেই আমস্টারডাম আবার সমৃদ্ধির মুখ দেখল, যদিও রটারডাম ততদিনে এক নম্বর বন্দরের আসন দখল করে নিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমস্টারডামের ব্যবসাবাণিজ্যে আবার একটু মন্দা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে মন্দা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমস্টারডামে বোমা না পড়লেও জার্মানরা বন্দরের অনেকটাই ধ্বংস করে ফেলেছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে খিদে ও শীতের তাড়নায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিল আমস্টারডামের অধিবাসীরা। যুদ্ধ শেষ হলে অবশ্য বন্দর নতুন করে তৈরি করতে বেশি সময় লাগেনি।

আমস্টারডামের প্রসঙ্গ থেকে এবার আবার ফিরে আসা যাক গ্র্যাণ্ড হল্যাণ্ড ট্রিপে। হল্যাণ্ড এখন খুবই শিল্পসমৃদ্ধ। সব কিছুই যন্ত্রে তৈরি হয়। তবু হল্যাণ্ডে হাতে-আঁকা পোর্সিলিন বাসনপত্রের কুটিরশিল্প এখনও কয়েকটা আছে। সেইরকম একটা কারখানা আমাদের দেখাতে নিয়ে যাওয়া হল। দেখলাম কী ভাবে হাতে এঁকে নকশা করে প্লেট ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। নীল রঙের কাজ করা কাপ-প্লেট থেকে শুরু করে পোর্সিলিনের পুতুল, গোরু, কুকুর সবই খুব সুন্দর। বিশেষত বড়-বড় মুখওয়ালা গোরু, বেড়াল ও কুকুরগুলো দেখতে খুবই মজার।

এবারে যাওয়া হল রটারডামে। সেখানে

এক নজরে হল্যাণ্ড—সৌধ, বাগান, উইণ্ডমিল

থেকে একটা উইণ্ডমিল দেখলেই উইণ্ডমিলে লাগানো সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে বোঝা যেত মিলটির মালিকের সুখ-সমৃদ্ধি বা দুঃখের কথা।

মসৃণ চওড়া রাস্তা বেয়ে বাস এগিয়ে চলল ম্যাডুরোডামের দিকে। এখানে একটা বিশাল বাগানের মধ্যে ছোট্ট একটা হল্যাণ্ড বা মিনি হল্যাণ্ড তৈরি করে রাখা হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত এক ইহুদি ছাত্রের স্মৃতিতে। তার বাবা-মা এই মডেলটি তৈরি করিয়েছেন। খেলনার মতো ছোট-ছোট ট্রাম-বাস চলছে। গির্জা, ট্রেন, বিমান বন্দর, রেল স্টেশন কিছুই বাদ যায়নি। একদিকে আছে জলপ্রপাত, বনজঙ্গল, পাহাড়, রোপওয়ে, বন্যপ্রাণী। রাত্রে আলো জ্বললে ম্যাডুরোডাম আরও সুন্দর দেখায়।

এবারে বাস আমস্টারডামের দিকে ফিরে

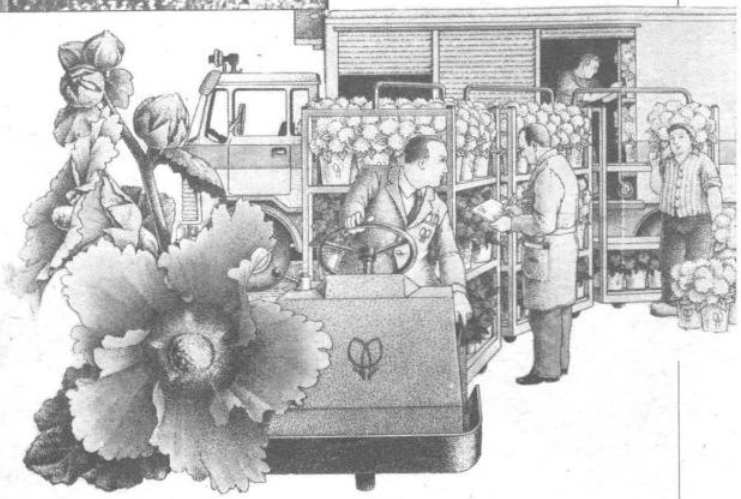

দেখা গেল, বড়-বড় জাহাজ পেন্সিলের মতো এবং আরও নানারঙের অদ্ভুত আকৃতির বাড়ি। এরপরে যাওয়া হল 'দি হেগ' শহরে। আমরা যেদিন ওই শহরে গিয়েছিলাম, সেদিন ছিল হল্যাণ্ডের নির্বাচন। অনেক দল, অনেক প্রার্থী—কিন্তু কোনও রকম হইচই নেই। সব কাজই হয়ে চলেছে শান্তিপূর্ণ ভাবে।

কাছেই উত্তর সাগর। তীরে এসে দেখা গেল অজস্র ছোট-ছোট পালতোলা বিশেষ ধরনের নৌকো নিয়ে অনেকেই নেমে পড়েছে জলে। পথের দু'পাশে সতেজ সবুজ তৃণভূমিতে চরছে মোটা-মোটা লাল ও কালো রঙের গোরু, সাদা লোমওয়ালা ভেড়া। গাইড বললেন, এখানকার গোরু প্রচুর দুধ দেয়। বেশি দুধ নিয়েই সমস্যা। এই দুধ দিয়ে তৈরি হয় চিজ ও মাখন। টিউলিপ ফুলের মতো হল্যাণ্ডের চিজও বিখ্যাত। ফুলের বাজারের মতোই আছে চিজেরও বাজার। বাজারের নাম আলকমার। কত ধরনের, কত স্বাদের যে চিজ আছে তার সংখ্যা নেই। হোটেলে দেখেছি আমরা এক মাসে যতটা চিজ খেতে পারি ডাচরা একদিনেই তা খেয়ে ফেলতে পারেন।

পথের দু'পাশে অনেক উইণ্ডমিল দেখলাম। একশো বছর আগে হল্যাণ্ডে উইণ্ডমিলের সংখ্যা ছিল ১১,০০০। কিন্তু ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২,৫০০। এখন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজারেরও কম। এখন বেশির ভাগ উইণ্ডমিলকেই ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে সরকারি তরফ থেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হচ্ছে। উইণ্ডমিলের কাজ ছিল নানা রকমের—শস্য-পেষাই, কাঠ-চেরাই, খালের জল তোলা সব কিছুর জন্যেই ছিল আলাদা আলাদা ধরনের উইণ্ডমিল। এখন সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে অতীত দিনের সাক্ষী হয়ে। উইণ্ডমিলের সাহায্যে নানারকম সাংকেতিক বার্তা বিনিময়ও করা হত। দূর

বোটানিক্যাল গার্ডেনে টিউলিপের সমারোহ

চলল। শহরগুলির রাজপথে সুন্দর বাগানে ঘেরা ইঁটের তৈরি বাড়ি। যে বাড়িগুলোর চালে খড় আছে, যেগুলোকে বলে 'থ্যাচড্ রুফ', সেগুলোই বেশি দামি। কারণ এখন আর এরকম চাল তৈরি করবার মতো কারিগর বেশি পাওয়া যায় না। এইসব বাড়িতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও উকিলদের মতো ধনীরা থাকেন।

কারসনোপলস্কি হোটেলে ফিরে এসে ডাইনিংহলে বসে, বিস্কুটের নলের মধ্যে দিয়ে চুষে-চুষে ভ্যানিলা আইসক্রিমের চকোলেট সস খেতে-খেতে, কেবলই মনে হচ্ছিল ওইরকম 'থ্যাচড্ রুফে'র নিরিবিলি বাড়িতে থেকে গেলে মন্দ হত না!

ফোটো : পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়

দরকারি শব্দটি যেখানে খুঁজে পাওয়া যায়

মণিমঞ্জুষা। জগন্নাথ চক্রবর্তী। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। ৩০.০০

বাইবেলে আছে, আদিতে ঈশ্বর ও শব্দের মধ্যে কোনও ভেদ ছিল না। এ-কথার সত্যিকারের তাৎপর্য কী, তা পণ্ডিতেরা বিচার করবেন। কিন্তু আমরা এই কথার মধ্যে একটা অন্য আভাস পেয়ে যাই ; জানতে পারি যে, শব্দের একটা নিজস্ব অলৌকিক জগৎ আছে। সেই জগতের স্বাদ পাওয়া দরকার। শব্দের অনন্ত রহস্য, প্রচণ্ড শক্তি। সেই রহস্য এবং সেই শক্তির পরিচয় না জানলে চলে না।

গানের ভিতর দিয়ে পৃথিবী দেখার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু গান আমাদের অনেক সময়ের হলেও, সব সময়ের সঙ্গী নয়। বরঞ্চ শব্দ আমাদের অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বন্ধু। শব্দের জানলা দিয়েই চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, শব্দের হাত ধরেই আমাদের দরজায় এসে পৌঁছয় বিস্তর রূপ, রস, গন্ধ, রং। শব্দ আমার ভাবনাকে অন্যের কাছে প্রকাশ করে, অন্যের ভাবনাকে আমার কাছে পৌঁছে দেয়।

শব্দের কোনও জাত নেই, ধর্ম নেই। জীবন নেই, মৃত্যু নেই। কোন অতীতে একদল নবাগত আর্য পুরুষ উত্তর ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বিদ্যুতের বেগে ছড়িয়ে যাচ্ছিলেন, আদিবাসী অনার্যদের সঙ্গে বিরোধ ও মিলনে জড়িয়ে পড়ছিলেন, সকলে মিলে গড়ে তুলছিলেন এক মিশ্র সভ্যতা। সেই সভ্যতা রণক্ষেত্রে ব্যূহ রচনা করেছে, তপোবনে ঈশ্বরের ধ্যানে নিরত থেকেছে, সংসারে বর্ণাশ্রম পালন করেছে। সে-সব ঘটনা আজ নিতান্ত ইতিহাস মাত্র, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে আজ আর তাদের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু শব্দের ভাণ্ডারে কোনও কিছুই হারিয়ে যায়নি, সংস্কৃত থেকে বাংলায় বিস্তর শব্দের মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের যাবতীয় আনন্দ ও বেদনা আমাদের হৃদয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

শব্দ মানে তো আসলে এই আনন্দ ও বেদনার কাহিনী। কবে কোন্ সময়ে কোন্ মানুষ নিতান্ত কৌতুকের ছলে একটি শব্দ রচনা করলেন, সেই কৌতুক হারিয়ে গেল, কিন্তু তার আমেজ লেগে রইল শব্দে। কোন্ তীব্র বিষাদে বাল্মীকি তাঁর প্রথম শব্দবন্ধগুলি তৈরি করলেন তা আজ আর কারও মনে পড়বে না, কিন্তু সেই শব্দবন্ধগুলি অমর হয়ে গেল। এক-একটি শব্দ তাই বিস্তর হাসি ও কান্নার গল্পকে ধরে রাখে, প্রতিটি শব্দই তাই এক-একটি রত্নভাণ্ডার। গত দিনের শব্দ আজকের সঞ্চয়, আজকের শব্দ আগামীকালের পাথেয়।

আবার, শব্দের কি কম রকমফের ! ঈশ্বরকে যখন জগৎপিতা বলছি, তখন তাঁর এক রূপ। কিন্তু তিনি যখন মহাকাল, তখন সে আর-এক রূপ। ঈশ্বরকে যখন সৃষ্টি ও স্থিতির রূপে দেখি, তখন তিনি জগৎপিতা, বিধাতা। প্রলয়রূপে তিনিই আবার মহাকাল। অরণ্য শব্দে জঙ্গলও বোঝায়, কাননও বোঝায়। কিন্তু জঙ্গল বলতে যে অযত্নকৃত, অপরিকল্পিত বৃক্ষ-সমাহারের কথা

বোঝায়, কানন বললেও কি সেই একই ছবি চোখে ভাসে !

শব্দের এইসব বিচিত্র মজা ও রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তীর মণিমঞ্জুষা বইয়ে। মণিমঞ্জুষা একই সঙ্গে অভিধান, এবং অভিধানের চেয়ে কিছু বেশি। এখানে এক-একটি শব্দ ধরে-ধরে তার বিভিন্ন প্রতিশব্দ, সহগামী শব্দ এবং আনুষঙ্গিক শব্দ পরপর সাজানো হয়েছে। বাংলা এবং ইংরেজি—দু'ভাষাতেই শব্দ সাজানো আছে। অর্থাৎ, কোনও একটি শব্দ মাথায় এলে তার সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় যত শব্দ আমাদের মনে ভাসে, সেই সব শব্দই এক সারিতে বিন্যস্ত হয়েছে এখানে।

তা হলে বলা যায়, মণিমঞ্জুষা এক ধরনের ভাবানুক্রমিক অভিধান। কোনও শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র মনের মধ্যে সমজাতীয় বিভিন্ন ভাব খেলা করতে থাকে। সেইসব বিভিন্ন ভাবের জন্য আবার বিভিন্ন শব্দ। জগন্নাথবাবু এই বইয়ে ভাবের সংগতির উপর জোর দিয়েছেন, এবং সেই অনুযায়ীই শব্দ-সংকলন করেছেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'লেখক, সাংবাদিক, কথাশিল্পী, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র, বাগ্মী, বক্তা, জননেতা, ব্যাখ্যাতা, এমনকী সাধারণ পত্রলেখকেরও প্রয়োজন হাতের কাছে একটি সহজলভ্য, ইচ্ছাধীন শব্দ-ব্যাঙ্ক, যার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে যখন যেমন দরকার সার্থক শব্দ তুলে ব্যবহার করা যায়। মণিমঞ্জুষা ঠিক এই রকমের একটি শব্দ-ব্যাঙ্ক।'

জগন্নাথবাবু আরও লিখছেন, 'প্রচলিত অভিধানগুলি আমাদের অচেনা বা অল্প-চেনা শব্দের সঠিক অর্থ বলে দেয়, শব্দ ব্যবহারের ভুল সংশোধনে সাহায্য করে। কিন্তু মনের মধ্যে যখন ভাব গুমরে ওঠে, ঠিক প্রয়োজনীয় শব্দটি আমরা পেয়েও পাই না, হাতড়াতে থাকি, তখন এইসব অভিধান আমাদের প্রয়োজনীয় শব্দের সন্ধান বা জোগান দিতে পারে না।' এই অভাব দূর করতে চায় মণিমঞ্জুষা। ইংরেজিতে এ-ধরনের বইকে বলে 'থিসরাস'। মণিমঞ্জুষা একটি দ্বিভাষিক থিসরাস।

একটি উদাহরণ দেওয়া ভাল। মূল শব্দ 'অমর'। তার পাশে পরপর সাজিয়ে দেওয়া আছে—মৃত্যুহীন, চিরজীবী, অবিনশ্বর, অনশ্বর, অক্ষয়, অব্যয়, চিরন্তন, নিত্য, অনন্ত, চিরায়ত, শাশ্বত, অবিনাশী, চিরস্মরণীয়, যুগযুগ স্থায়ী, চিরখ্যাত। সঙ্গে ইংরেজিতে রয়েছে immortal, eternal, imperishable, everlasting, undying, deathless। কিন্তু এ-সব তো বিশেষণ। এ-সব শব্দের বিশেষ্য-রূপও বইয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে একই জায়গায়।

চমৎকার ছাপা। মুদ্রণপ্রমাদ প্রায় নেই। হাতের পাশে রেখে সবসময় ব্যবহার করার জন্য বইটি নিঃসন্দেহে খুব উপযোগী হবে। হয়তো আরও কিছু শব্দ বইয়ে ঢোকানো যেতে পারত, কিন্তু তা হলে আবার বইয়ের আয়তন এবং দামও বাড়ত। বইখানি যেমন বড়দের, তেমনি ছোটদেরও খুব কাজে লাগবে।

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্ফ কেনাই আরও বুদ্ধিমানের কাজ

"বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, সার্ফ কেনার মত এমন বুদ্ধিমানের কাজ আর হয়না। এর ঐ পাওয়ার প্যাকড ফর্মুলাই আপনার পয়সার সেরা মূল্য উসুল ক'রে দেয়!"

সেরা মূল্য উসুল করে? প্রথমতঃ সার্ফের দামই তো দারুণ বেশী?

"আচ্ছা ভাই, আপনি কি দেখতে পান না যে এ দিয়ে লাভ পাওয়া যায় কত বেশী? একমাত্র সার্ফই আমার কাপড় ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে আর কাপড় রাখেও দারুণ সুরক্ষিত। তাই তা দেখতেও সবসময় লাগে নতুনের মত – যার ফলে, আপনারও নানাভাবে সাশ্রয় হতে থাকে, আর, সেরা মূল্য উসুল করা বলতে, আমি ঐটিই বোঝাতে চেয়েছি।"

ঠিক আছে, মানলাম, কিন্তু ললিতা দেবী, শুধু ঐটুকুই কি সব?

"না, না, আরও আছে! সার্ফের ১/২ কিলো পাউডার অন্যান্য সাধারণ পাউডারের ১ কিলোর সমান হয়—যার মানেই হচ্ছে সাধারণ পাউডারের ১ কিলো পাউডার যতগুলি কাপড় ধোয় এর ১/২ কিলো দিয়ে ততগুলিই ধোওয়া যায়। তাহলে সার্ফ দিয়ে আরও লাভ দেখতে পাচ্ছেন তো?"

অর্থাৎ এর মানে হ'ল, সার্ফ নিজস্ব উপায়ে আপনার পয়সা উসুল করে...

"...আর আপনি তার লাভ পান নানান দিক দিয়ে। সস্তার জিনিষ আর ভাল জিনিষ কেনায় তফাৎ থাকে। সেইজন্যেই তো সার্ফ কেনা সবসময়ই আরও বুদ্ধিমানের কাজ।"

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

কণ্ডিশনার খুস্‌কি-প্রতিরোধক শ্যাম্পু

"সুপার সফট-এর কথা বলছেন ? হ্যাঁ এতদিন পর এবার এমন এক খুস্‌কি প্রতিরোধক শ্যাম্পু পেয়েছি, যা দিয়ে আমার চুল থাকছে দারুণ নরম, ঝলমলে-চিকণ, দোল-দোলানো আর, যে চুলের অপরূপ পরশ আমি অনুভব করতে পারছি।"

একাই সর্বগুণ সম্প

An Eskayef Product